আলোর ঠিকানা

সম্পাদনা

অসিতাভ দাশ

দ্বিতীয় খণ্ড

আলোর ঠিকানা

[একটি নির্বাচিত সংকলন]

সম্পাদনা :

অসিতাভ দাশ

প্রভা প্রকাশনী

পরিবেশক : প্রোগ্রেসিভ বুক ফোরাম
৩৩, কলেজ রো, কলি-৯

ALOR THIKANA (In Quest of Light)

By : Asitabha Das.

প্রকাশক :
শ্রীঅসীমকুমার মণ্ডল
প্রভা প্রকাশনী
মাঠপাড়া, নোনাচন্দনপুকুর
বারাকপুর, উঃ ২৪ পরগণা

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ১৯৯৪

প্রচ্ছদ : অমিত পাল

মুদ্রণ :
অজিত দাস-ঘোষ
বাসন্তী প্রেস
৩৭, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

মূল্য : ষাট টাকা

উৎসর্গ

আমার প্রয়াত পিতা
অবনীরঞ্জন দাশের
স্মৃতির উদ্দেশ্যে

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"যে সমস্ত পত্রিকা ও গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি"

ইন্‌ষ্টিটিউশন্ অব্ ইঞ্জিনীয়ার্স (ইণ্ডিয়া) লাইব্রেরী
ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী জার্নাল
দি ইয়ং মেনস্ ইন্‌ষ্টিটিউট, বৈদ্যবাটী
ইয়াসনিক বুলেটিন
উত্তরা
গ্রন্থাগার
চন্দননগর সরকারী কলেজ
চিত্রালী
ছাত্র
পল্লী প্রদীপ
"পাঠাগার" পত্রিকা
"প্রবাসী"
প্রাতিস্বিক
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থাগার
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন স্মারক সংখ্যা
বয়েজ ওন লাইব্রেরী স্মারক সংখ্যা
বিচিত্রা
বিশ্ববাণী
ভারতী
মহাকরণ গ্রন্থাগার
মুদ্রণপত্র
লাইব্রেরী বুলেটিন
সখা ও সাথী
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা
সুপ্রভাত
সৌরভ
শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী
এছাড়া সমস্ত লেখক ও অনুবাদকবৃন্দ

॥ নিবেদন ॥

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। এর পিছনে সবচেয়ে বড় অবদান পাঠকদের ও শুভানুধ্যায়ীদের। "আলোর ঠিকানা" প্রথম খণ্ড প্রকাশের ছয় মাসের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ প্রায় নিঃশেষ। তাই বুকে আশা নিয়ে নূতন উদ্যমে পাঠকদের সামনে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করলাম।

"আলোর ঠিকানা" নামকরণ নিয়ে নূতন করে আলোচনা করার সুযোগ নেই। পাঠকরা আমায় চেয়ে অনেক বেশী হৃদয়ঙ্গম করেছে নামকরণের সার্থকতা। তবে এই সার্থকতা সম্পূর্ণতা লাভ করবে যখন আমরা সবাই উপলব্ধি করব গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ও শিক্ষা জগতে ভূমিকার কথা।

প্রথম খণ্ডের মতই এবারও লেখক তালিকায় যাঁরা স্থান পেয়েছেন, তাঁরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। এই প্রজন্মের কাছে কেউ কেউ হয়তো অপরিচিত নাম। কিন্তু প্রবন্ধাবলীর শেষে লেখক-প্রবন্ধ পরিচিতি থেকে তাঁদের সকলের পরিচয় ও কর্মক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের কথা জানতে পারা যাবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে প্রবন্ধকারেরা অনেকেই পেশায় ও বৃত্তিতে গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগারের সাথে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি তাঁদের পরম শ্রদ্ধা ও অসীম মমতা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁদের প্রবন্ধগুলিতে। এটাও এই গ্রন্থের অন্যতম মূল আকর্ষণ।

এই গ্রন্থ সঙ্কলনের মূল উদ্দেশ্যে গ্রন্থ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় যে সকল অমূল্য প্রবন্ধাবলী আমাদের দৃষ্টির অগোচর হয়ে গিয়েছিল ও অনেক প্রবন্ধের সন্ধান জানা ছিল না, সেগুলিকে একত্র করে নূতন পথের সন্ধান দেওয়া। এরকম আরো অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ দৃষ্টির আড়াল হয়ে আছে। সেগুলোকে একত্র করে "আলোর ঠিকানা" তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের অভিপ্রায় রইল। সম্ভবতঃ ওটাই হবে শেষ খণ্ড। তার পরেও অনেক অজানা প্রবন্ধের সন্ধান মিলবে, যেগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানা পত্র পত্রিকায়। সেগুলো সঙ্কলনের ভার হয়তো গ্রহণ করবে নূতন প্রজন্মের কোন অভিযাত্রী।

যে সব গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি ও প্রবন্ধগুলি যে সমস্ত পত্র-পত্রিকা থেকে সংগৃহীত হয়েছে, কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সেই সমস্ত গ্রন্থাগার ও পত্র-পত্রিকার তালিকা প্রথম খণ্ডের মতই সংযোজিত হল। প্রবন্ধগুলি যে সমস্ত পত্র-পত্রিকার নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা থেকে সংগৃহীত হয়েছে, তার উল্লেখ লেখক-প্রবন্ধ পরিচিতি অংশ থেকে জানা যাবে।

এই গ্রন্থের সঙ্কলনের ব্যাপারে যাঁরা অকৃপণ সহযোগিতা করেছে, তারা হল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগারিক রীতা চন্দ্র ও গ্রন্থাগার কর্মী গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন ছাত্র অসীম চক্রবর্ত্তী ও মৃণালকান্তি মণ্ডল, আমার সহাধ্যায়ী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইন্‌ষ্টিটিউশন্ অব্ ইঞ্জিনীয়ার্স (ইণ্ডিয়া) গ্রন্থাগারের আশীষ ভট্টাচার্য্য, আমার প্রাক্তন ছাত্র ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর প্রাক্তন ছাত্র গৌতম মাইতি, বাসন্তী প্রেসের কর্ণধার অজিত দাস-ঘোষ এবং ঐ প্রেসের কর্মীবৃন্দ। তরুণ প্রকাশক অনুজপ্রতিম অসীমকুমার মণ্ডল উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগানোর ব্যাপারে চির তরুণ। তার অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসীম উৎসাহের ফলে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড এত শীঘ্রি প্রকাশ করা সম্ভব হল।

পূর্বের মতই পাঠকদের সহযোগিতা ও সমমর্মিতা কামনা করি।

কলিকাতা
১৫ই আগষ্ট, ১৯৯৪

অসিতাভ দাশ

সূচীপত্র

লাইব্রেরী

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

আমরা যখন এই বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হই, আমাদের মনে হইল যেন কোন মন্দিরে ঢুকিতেছি। ইহার কারিগরি, সাজসজ্জা, গড়নপেটন অতি সুন্দর হইয়াছে। যিনি এই মন্দিরের নক্সা তৈয়ারী করিয়াছিলেন, তাঁহাকে সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। বাড়ীটি যেন একখানি ছবি, একেবারে নিখুঁত। ইহা ত মন্দিরই বটে—দেবমন্দির, সরস্বতীর মন্দির। যে মন্দিরে ঢুকিতেই মন প্রফুল্ল হয়, সে মন্দিরে দেবতার সাধনার সিদ্ধিরও লাভ হয়। আর যেখানে ঢুকিতেই মন চটিয়া যায়, সেখানে সিদ্ধি লাভ হয় না। এইজন্য একটি শ্লোক আছে, আমরা এখানে সেটি তুলিয়া ব্যাখ্যা করিঃ দুঃখাদ্ধি চিত্তবিক্ষেপো, বিক্ষেপাৎ সিদ্ধিরন্যথা—দুঃখ হইলেই, মন চটিয়া গেলেই, কোন কাজই ভাল লাগে না। সে মন কোন কাজেই লাগে না—চিত্তের একাগ্রতা হয় না। বিশেষরূপ মনোযোগ না হইলেই কোন কাজেই ফল হয় না। এখানে সে আশঙ্কা নাই। মন্দির দেখিলেই মন ভাল হয়, ঢুকিলে আরও ভাল হয়, সুতরাং এখানে লোকে মন দিয়া পড়িবে এবং পড়ার ফল পাইবে।

সকলেই জানেন যত-রকম দান আছে, তার মধ্যে বিদ্যাদান সকল দানের চেয়ে বড়। সেইজন্য এখন অনেকে স্কুল করিয়া বিদ্যাদান করিতেছেন। সুসভ্য জাতি ভিন্ন এই দানের মাহাত্ম্য লোকে বুঝিতে পারে না। যাহারা সুসভ্য নয়, তাহারা অন্নদান, ভূমিদান, জলদান প্রভৃতিতেই খুসী থাকে। তাহারা বুঝে না যে এক বিদ্যাদান হইলে, তাহা হইতেই আর-সব দান আপনা হইতে আসিয়া জুটে। বিদ্যাদান অপেক্ষাও লাইব্রেরী দান আরও বড়। কেননা লাইব্রেরী বিদ্যার মূল। বিদ্যাকে যদি গাছের সঙ্গে তুলনা কর, লাইব্রেরী তাহার জড়। বিদ্যাকে যদি নদীর সঙ্গে তুলনা কর, লাইব্রেরী তাহার ফোয়ারা, অনন্ত জলরাশির আধার। সুতরাং যাঁহারা লাইব্রেরী দান করেন, তাঁহারা, শ্রেষ্ঠ দানের উপরও যদি কিছু শ্রেষ্ঠ দান থাকে, তাই করিয়া থাকেন। স্কুলে যে বিদ্যাদান হয়, সেটা ছেলেদের। লাইব্রেরীতে যে বিদ্যাদান হইয়া থাকে, সেটা ছেলে বুড়া সবারই। স্কুলে যে বিদ্যাদান হয়, তাহা ছেলেরা কয়েকবৎসর মাত্র গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু লাইব্রেরীতে যে বিদ্যাদান হয়, তাহা বারমাস তিরিশ দিন, মানুষ যতদিন

বাঁচে ততদিনই মানুষ লইতে পারে। স্কুলে যে বিদ্যাদান হয়, তাহার সীমা আছে, বালবিদ্যাই দান হইয়া থাকে। এখানকার দান অসীম, অনন্ত—ইহার সীমাও নাই, অন্তও নাই। পৃথিবীতে যত-কিছু জ্ঞান আছে, সবই কলমবন্ধী করা বইএ লেখা। সুতরাং লাইব্রেরীতে যখন সবরকম বইই থাকে, তখন যত-রকম বিদ্যা, যত-রকম জ্ঞান আছে, সবই সেখানে দান হয়। শেঠ-মহাশয়েরা এই লাইব্রেরী দান করিয়া এ অঞ্চলের পরম উপকার করিলেন। আইস আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিই, তাঁহাদের দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করি ও গুণগান করি।

যখন লাইব্রেরী-দানের সভায় আমি সভাপতি হইয়াছি, আমি মনে করি লাইব্রেরীর উৎপত্তি স্থিতি সম্বন্ধে এ সময়ে কিছু বলিলে বেলয় হইবে না, বরঞ্চ লয়-মাফিকই হইবার সম্ভাবনা।

লাইব্রেরীর ইতিহাস খুব লম্বা। যখন হইতে মানুষ সভ্য, যখন হইতে মানুষ নিজের মনের ভাব বাহিরে আঁকিতে শিখিয়াছে, তখন হইতেই লাইব্রেরীর উৎপত্তি। আমি এখানে 'আঁকিতে' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছি; 'লিখিতে' শব্দ ব্যবহার করি নাই। তাহার কারণ লিখিতে গেলেই বর্ণমালার দরকার হয়। বর্ণমালার পূর্বেও মানুষে মনের ভাব ব্যক্ত করিত ছবি আঁকিয়া, জন্তু-জানোয়ার আঁকিয়া, গাছপালা আঁকিয়া। তখন ছাপা ছিল না, কাগজ ছিল না, তাল-পাতায় বা ভূর্জ্জপত্রের ব্যবহার ছিল না। তখন মনের ভাব জানাইবার জন্য ছবি আঁকিত হয় পাথরে, নয় মাটির টালিতে, তাও আবার পোড়ান টালি নয়, রৌদ্রে শুকান। পাথরের টালির একটি লাইব্রেরী মিশরে মাটির অনেক নীচে পাওয়া গিয়াছে। তখন মিশরে পিরামিড করা আরম্ভ হইয়াছে কি না সন্দেহ। যাঁহারা বড় বড় পিরামিড করিয়াছেন, তাঁহাদের আগে ত নিশ্চয়ই। তাহাতে পাথর-গুলিতে কেবল ছবি আঁকা। ইহার ভিতর একটি লাইব্রেরীতে যত বই ছিল, মন্দিরের দেওয়ালে তাহাদের একটি তালিকা দেওয়া আছে। সুতরাং সেগুলি যে সত্য-সত্যই লাইব্রেরী, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। এইসব লাইব্রেরী মন্দিরেই থাকিত, মন্দিরের পুরোহিতেরাই পড়িত, পড়াইত ও যত্ন করিয়া রাখিত। মিশরের এই লাইব্রেরী যীশুর জন্মের প্রায় ৪।৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল। তাহার পর বরাবরই মিশরে লাইব্রেরী হইতেছিল, পাথুরে বই যে কত হইয়াছিল তাহার ঠিকানা নাই।

ইংরেজী ১৮৫০ সালে লেয়ার্ড সাহেব নিনিভা নগরে খুঁড়িতে আরম্ভ করেন। তিরিশ ফুট খুঁড়িবার পর তিনি এক প্রকাণ্ড হল পান। সেই হলের সমস্ত

মেঝেটাতে একফুট উচা করিয়া পাথরের টালি সাজান ছিল। আর টালিগুলিতে আগাগোড়া তেকোণা অক্ষরে লেখা ছিল। পণ্ডিতেরা মনে করেন এটি অসুররাজ (এসিরিয়ার রাজা) সার্ডেনাপোলাসের লাইব্রেরী। ইহাতে অন্ততঃ ২০,০০০ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বই ছিল, কতকগুলি অভিধান ছিল, অনেক মহাকাব্য ছিল, ইতিহাস ছিল, জ্যোতিষের বই ছিল; একজন বড় রাজার লাইব্রেরীতে যাহা কিছু থাকার সবই ছিল। নিনিভাতে এতবড় একটা লাইব্রেরী পাইয়া ইউরোপের লোকের বড়ই স্ফূর্ত্তি হয় ও উৎসাহ বাড়িয়া যায়। তাহারা মেস্‌পটের যেখানে যেখানে ঢিবি দেখে, সেইখানেই খুঁড়ে। আর তাহার ভিতর থেকে কত বাড়ী ঘর মূর্ত্তি, কত লাইব্রেরী বাহির হয়! এইসব দেখিয়া শুনিয়া পড়িয়া, সকলের এই বিশ্বাস হইয়াছে যে যীশুর জন্মের ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে মেস্‌পটে সুমের ও আকাদ নামে দুইটি জাতি বাস করিত। সুমেরেরা দাড়ি কামাইত, আকাদেরা কামাইত না। সুমেরেরা সকলের আগে সভ্য হইয়াছিল। তাহারা পাথরের মূর্ত্তি গড়িত, পাথরের বাড়ী তৈয়ারি করিত, দূর-দূরান্তরে বাণিজ্য করিত; লেখাপড়াও করিত। তাহাদের মারিয়া আকাদরা মেস্‌পটের রাজা হয়; সুমেরের সভ্যতা আকাদরা অনেকটা লইয়াছিল। সুতরাং সুমেরের ভাষা তাহাদের শিখিতে হইয়াছিল। ভাষা শিখিতে গেলেই অভিধান চাই। তাই তাহারা সুমের ও আকাদ—দুই ভাষারই অভিধান করিয়াছিল। সে অভিধানও এই লাইব্রেরীতে পাওয়া গিয়াছে। একখানি মহাকাব্যও এই সকল লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়, তাহার নাম "ইস্তার ও ইস্‌দুবাল।" এই মহাকাব্যের ইংরেজী করা হয় ও তাহা আমার হাতে একবার পড়িয়াছিল, আমি বিশেষ মনোযোগ না দিয়া দুই-এক পাতা পড়িতে আরম্ভ করি। কিন্তু দুই-এক পাতা পড়িয়াই আমি আর সে বইখানিকে ছাড়িতে পারি নাই। গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত উহা পড়িয়াছিলাম। আশ্চর্য্যের কথা এই যে যত প্রাচীন মহাকাব্য আছে, সে-সকলই অত্যন্ত লম্বা; রামায়ণ বল, মহাভারত বল, ইলিয়ড্ বল, ওডেসি বল, সবই লম্বা। কিন্তু ইস্তার ও ইস্‌দুবাল একালের মহাকাব্যের মত—রঘুবংশের মত, মিল্‌টনের মত, মেঘনাদবধ কাব্যের মত—বেশ সর্গবন্ধে লেখা। ইহারও বীজ-বিন্দু-পতাকা সব আছে, বর্ণনাও সবই খুব উজ্জ্বল। ইহাতে স্বর্গের বর্ণনা আছে, নরকের বর্ণনা আছে, সমুদ্রের বর্ণনা আছে, পর্ব্বতের বর্ণনা আছে, যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা আছে, কেল্লা আছে—একটা অদ্ভুত জিনিস।

যবন বা গ্রীস্ দেশে অনেক বড় বড় লাইব্রেরী ছিল। আলেক্‌জেণ্ডারের গুরু

এরিস্‌টট্‌লের এক প্রকাণ্ড লাইব্রেরী ছিল। তিনি তাহা ছাত্রকে দিয়া যান। এথেন্সে ইউক্লিডের এক লাইব্রেরী ছিল। পিসস্ট্রেটসেরও লাইব্রেরী ছিল। কিন্তু আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার লাইব্রেরী পৃথিবীর সব লাইব্রেরীকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল। মহাবীর আলেক্‌জেণ্ডারের সেনাপতি টলেমি মিশর দেশ দখল করিয়া লন্। এই টলেমিরাই আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার লাইব্রেরী স্থাপন করেন। তখন 'টেপিরাস' বলিয়া এক গাছের ছালে লেখা আরম্ভ হইয়াছে। বর্ণমালাও চলিয়া গিয়াছে। টলেমিরা সবদেশের বই সংগ্রহ করিতেন; মিশরের বইও তাঁহার সংগ্রহ করিতেন, হিব্রুদের বইও সংগ্রহ করিতেন। তাঁহারা বড় বড় পণ্ডিত দেখিয়া লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতেন। কেহ কেহ বলেন সেখানে ৪ লক্ষ পুস্তক ছিল, কেহ বলেন সেখানে ৭ লক্ষ পুস্তক ছিল। অনেকে মনে করেন খলিফা ওমর যখন আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া দখল করেন, তখন লাইব্রেরীটি পুড়াইয়া দিয়াছিলেন। আবার অনেকে মনে করেন, খলিফা ওমরের অনেক আগে নানারূপ গোলযোগে লাইব্রেরী নষ্ট হইয়া যায়। গোলযোগ যে কিরূপ তাহার একটা উদাহরণ দিই। এই লাইব্রেরীর দুইটি ভাগ ছিল, একটি সমুদ্রের খুব কাছে ছিল এবং সেইটিই বড়। জুলিয়াস সিজর যখন আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার নৌকার বহরগুলিতে আগুন লাগাইয়া দেন, তখন সেই আগুনে ঐ বড় লাইব্রেরীটি পুড়িয়া যায়। সিজরের পর তাঁহার পরম বন্ধু এণ্টনি এই ক্ষতিপূরণের জন্য বড়ই ব্যস্ত হয়েন। তিনি করেন কি—পার্গামস নামে এক জায়গায় এক প্রকাণ্ড লাইব্রেরী ছিল, সেইটি আনিয়া ক্লিওপেট্রাকে দান করেন। ক্লিওপেট্রা ঐ বড় লাইব্রেরীতে পার্গামসের বইগুলি রাখিয়া দেন।

রোমেও বড় বড় লাইব্রেরী ছিল। যে-সকল লাইব্রেরী সর্বসাধারণের হাতে থাকিত, সকলেই সেখানে গিয়া পড়িতে পাইত। আগষ্টস্ এইরূপ পাব্‌লিক লাইব্রেরী বা সাধারণের পাঠাগার সর্ব্ব-প্রথমে খুলেন। খ্রীঃ সন ৪ সময়ে রোমনগরে এইরূপ ২৮টি পাব্‌লিক লাইব্রেরী হয়; ইহা ছাড়া সকল বড় বড় নগরেই লাইব্রেরী ছিল। কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলে রোমের রাজধানী যখন উঠিয়া যায়, তখন সেখানেও খুব বড় বড় লাইব্রেরী হয়। সেখানকার একটি লাইব্রেরীতে ১ লক্ষেরও বেশী বই ছিল। রোম সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া গেলে পোপেরাও বড় বড় লাইব্রেরী করিয়াছিলেন। সেখানে বড় monastery বা মঠ বা বিহার থাকিত, বিশপ থাকিতেন, সেখানে খুব বড় লাইব্রেরী হইত। বড় বড় রাজারাও তখন লাইব্রেরী করিতেন। প্রথম প্রথম লোকে লাইব্রেরীতে বসিয়া পড়িত, তারপর বই বাড়ী লইয়া যাইবারও ব্যবস্থা করা হয়।

এ ত গেল 'অন্ধ'যুগের কথা—অর্থাৎ Dark Ages-এর কথা। বর্ত্তমান সময়ে লাইব্রেরীর ত সংখ্যা নাই। সকল নগরে বড় বড় পাব্‌লিক লাইব্রেরী আছে, ইউনিভার্সিটিগুলিতে লাইব্রেরী আছে, রাজার বাড়ীতে লাইব্রেরী আছে। ইহার মধ্যে সম্প্রতি একটি প্রকাণ্ড লাইব্রেরী হইয়াছে। তাহার কথা আপনাদের সকলেরই জানা আবশ্যক। আমেরিকার রাজধানী ওয়াসিংটন নগরে একটি লাইব্রেরী করা হইয়াছে ; সেখানে এক কোটি বই রাখিবার জায়গা করা হইয়াছে এবং দরকার হইলে জায়গা বাড়াইবারও ব্যবস্থা আছে। লাইব্রেরীর অধ্যক্ষেরা কোন বইই ছাড়েন না ; নূতন বই পাইলেই সংগ্রহ করেন। এখন ইউরোপে লাইব্রেরিয়ান্ হইতে গেলে একটি কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়—কিরূপে আলমারীতে বই সাজাইয়া রাখিতে হয়, কিরূপে লাইব্রেরীর ক্যাটালগ করিতে হয়—এইসব লইয়াই একটা science হইয়াছে। শুধু লাইব্রেরিয়ানদের উপকারের জন্য অনেকগুলি মাসিকপত্র আছে এবং অনেকগুলি সোসাইটি আছে।

এইবার আমাদের নিজের দেশের লাইব্রেরীর কথা বলিব। যখন আমাদের ব্রাহ্মণেরা বেদমাত্র লইয়া থাকিতেন, সেই প্রাচীনকালে আমাদের লাইব্রেরীর দরকার হইত না। ব্রাহ্মণেরা পাঁচবছরের ছেলে বাড়ী হইতে লইয়া গিয়া গুরুগৃহে রাখিয়া দিতেন। সেখানে তাহারা বেদ মুখস্থ করিতে থাকিত। নয় বৎসর বা ১৮ বৎসর বা ২৭ বৎসর বা ৩৬ বৎসর কেবল বেদ মুখস্থ করিতে হইত। ব্রাহ্মণেরা গুরুকুল হইতে সমাবর্ত্তন করিতেন, তখন এক-একটি লাইব্রেরী লইয়া ফিরিতেন। বেদ কলমবন্ধী করিবার উপায় ছিল না, করিলে তার ঘোর নরক নিশ্চয়। অল্-বেরুনি বলিয়া গিয়াছেন ইং ৯৫০ সালে কাশ্মীর দেশে সর্ব-প্রথম বেদ কলমবন্ধী হয়। এখনও বেদের পুথি অতি বিরল। মোক্ষমূলর যতগুলি পুথি দেখিয়া ঋগ্-বেদের বই ছাপাইয়াছেন, কোনখানিই ইং ১৬ শতকের আগের নয়। আমরা তার চেয়েও ঋগ্‌বেদের পুরাণ পুথি পাইয়াছি—একখানি ইং ১৩৪২ সালের পাইয়াছি। আর এই আবহমান কাল বেদ মুখে-মুখেই চলিয়া আসিতেছে। আমাদেরও যেমন, বৌদ্ধদেরও তেমনই। ইং ৪০০ সালে ফাহিয়ান ভারতে আসেন পুথি সংগ্রহের জন্য, কিন্তু কোথায়ও পুথি পান নাই ; একরূপ হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন তাঁহাকে একজন বলিয়া দিল "এদেশে ও-রকমে পুথি সংগ্রহ হইবে না। বুড়া বুড়া ভিক্ষুদের ধর, আর তাদের মুখ হইতে লিখিয়া লও।" ফাহিয়ান এইরূপ করিয়াই বৌদ্ধদের সমস্ত পুথি লিখিয়া লইয়াছিলেন।

বেদ ও ধর্ম্মগ্রন্থের কথা যাই হোক, অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ লেখাই হইত, লাইব্রেরীও

ছিল। প্রত্যেক ব্রাহ্মণই ছোট-খাট একটি লাইব্রেরী রাখিতেন। যাঁহার যত বড় লাইব্রেরী, তিনি তত বড় পণ্ডিত—কেননা "গ্রন্থী ভবতি পণ্ডিতঃ!"

বৌদ্ধদেরও বিহারে বিহারে লাইব্রেরী থাকিত, জৈনদেরও উপাশ্রয়ে উপাশ্রয়ে লাইব্রেরী থাকিত, রাজাদেরও লাইব্রেরী থাকিত। মুসলমান বিজয়ের সময় বৌদ্ধদের অনেক বড় বড় লাইব্রেরী নষ্ট হইয়া যায়। ওদন্তপুরী বিহারের লাইব্রেরীটি ত বক্তিয়ার পুড়াইয়া ফেলেন—সে কথা মুসলমানেরই ইতিহাসে সুব্যক্ত। এইরূপে নালন্দ ও বিক্রমশীলের লাইব্রেরীও যায়। বাঙ্গলার প্রধান গৌরব যে জগদ্দল বিহার, তাহারও এই দশা। ভোজ রাজার লাইব্রেরীটিরও বোধ হয় এই দশাই হইয়াছিল। ভাগ্যে অনেক বৌদ্ধভিক্ষু পুথি লইয়া সে সময়ে নেপালে ও তিব্বতে পলায়ন করেন। ভাগ্যে ইহার পূর্ব্বেও ভুটিয়ারা আসিয়া দশ হাজার বই জগদ্দল বিহার হইতে তর্জ্জমা করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাই আমরা এখন টের পাইতেছি যে বাঙ্গলা দেশ এককালে বৌদ্ধ দেশই ছিল।

বল্লালসেনেরও লাইব্রেরী ছিল। সে সময়কারও ব্রাহ্মণদের লাইব্রেরী ছিল—কারণ তাঁহাদের গ্রন্থে অনেক কোটেসন পাওয়া যায়। বই না থাকিলে এসব কোটেশন কি করিয়া হয়। সে-সকল লাইব্রেরী কোথায় গেল? বাঙ্গলা বড় খারাপ দেশ। পুথি এ দেশে থাকে না—আগুন আছে, বৃষ্টি আছে, জল আছে, বন্যা আছে, আর সকলের চেয়ে শত্রু আছে উই আর ইঁদুর—আর একটা শত্রু পণ্ডিতের মূর্খ পুত্র। ইহাদের হস্তে অনেক প্রাচীন লাইব্রেরী লোপ হইয়া গিয়াছে। এখনও যাহা যাহা আছে, কিছু কিছু বলি।

নেপালে মুসলমানের উপদ্রব হয় নাই। সেখানকার নিবার রাজারা বহুকাল ধরিয়া পুথি সংগ্রহ করিতেছিলেন। তাঁহাদের লাইব্রেরীতে ১৪০০।১৫০০ বৎসরের পুরাণ পুথি পাওয়া যায়। সে দেশে একটু যত্ন করিলে পুথি বহু বহু কাল থাকে। গোর্খা রাজারা নেপাল দখল করিলে নিবার রাজাদের লাইব্রেরী লুট হইয়া যায়। কিন্তু ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে জঙ্গবাহাদুরের সময় হইতে আবার লাইব্রেরী গড়া হইতেছে, তাহাতে প্রায় ১৬ হাজার পুথি আছে। ইহার মধ্যে প্রায় ২০০০ তালপাতার পুথি। সেগুলি প্রায়ই বাঙ্গলা বিহারের পলাতক ভিক্ষুরা লইয়া গিয়াছিল। লাইব্রেরীটি অতি যত্নে রাখা হইয়াছে, তাহার জন্য মহারাজা বীর সম্সের জঙ্গ রাণা একটা ঘণ্টাঘর তৈয়ারি করিয়া দিয়াছেন। উপরের গম্বুজে ঘড়ী থাকে। আর একটা প্রকাণ্ড হল ও তার চারিদিকে দালান—সমস্ত পুথিতে ঠাসা। ইহাতে ইংরেজী বই অনেক আছে, ১৬০০০ সংস্কৃত পুথি আছে; ভোট দেশের

টেঙ্গুর কেঙ্‌র পূরাই আছে—সে প্রায় দশ হাজার পুথি ; চীনদেশের ত্রিপতাক পূরাই আছে, সেও প্রায় ৩।৪ হাজার পুথি ; অনেক ছবি আছে – নানা রকমের ছবি, বিশেষতঃ তন্ত্রের ছবি। এই ঘণ্টাঘরটি মহারাজের অক্ষয় কীর্ত্তি। ইহা ছাড়াও নেপালের অনেক বাড়ীতে অনেক রকমের পুথি আছে, তাহার খবর পাওয়া দুষ্কর।

মহারাজ রণজিত সিংহের পুরোহিত মধুস্থদন অনেক পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার ছেলেদের উত্তরাধিকারীরা কে কোথায় কোন্ বই রাখিরাছে জানা যায় না।

রাজপুতানার সকল রাজার কেল্লাতেই এক-একটা 'পুথিখানা' আছে। ২০০০ হইতে ৬০০০ পুথি অনেক লাইব্রেরীতে আছে। গুজরাটের জৈনেরা, আলাউদ্দীন দেশ দখল করার পর, পুথি লইয়া যসল্‌মীরে পলাইয়া যায়। সেখানে এখনও সে-সকল পুথি বজায় আছে। মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুরে অনেক পুথি আছে। রাজাদেরও ভাল ভাল লাইব্রেরী আছে। তাঞ্জোরের লাইব্রেরী অনেকদিন হইতেই ছিল। ছত্রপতি শিবাজীর পিতা সাহজী ঐ দেশ দখল করিয়া তাঞ্জোর রাজধানী করিলে ঐ লাইব্রেরীর খুব শ্রীবৃদ্ধি হয়। উহাতে ১৮ হাজারের উপর পুথি আছে।

এইখানে কাশীর একটি প্রাচীন লাইব্রেরীর কথা বলিব। প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে একজন বড় সন্ন্যাসী গোদাবরীতীর হইতে আসিয়া কাশীতে বসবাস করেন এবং সেইখানে বরুণার ধারে এক লাইব্রেরী করেন। সে লাইব্রেরীতে বাছা বাছা প্রায় তিনহাজার পুথি ছিল। তাহার একটি তালিকা এখনও আছে। সন্ন্যাসীর নাম—সর্ব্ববিদ্যানিধান কবীন্দ্রাচার্য্য সরস্বতী।

মুসলমান বাদসাহেরা অনেকেই লাইব্রেরী রাখিতেন। ওমরাহেরাও অনেক লাইব্রেরী রাখিতেন। তাঁহারা যে শুধু আরবী ও পার্‌শীরই বই রাখিতেন, এমন নয়, হিন্দুস্থানের বইও অনেক রাখিতেন। মুসলমানেরা লাইব্রেরীতে বসিয়া বই পড়িতে ভাল বাসিতেন। লাইব্রেরীর সিঁড়িতে পড়িয়া গিয়াই হুমায়ুন দেহত্যাগ করেন।

ইংরেজীশিক্ষার প্রভাবে এখন ত চারিদিকেই লাইব্রেরী হইতেছে। আমাদের বাঙ্গলাদেশে এসিয়াটিক সোসাইটীর লাইব্রেরী সকলের চেয়ে পুরাণ। লর্ড ওয়েলেস্‌লি মহা সমারোহে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে এক লাইব্রেরী স্থাপন করেন। সে লাইব্রেরী উঠিয়া গেলে তাহার পুথিগুলি এসিয়াটিক সোসাইটীকে দেওয়া হয়।

লর্ড মেট্‌কাফ ছাপাখানাকে স্বাধীন করিয়া দিয়া বঙ্গবাসীর প্রিয়পাত্র হইয়া

উঠেন। সেজন্য সেকালের বাঙ্গালীরা তাঁহার নাম দিয়া মেট্‌কাফ হল নামে প্রথম পাব্‌লিক লাইব্রেরী স্থাপন করেন। লর্ড কর্জ্জন সেই লাইব্রেরীর মূলে এখন কলিকাতায় ইম্পিরিয়াল্ লাইব্রেরী করিয়া দিয়া গিয়াছেন। বহুসংখ্যক লোক এই লাইব্রেরীতে নিত্য পড়িতে যায় এবং নানা বিষয়ের আলোচনা করে। নূতন পুস্তক বাহির হইলেই এখানে আনা হয় এবং বিশেষ যত্ন করিয়া রাখা হয়। মেট্‌কাফ হলের দেখাদেখি কলিকাতারও বাহিরে অনেক পাব্‌লিক লাইব্রেরী হইয়াছে।

আমরা আজ যে লাইব্রেরী খুলিতে আসিয়াছি, এটির বয়সও বড় কম নয়, পঞ্চাশের অনেক উপরে হইবে। এতদিন অন্যের অগোচরে কিছুমাত্র ঘটাটঙ্কার না করিয়া ইহা চন্দননগরের অনেক উপকার করিয়া আসিতেছে। আজ এই লাইব্রেরীর পুনর্জন্ম বলিলেও বলা যায়। ইহার জাতকর্ম্ম করিবার জন্য আজ আমরা উপস্থিত হইয়াছি। এখনও ইহার অনেক সংস্কার করিতে হইবে। প্রথম সংস্কার লাইব্রেরীর উদ্দেশ্য স্থির করা। যদি উদ্দেশ্য না স্থির করেন, নানা বিষয়ের নানা বই আনিয়া আপনারা ইহার সমস্ত অর্থ ব্যয় করিয়া ফেলিবেন। কোন দিকেই একাগ্রতা থাকিবে না।—ক্রমে একটা জগাখিচুড়িও হইয়া উঠিতে পারে—২০০ খানি ইংরেজি নভেল, ৩০ খানি ইতিহাস, ৫০ খানি সংস্কৃত, শ তিনেক বাঙ্গলা—এইরূপ পাঁচ ফুলের সাজি করিলে হইবে না।

যদি আমার একটা কথা শুনেন—আমি বলি, যাহাতে বাঙ্গলা চেনা যায়, শুদ্ধ এমন-সকল বই আপনারা সংগ্রহ করুন। এতদিন আমরা যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছি, তাহাতে আমাদের চক্ষু সকল দিকেই আছে, কেবল বাঙ্গলার দিকে নাই। আমরা ইংলণ্ডের ইতিহাস বেশ জানি—Wars of the Roses পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলিতে পারি—এলিজাবেথের ওম্‌রাহদের কীর্ত্তিকাহিনী বেশ করিয়া শিখিয়াছি—প্রাচীন আর্য্যরা পঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিম কোণে ৪০০০।৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে কি করিয়াছিলেন তাহার আলোচনা করি—আলেক্‌জাণ্ডার কতগুলি লোক লইয়া ভারতে আসেন তাহাও বলিয়া দিতে পারি—হাইদারআলি, টিপুস্থলতান, হোসেনগঙ্গ, শিবাজী, বীরবুস্ক, রাণাপ্রতাপ আমাদের খুব পরিচিত;—আমরা জানি না কেবল আমাদের এই সোনার বাঙ্গলার কথা। বাঙ্গলার ইতিহাস আমরা পড়ি না, পড়িলেও তাহাতে কিছু পাই না। অথচ এই বাঙ্গলা চিনিবার জন্য কোন বাঙ্গালীর আগ্রহ নাই। যাঁহারা ইংরেজির বা সংস্কৃতের বিষে জর্জ্জরিত হইয়া বলেন—বাঙ্গলায় শিখিবার বা জানিবার কিছু নাই, তাঁহাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। তাঁহারা ছাড়া আর সকলেই ত আপনার দেশের কথা জানিবার জন্য কতই না ব্যগ্র। কিন্তু

সে ব্যগ্রতা নিবারণের জন্য কে কি করিতেছেন? আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি – কেহই কিছুই করিতেছেন না। সেইজন্য আমি জিদ্ করিয়া বলিতেছি— আপনাদের এই লাইব্রেরী বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর সেবায় নিযুক্ত হউক। বাঙ্গলার যেখানে যতটুকু নূতন কথা বা নূতন খবর মিলিবে, সব ভক্তিসহকারে সংগ্রহ করিতে থাকুন। আর আপনাদের লাইব্রেরী হইতে সে কথা চারিদিকে প্রচার হইতে থাকুক। সারা বাঙ্গলাটা এক বড় কথা। এই যে গঙ্গাতীরে পুণ্যভূমিতে আমরা বাস করি, যে পুণ্যভূমিতে পর্তুগীজ, ইংরেজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, দিনেমার ও জার্মান সকলেই আপন আপন বাণিজ্য ও আধিপত্য বিস্তারের জন্য ৩০০ বৎসর ধরিয়া কতই না চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার ইতিহাসই কি আমরা জানি, না জানিতে চেষ্টা করি। অথচ তাহা আমাদের অনায়াসসাধ্য। অন্য দেশ হইলে ইহারই উপর ১০০ বলুম বই লেখা হইয়া যাইত। কিন্তু আমরা এক পাতাও লিখি নাই। আপনাদের লাইব্রেরীর ছয়শ মেম্বর আছেন, একটু চেষ্টা করিলে আমাদের এই কলঙ্ক মোচন করিয়া দিতে পারেন।

গ্রন্থাগার

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গদেশের গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক মহাশয় বলেছেন মোট ৬০।৭০টি লাইব্রেরী আছে এ জেলায়। অন্য দেশের সঙ্গে তুলনায় এই সংখ্যা খুবই কম বল্‌তে হবে। ভারতের কয়েকটি দেশী রাজ্যে লাইব্রেরীর সংখ্যা অনেক বেশী। বরোদার লোক সংখ্যা কম, কিন্তু সেখানে রাজধানীর Central Libraryতে একলক্ষ বই আছে, প্রতি জেলায় ও প্রতি গ্রামে লাইব্রেরী আছে। তাছাড়া travelling লাইব্রেরী আছে—একটি বাক্সে করে ভিন্ন ভিন্ন রকমের বই গ্রামে গ্রামে চালান করা হয়। ভারপ্রাপ্ত একজন কর্ম্মচারী নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বই দিয়ে যায়—সে বই পড়া হয়ে গেলে নতুন বাক্স আসে, পুরাণো বাক্সটি অন্য গ্রামে পাঠান হয়। পড়বার ইচ্ছা কি ভাবে বাড়ে, গ্রামের লোকদের মধ্যে কি ভাবে বই পাঠালে ভাল হয়, এ সব আমাদের দেখ্‌তে হবে। অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করলে আমাদের মন কিছু অবসাদগ্রস্ত হতে পারে, কিন্তু তবু তুলনা দরকার। ময়মনসিংহে ৪৮ লক্ষ লোক, সুইজারল্যাণ্ডের লোকসংখ্যা ৪০ লক্ষ সেখানে ১৯১১ সালে ৫৭৯৮টি লাইব্রেরী ছিল। ১৭ বছর আগে সেখানে বই ছিল ৯৪ লক্ষ, এখন হয়তো এক কোটির উপর। লেখাপড়া করার ক্ষমতা ও লাইব্রেরীর ব্যবহার অবশ্য পরস্পর সাপেক্ষ। একদিকে বলা যায় যে লোকে পড়তে না শিখ্‌লে শুধু লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করে কি হবে, কিন্তু আবার লাইব্রেরী না থাক্‌লে জ্ঞানবিস্তারও হবে না। সবরকম বই নিজে কিনে পড়ার অবস্থা সকলের নয়, সুতরাং লাইব্রেরীর দরকার। এমন কি উপন্যাস পাঠ করবার খুব আগ্রহ এমন লোকও সব বই নিজে কিন্‌তে ও রাখতে পারেন না। আমাদের মতো যাদের নিজের বাড়ী নেই, ভাড়াটে বাড়ীতে থাকেন, তাদের পক্ষে বই কিনে রাখা বড় মুস্কিল। অনেকের বইয়ের সখ খুব। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বই কেনার ও ভাল করে বাঁধিয়ে রাখার সখ ছিল, প্যারিস থেকে তাঁর বই বাঁধা হয়ে আস্‌তো। তাঁর পরিচিত ও ধনী ব্যক্তি একবার তাঁকে বলেছিলেন, বই বাঁধানতে এত টাকা খরচ করবার দরকার কি? আমাদের দেশের লোক দিয়েও তো বাঁধান চল্‌তে পারে!" বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর চেনটা দেখিয়ে বল্লেন, "আচ্ছা, আপনার চেনটা এত সুন্দর, এর কত দাম

হবে ? নিশ্চয়ই ৫০০৲।৬০০৲ র কম নয় ? কিন্তু এত টাকা দিয়ে চেন কেনার কি দরকার ? একটা দড়ি দিয়ে ঘড়িটা বেঁধে রাখ্‌লেই তো চলে। আপনার যেমন চেনের সখ, আমার ও তেম্নি বইয়ের সখ।” যাহোক এতটা বাতিক না থাকলেও অনেকের বইয়ের সখ আছে। কিন্তু যারা ভাড়া-বাড়ীতে থাকেন, বাড়ী বদলাবার সময় বই নিয়ে তাদের বড় অসুবিধা হয়, অনেক বই নষ্ট হয়। সেজন্য অনেকে নিজের লাইব্রেরী করতে পারেন না। সব বই কেউই কিন্‌তে পারে না, আর কেনা উচিতও নয়, কেননা এমন অনেক বই আছে যা বছরে দু'বছরে একবার মাত্র দেখ্‌বার দরকার হয়। সে রকমের বই নিজে কেনার আবশ্যকতা নেই। পড়ার অভ্যাস জন্মানোর জন্যও লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার যথেষ্ট দরকার আছে। পড়ার অভ্যাস যে মানুষের কত বড় একটা শান্তি, একটা সান্ত্বনা, তা আমরা ভুলে যাই। মনে করুন, এখানে যদি কোন বিখ্যাত লোক আসেন তাকে দেখবার সুবিধা সকলের হয় না। রবীন্দ্রনাথকে হয় তো সকলে দেখেন নি, এবং অল্প লোকেই আলাপ করেছেন। যাঁরা কথা বলেছেন, তারাও হয়তো সাধারণ ভাবে মামুলি কথাবার্ত্তা বলেছেন। কবির যা প্রধান বল্‌বার কথা, সর্ব্বদা তিনি তা বলেন না, বলবার মেজাজ থাকতে পারে না। কিন্তু পড়ার ইচ্ছা ও লাইব্রেরী থাক্‌লে সবদেশের সব যুগের মনীষীদের কথা আমরা সাক্ষাৎ ভাবে পেতে পারি। কোন মহৎ জ্ঞানী লোক একস্থানে এসে সকলের সঙ্গে কথা বলার তাঁর অবসর হয় না, এতে এত ভিড় হয়, যে প্রত্যেকের ভাগে হয় তো এক সেকেণ্ড সময় দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাঁর রচিত বইয়ের ভিতর দিয়ে প্রত্যেকে তাঁর অবিনাশী মনের, আধ্যাত্মিক চিরস্থায়ী সম্পদের পরিচয় পেতে পারেন। তাঁর অনুগ্রহের উপর নির্ভর না করে আমার নিজের মর্জ্জিমতই পেতে পারি। বিছানায় শুয়ে পড়ি, ঘুম পেলে পাশে রেখে দিই, আবার ভোরে উঠে তুলে নিয়ে পড়তে পারি—তিনি ব্যাসই হোন্ আর বাল্মীকিই হোন্। কেবল নিজের সুখের জন্য বা সময় কাটানোর জন্য বলছি না—যখন নিজের বা দেশের সম্বন্ধে অবসাদগ্রস্ত হই, তখন তাঁদের বাণী পড়ে শক্তি ও সান্ত্বনা লাভ করি।

বিদ্যাদান শ্রেষ্ঠ দান, এ অতি সত্য কথা। লাইব্রেরী বিস্তারের সঙ্গে শিক্ষা বিস্তারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এদিকে আমাদের দৃষ্টি রাখ্‌তে হবে। এ-জেলায় লাইব্রেরী বাড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে, এ অতি ভাল কথা। কেননা, এক মালদহ ছাড়া অন্য সব জেলার চেয়েই লেখাপড়ার বিস্তার এখানে কম, হাজারে মোটে ৬০ জন। বাংলাদেশে হাওড়া জেলায় সবচেয়ে বেশী, হাজারে ১৬৮ জন। আমার প্রথমে

খুব আশ্চর্য্যই লেগেছিল যে এখানে এমন উৎসাহ দেখ্‌তে পাই, অনেক মহৎ লোকও এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন, তবে শিক্ষার এত অভাব কেন? এর একটা কারণ এই যে এ জেলার মুসলমানের সংখ্যাই বেশী এবং তাদের মধ্যে লেখাপড়ার মোটেই বিস্তার নেই। শিক্ষাবিস্তার কম বলেই মোটে ৬০।৭০টি লাইব্রেরী। যাঁরা লাইব্রেরীর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করবেন, তাঁদের সঙ্গে আর একদল লোক চাই শিক্ষাবিস্তারের জন্য। একদল লোক সব কাজ করতে পারেন না, শ্রমবিভাগ দরকার। একটা বোধ আছে আমাদের, যাঁদের কোন এক বিষয়ে বেশী ঝোঁক আছে তাঁরা অন্য প্রচেষ্টার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকের মধ্যে ভাল জিনিস দেখ্‌তে পারেন না। সমাজ সংস্কারকেরা বলেন, এত কুরীতি রয়েছে আমাদের মধ্যে, এখন স্বাধীনতা সংগ্রাম হবে কি করে? আবার রাজনৈতিকেরা সমাজ সংস্কারকদের নিন্দা করেন। সব মানুষের শক্তি বা প্রবৃত্তি এক না; যার যেমন শক্তি তেমনই কাজ করা উচিত, অপরের নিন্দা করে কোন লাভ নেই। পরস্পরের সাহায্যে লাইব্রেরী, শিক্ষাবিস্তার, ধর্মনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি সবরকম কাজই হতে পারে।

এখন অন্যান্য দেশের কথা কিছু বল্‌তে চাই। রাশিয়াতে এখন এমন একটা অবস্থা রয়েছে যা পৃথিবীতে কখন ছিল না, একটা উলটপালট হয়ে গেছে। সব দেশেই, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাই রাজনৈতিক কাজ চালায়। কিন্তু এখন রাশিয়াতে শ্রমিক ও চাষীদেরই প্রাধান্য। কিন্তু এ বলতে আমরা যা বুঝি তা নয় —চাষাভূষা দিয়ে রাজ্যের কাজ কি করে চল্‌তে পারে? আমাদের ব্রাহ্মণ কায়স্থদের চেয়েও রাশিয়ার শ্রমিকদের মধ্যে লেখাপড়ার বিস্তার বেশী। ওদের মধ্যে লাইব্রেরীর সংখ্যাও সেজন্যে খুব। ওখানে পুরুষ হাজারে ৬১৭ জন ও স্ত্রীলোকে হাজারে ৩৩৬, মোটের উপর হাজারে ৪৬৪ জন, লিখন পঠনক্ষম—চাষী মুটেমজুরদের মধ্যেই এরকম। সুতরাং তারা রাজ্যের কাজ চালাতে পারে। এ জেলার ব্রাহ্মণ কায়স্থদের মধ্যেও এর চেয়ে কম। রাশিয়াতে প্রতি ২০০০ মুটেমজুরের জন্য একটা করে ক্লাব আছে। ১৯২৪ সালে সেখানে ৬৮০০ লাইব্রেরী ছিল। কোন দেশই হঠাৎ কোন একটা কারণে গায়ের জোরে বড় হয়ে যেতে পারে না—মানসিক দৃঢ়তা, শিক্ষাবিস্তার ইত্যাদি দরকার। রাশিয়াতে 'Wall Newspaper' বলে একপ্রকার জিনিস আছে দেয়ালের গায়ে বড় বড় অক্ষরে বিনি পয়সার পড়ার জন্য মোটা মোটা কথা, খবর, মত ইত্যাদি লিখে দেওয়া হয়। আর একটা জিনিস হচ্ছে Living newspaper—পৃথিবীর ও তাদের দেশের

সমসাময়িক প্রধান প্রধান ঘটনা একদল লোক গানের দ্বারা ও অভিনয়ের দ্বারা প্রচার করে। বরোদার গাইকোয়াড় তার রাজ্যের আলাদা Library Department, Visual Instruction Department, ম্যাজিক ল্যান্টার্ণ, বায়োস্কোপ ইত্যাদি নানাপ্রকার ব্যবস্থা দ্বারা শিক্ষাবিস্তার করছেন। আমাদের দেশে একটা বই প্রকাশিত হ'লে তার বড় জোর ১ হাজার কপি ছাপা হয়—পাঠ্য পুস্তকের হাজার পাঁচেক হতে পারে। রাশিয়াতে এক Trade Unionই এক বছরে ৭৯৪ খানি বই প্রকাশ করেছে, তার মধ্যে ১৩৪ খানা বই'র সাড়ে দশ লক্ষ কপি ছাপা হয়েছে। রবিবাবুর ভাল ভাল বইয়ের মোটে ৩য়, ৪র্থ সংস্করণ ছাপা হয়েছে, যদিও প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ২০ বছর আগে। এতেই বোঝা যায় আমাদের দেশে লেখাপড়ার প্রতি কি রকম অনুরাগ! রাশিয়ার মুটেমজুরাই পড়বে বলে ১৩৪টি বই'র সাড়ে দশ লক্ষ কপি ছেপেছে—ভেবে দেখুন ব্যাপারটা। অন্য দেশের কথা ভাবলে উৎসাহ হয়। আবার কতকটা অবসাদও আসতে পারে। কিন্তু অবসাদকে জয় করতে হবে। মানবের ধর্ম্ম হচ্ছে সংগ্রাম করা। বাধাবিঘ্ন আছে, পৌরুষ দিয়ে অতিক্রম করবার জন্য বাধা যত প্রবল তত বেশী শক্তি নিয়ে আক্রমণ করতে হবে। "He who Wrestles with me strengthens me" কুস্তিগীরেরা তাদের চেলাদের সঙ্গে কুস্তি করে শক্তিবৃদ্ধি করে। বাধা আছে বলে অবসন্ন না হয়ে আরো শক্তিশালী হয়ে আরো বড় বাধার সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করব। এই প্রকারেই আমাদের উন্নতি হবে বলে আমি আশা করি।

পাঠাগার

সতীশচন্দ্র গুহ-ঠাকুর

প্রকৃত শিক্ষা বিস্তার-ই পাঠাগারের প্রধান উদ্দেশ্য। এখন কথা হচ্ছে, শিক্ষা বিস্তারের জন্য দেশে আজ-অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, বিশ্বভারতী হয়েছে, বিদ্যাপীঠও কয়েকটি স্থাপিত হয়েছে। এদের মার্ফৎ অসংখ্য শিক্ষায়তন দিয়ে পাশ-করা ছেলে-মেয়ে ত কত জোরালো! কিন্তু "শিক্ষা" তাতে আশানুরূপ প্রসার-লাভ করেনি। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর যে শিষ্যটির প্রবল অনুরাগ দেখলেন রসায়ণ শাস্ত্রের দিকে এবং যাকে অতি যত্নে শাস্ত্রবিৎ ক'রে তুললেন, রসায়ন-শাস্ত্র-চর্চ্চা যার জীবনের ব্রত হবে বলে' স্বপ্ন দেখলেন, ডিগ্রি' বা উপাধি লাভের পর-মুহূর্ত্তে এ-হেন ছাত্রই আচার্য মহাশয়কে অবাক ক'রে দিলে, যখন সে ডেপুটিগিরির জন্য ভিক্ষা পাত্র নিয়ে রাজদ্বারে দাঁড়িয়ে রইল। উত্তরকালে উপাধি-ই ছাত্রের ব্যাধি হ'য়ে পড়ল। এই উপাধি লাভের জন্য ছুটে বেড়ালে উপাধি জুটে যায় কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানের আলোক তা'তে এগোয় না, দূরে সরে যায় এ কথা এখন ভাববার সময় হয়েছে।

গ্রন্থাগার, পাঠাগার ও নিরীক্ষণাগার—আজকালকার কথায় লাইব্রেরী ও ল্যাবরেটরী এগুলিই বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্র এবং প্রাণস্বরূপ। পূর্ব্বকালেও দেশে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। নদীয়াতে প্রকাণ্ড শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী, নালন্দা, তক্ষশীলা—সর্ব্বত্রই গ্রন্থাগারকে অবলম্বন ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়, গড়ে উঠেছিল। দীপঙ্কর, শ্রীজান প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থাগারিক ও অনাগারিক বিদেশে তিব্বত-চীনে গিয়ে দেশের মুখোজ্জ্বল করেছিলেন, তাঁরা দেশের জ্ঞানালোক নিয়ে গিয়েছিলেন এক-একটি ছোট-খাটো গ্রন্থাগারের ভিতর। পণ্ডিতেরা ঘরে ঘরে নিজ নিজ পারিবারিক পুস্তকভাণ্ডারে পাঁজি-পুথি সংগ্রহ ক'রে রাখতেন, এখনো রাখছেন। এই সকল সংগ্রহালয় থেকেই জ্ঞানের আলোক চিরকাল বিকীরিত হ'য়ে আসছে, যার চোখ রয়েছে সে দেখে নিয়ে উন্নতির সোপানে আরোহণ করবে।

কি ক'রে সামান্য একখানি কেতাব একটি মানুষকে উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে সহায়তা করে তা দেখতে পাওয়া যায় দানবীর এণ্ড্রু কার্নেগীর জীবন-বৃত্তান্তে। তাঁর কৃতিত্ব দেখা গেল প্রথমে অর্থোপার্জ্জনে এবং পরে সেই উপার্জ্জিত

অর্থের সদ্ব্যবহারে। প্রথম জীবনে দরিদ্র কার্ণেগী যখন কাজ না পেয়ে আমেরিকার রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তখন একটি ভদ্রলোক দয়া ক'রে তাঁকে একখানি বই পড়তে দিলেন, তাতে তিনি এমন মাল-মশলার সন্ধান পেলেন যা নিয়ে তাঁর উপার্জ্জনের পন্থা খুলে গেল। ক্রমে লাখপতি ক্রোড়পতি অর্ব্বুদপতি হলেন—পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী ব'লে তাঁর নাম রটে গেল। সারাটি জীবন তিনি সেই ভদ্রলোকের দয়ার কথা মনে ক'রে রাখলেন, যাঁর দেওয়া একখানি মাত্র বই তাঁর উন্নতির মূল ভিত্তি। কার্ণেগী মনে করলেন সকল মানুষের জীবনে এমন একটি সুযোগ যদি জুটে যায়, তা হ'লে কত ভাল হয়! শারীরিক মানসিক ও আর্থিক—সবদিকের উন্নতির পন্থা এক-একখানি উৎকৃষ্ট বই-এর ভিতর দিয়ে বাহির হ'তে পারে। তাই দানবীর কার্ণেগী তাঁর জীবনব্যাপী প্রচুর সঞ্চয়ের সদ্ব্যবহার করলেন হাজার খানেক লাইব্রেরী ক'রে দিয়ে। তাঁহার কর্মক্ষেত্র উত্তর আমেরিকায় এবং জন্মভূমি ইংলণ্ডে সমৃদ্ধিশালী সহর কমই আছে যেখানে একটি ক'রে কার্ণেগী-লাইব্রেরী নাই; এক-একটির জন্য ন্যূনকল্পে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার লেগেছে তার প্রাথমিক গৃহপত্তনে। তার পর বই ও আসবাব দিয়ে সেগুলি ভর্তি ক'রে দিয়েছেন এবং বরাবরকার জন্যে কিছু কিছু বার্ষিক বৃত্তির ব্যবস্থা ক'রে সবগুলি প্রতিষ্ঠান সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি ক'রে দিয়েছেন।

য়ুরোপ আমেরিকায় স্কুল-কলেজের চেয়ে লাইব্রেরীগুলির প্রতি কোন অংশেই কম দৃষ্টি দেওয়া হয় না। আমাদের এখন ভেবে দেখবার সময় হয়েছে যে, বছর-বছর আমরা যত অর্থ স্কুল-কলেজের জন্য এবং ছেলে-মেয়েদের পাশের শিক্ষার ব্যয় করি, তার অর্দ্ধাংশও লাইব্রেরীগুলির জন্য ব্যয় করে শিক্ষাবিস্তারের দিক দিয়া যুক্তিযুক্ত হয় কিনা। স্কুলের প্রত্যেক শ্রেণীতে বছর-বছর পাঠ্য-পুস্তকের নূতন নূতন সম্ভার চাপাইয়া স্কুল কমিটি যে কৃতিত্ব দেখান, আমরা অম্লান বদনে তা মেনে নিচ্ছি, অথচ লাইব্রেরীগুলির পরিপোষণের জন্য কিছুই ব্যয় করতে রাজী নই। স্কুলের জন্য বৃত্তি আছে, গ্রাণ্ট রয়েছে, লাইব্রেরীর জন্য ঠিক তেমনি আজও হয়নি।

সুখের বিষয় আমাদের দেশেও লাইব্রেরী-আন্দোলন ক্রমে পরিপুষ্টি লাভ করছে। বরোদার মহারাজা শ্রীসয়াজীরাও গায়কোয়াড় এ বিষয়ে অগ্রণী হ'য়ে নিজ রাজ্যে যে ব্যবস্থা করেছেন তাতে সেখানে নিরক্ষরতার হ্রাস হচ্ছে। ইচ্ছা করলে তিনি রাজ্যের ভিতর এক প্রকাণ্ড আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে পারতেন। কিন্তু তা না ক'রে তিনি কতকগুলি স্কুল, পাঠশালা ও লাইব্রেরী

ক'রে দিলেন। নিয়ম হ'ল জবরদস্তী স্কুলের শিক্ষা চলবে—অর্থাৎ প্রত্যেক শিশুকে কয়েক বছরের জন্য পাঠশালায় শিক্ষা দিতে অভিভাবক বাধ্য হবেন এবং লাইব্রেরীতে পড়তে গেলে কিছু দক্ষিণা দিতে হবে না, বাড়ীতে বই নিতে হলেও অনেক লাইব্রেরীই কিছু ভাড়া চাইবে না। ভাড়া চাইলে সেটি আর সার্বজনীন গ্রন্থাগার বলে পরিচিত হ'তে পারবে না। ইহার ফলে বরোদা রাজ্য থেকে নিরক্ষরতা হু-হু ক'রে লোপ পাচ্ছে, ব্যবসায়ী তার ব্যবসায়ে নূতন নূতন সন্ধান পাচ্ছে, কৃষক তার জ্ঞাতব্য বিষয় জানতে পারছে, শিল্পী নানা সন্ধান ও কলা-কৌশল শিখে আপনার কাজে উন্নতি লাভ করছে।

কি ক'রে বরোদা রাজ্যের প্রজারা একটি নূতন লাইব্রেরী স্থাপন করে শুনুন। যে-কোনো গ্রাম, সম্প্রদায় অথবা সহর নিজেদের ভিতর থেকে শ' খানেক টাকা তুলতে পারলে রাজ সরকার ঠিক আর তত টাকা দিবে এবং প্রান্ত-পঞ্চায়েৎ (অর্থাৎ ব্রিটিশ ভারতের ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মতন সংস্থা) আর তত টাকা দিবে। এই তিন শত টাকা দিয়া লাইব্রেরী স্থরু করা হয়। লাইব্রেরীর নিজস্ব গৃহপত্তন করতে হ'লেও ঐরূপ মাত্র এক-তৃতীয়াংশ অর্থ সংগ্রহ করতে পারলেই কাজ হাসিল হ'য়ে গেল। কারণ বাকি দুই-তৃতীয়াংশ প্রান্ত পঞ্চায়েৎ এবং রাজ সরকার চালাইয়া দিবে। এই এক তৃতীয়াংশ অর্থ একই কালে সংগ্রহ করা একটি গ্রামের অথবা কয়েকটি সম্মিলিত গ্রামের পক্ষে অনেক সময় বিশেষ কষ্টকর হয় না। একখণ্ড ভূমি যদি কোন গ্রামবাসী ধর্ম্মার্থে সাধারণের ব্যবহারের জন্য উৎসর্গ ক'রে দেয় তবেই কার্য্য অনেকটা অগ্রসর হ'য়ে যায়। তারপর এই সব লাইব্রেরীগুলি পরিচালনা করতে রাজ সরকারের লাইব্রেরী-ডিপার্টমেণ্ট সর্ব্বদা সহায়তা করে। স্কুল-পরিদর্শনের জন্য যখন ইন্সপেক্টর আসে তখন শিক্ষক, ছাত্র এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ সকলেই বুক দুর-দুর করে, কিন্তু লাইব্রেরীর পরিদর্শক এলে গ্রন্থাগারের পাঠক, শ্রোতা, কর্তৃপক্ষ সবাই বেশ একটা উৎসাহ পায়। প্রায়ই লাইব্রেরীর ইন্সপেক্টর সঙ্গে ম্যাজিক লণ্ঠন এবং নানাপ্রকার ছবি নিয়ে আসেন ও সন্ধ্যার সময় ছেলে-বুড়ো ও মেয়েমানুষরা সবাই প্রদর্শিত ছবির সাহায্যে অনেক জ্ঞানলাভ করতে পারে। দেশের ইতিহাস, ভূগোলের জ্ঞান, প্রাচীন কীর্তিকাহিনী ও আখ্যায়িকা-গুলির সহিত পরিচয় ইত্যাদি বহু বিষয়ের শিক্ষা এই ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে দেওয়া হয়।

বরোদায় লাইব্রেরী-ডিপার্টমেণ্টের আর একটি বিভাগ হচ্ছে 'চলন্ত-লাইব্রেরী'। ত্রিশ-চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ-ষাটখানা বই ধরে, এমন এক-একটি বাক্সে ক'রে বই

কেবলি গ্রামে গ্রামে চালান হচ্ছে। কেন্দ্রীয় মুখ্য লাইব্রেরীতে শ-দেড়শ এ-রকম বাক্স রয়েছে। রাজ্যের যে-কোনো গ্রাম সহর বা পল্লী এরকম একটি বই-এর বাক্সের জন্য আবেদন করলে চাহিদা অনুসারে বই গিয়ে যথাস্থানে হাজির হয়। যাতায়াতের খরচ অবধি রাজ-সরকার বহন করে। ধরুন, একটি পল্লীতে বর্ত্তমান সময়ে গীতা-ভাগবত ইত্যাদি সনাতন ধর্মগ্রন্থ ও তার টীকা-টিপ্পনীর পাঠক এবং লৌহ-কর্ম্মকারের কলাকৌশল শিখিবার লোক যথেষ্ট রয়েছে। এরূপ চাহিদার বিবরণ দিয়ে বই চাওয়া হ'ল। ঠিক সেইরূপ বই-ই এসে উপস্থিত হবে; কেবল দায়িত্ব নিয়ে তিন মাসের ভিতর বইগুলি ফেরৎ পাঠাতে হবে। ভাগবতের শংকর ভাষ্য ব্যতীত তিন-চার রকমের টীকা ও গীতার নানা রকমের আলোচনা এসেছে। স্থানীয় কোনো কোনো পণ্ডিত ভাগবতের 'বৈষ্ণবতোষিণী' টীকার জন্য, কেহ-বা বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়ে রয়েছেন। আবার কেহ-বা লোকমান্য তিলকের গীতা-রহস্যের মূল মরাঠী সংস্করণ এবং শ্রীঅরবিন্দের ইংরাজী Essays on the Gita চাহিয়াছেন। যিনি যে বই-এর জন্য সর্ব্বপ্রথম আবেদন করেছেন তাঁকেই প্রথমে সেই বই দেওয়া হবে। পর্য্যায়-ক্রমে সকলেই যাতে বই দেখবার সুবিধা পেতে পারেন তার শৃঙ্খলা শিখাইবার জন্য প্রথম-প্রথম 'পল্লী-পাঠাগার-ধুরন্ধর' স্বয়ং অথবা তাঁর সহকারী কেউ এসে একদিন সেই গ্রামের আতিথ্য গ্রহণ করেন। লৌহ-কর্ম্মকারের কলাকৌশল শিখিবার লোক রয়েছে বটে, কিন্তু তারা অনেকেই নিরক্ষর বা সামান্য লেখাপড়া জানে। 'ধুরন্ধর' মহাশয় বা তাঁর সহকারী বই পড়ে পড়ে নানারকম ছবি দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে বসে গেলেন, তার ফলে হয়ত সে-গ্রামে পেতলের নিব তৈরী আরম্ভ হ'য়ে গেল।

আবার, যে বইগুলি আসছে, তার এক তালিকা, কয়েক কপি ক'রে কিছু-দিন পূর্ব্ব থেকে সেই গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কেবল লিষ্ট-ই নয়, তাতে আবশ্যক মত কোনো-কোনো বিশেষ বই-এর কিছু কিছু পরিচয়ও থাকে। তারাবাই-এর সার্কাস পার্টি কোন সহরে পৌছিবার অনেক পূর্ব্ব থেকে যেমন তার এজেণ্ট নানারূপ প্লাকার্ড ও বিজ্ঞপ্তি দিয়ে লোকের মনে একটা ধারণা জন্মিয়ে দেয় যে তারাবাই একটি স্ত্রীলোকে হ'য়ে কী বল সঞ্চয় করেছে ও কৌশল শিখেছে যে, তিন-মণের পাথর চুলে বেঁধে তুলতে পারে!—ঠিক সেইভাবে না হ'লেও অনুরূপ উপায়ে পুস্তক-পরিচয় দিয়ে পূর্ব্ব থেকেই পাঠকের মনে আগ্রহ জন্মিয়ে দেওয়া হয় এবং তার পরে বই-এর বাক্স পৌছে যায়।

এইভাবে লাইব্রেরীর সহায়তার বরোদা রাজ্যের প্রজারা স্ত্রী-পুরুষে উন্নতির

পথে চলেছে। দক্ষিণ ভারতে মহীশূর রাজ্যে এক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে বরোদার মত দ্রুত নিরক্ষরতার হ্রাস হচ্ছে না দেখে, তারাও লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার দিকে মন দিয়েছেন।

এতদ্ব্যতীত বে-সরকারী চেষ্টায় অন্ধ্র দেশে এককালে উত্তম কাজ হয়েছে। উড়িষ্যার দক্ষিণে মাদ্রাজ সহর অবধি, পশ্চিমে নিজাম-রাজ্য পর্য্যন্ত যে ভূখণ্ড রয়েছে তাহাই অন্ধ্র দেশ। সেখানকার ভাষা তেলুগু। অন্ধ্র-পল্লী-পাঠাগার পরিষতের চেষ্টায় সে-দেশে বেশ সুন্দর কাজ হচ্ছিল। কিছুদিন থেকে তাদের উপর সরকারের সন্দেহ ও জুলুম চলছে ব'লে সেখানকার লোকশিক্ষার এই প্রধান যন্ত্রটি ক্ষীণবেগে চলছে।

পাঠাগার

নীহাররঞ্জন রায়

বাঙ্গলা দেশে গ্রন্থাগার অনেকগুলি আছে, দেশে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যার অনুপাতে, তার সংখ্যা একেবারে কম নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে স্কুল-কলেজগুলিতে যে-সব লাইব্রেরী আছে তা ছাড়াও দেশের সর্ব্বত্র, গ্রামে ও শহরে, অনেকগুলি পাঠাগার বর্ত্তমান ; কিন্তু একটু অনুসন্ধান ক'রে দেখলেই দেখা যাবে, সেগুলি নামে মাত্র গ্রন্থাগার। কলকাতায় রোটারি ক্লাবে একটি বক্তৃতায় আমি দেখিয়েছিলাম যে কলকাতা কর্পোরেশনের সাহায্যপ্রাপ্ত যে সকল গ্রন্থাগার আছে সেগুলিও নামে মাত্র গ্রন্থাগার ; এবিষয়ে আমাদের পৌরকর্ত্তৃগণ কোনরূপ নীতি ও নিয়ম দ্বারা পরিচালিত না-হয়ে লক্ষ্যহীন ভাবেই চলেছেন। এ-অবস্থায় আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য, এইসকল গ্রন্থাগারে পরিচালকদের নিকট এই কথা নিবেদন করা যে গ্রন্থাগারের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পন্ন করতে হলে. গ্রন্থাগার-গুলিকে নূতন ধারায় পুনর্গঠিত করা একান্ত প্রয়োজন।

আমি স্কুল-কলেজের অন্তর্গত গ্রন্থাগারগুলি সম্বন্ধেই প্রথমে সাধারণ ভাবে কিছু আলোচনা করব।

আমাদের স্কুল-কলেজের নিয়মানুসারে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একটি গ্রন্থাগার রাখতে হয়, এবং সেগুলিতে যাতে একটি নির্দ্দিষ্ট মান রক্ষিত হয়, স্কুল-কলেজের পরিদর্শকদের সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখবার কথা। কিন্তু এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের লক্ষ্য কি হওয়া উচিত এ-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতারই পরিচয় দেয় এ-সব গ্রন্থাগার। এই জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত, ছাত্রদের মধ্যে অধ্যয়নপ্রবৃত্তি, গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সজাগ বুদ্ধি ও অনুসন্ধিৎসার উন্মেষ সাধন। কিন্তু আমাদের বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলি দ্বারা এর কোনটিই সম্পন্ন হয় না। আমাদের বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা গ্রন্থাগারকে যথোপযুক্ত স্থান ও সম্মান দেন নি। প্রায়ই দেখা যায়, বিদ্যালয়ের সর্ব্বাপেক্ষা অন্ধকার ঘরটিতে গ্রন্থাগারের অবস্থান, গ্রন্থসম্ভার যথেষ্ট নয়, পুস্তক নির্ব্বাচন ও ক্রয়ে কোন নিয়ম অনুসৃত হয় না ; পুস্তক-তালিকা বিজ্ঞানসম্মত নয়, এবং বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকা এত গুরুভার যে তাতে ছাত্রদের আর গ্রন্থালয় ব্যবহারের উৎসাহ থাকে না ; গ্রন্থাধ্যক্ষেরও এমন শিক্ষাদীক্ষা নেই যাতে তিনি পাঠকদের সৎপরামর্শ বা উপদেশ দিতে পারেন।

এ-বিষয়ে প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে, সুশিক্ষিত গ্রন্থাধ্যক্ষ নিয়োগ; তাঁকে বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও শিক্ষকদের সমান মর্য্যাদা, ক্ষমতা ও বেতন দিতে হবে। লাইব্রেরী ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত বিষয় সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে ও প্রণালীবদ্ধভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করতে হবে। লাইব্রেরী সম্বন্ধে স্কুল-কলেজের কর্তৃপক্ষদের মনোভাব সর্ব্বাগ্রে পরিবর্ত্তন করতে হবে। এ-প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে আসে আর্থিক অভাবের চেয়ে গ্রন্থাগারের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবের প্রশ্নটাই বড়। কর্ত্তৃপক্ষ যদি ক্লাস ঘরের ও ল্যাবরেটরির ব্যবস্থা করা আবশ্যক মনে করেন, তবে লাইব্রেরী সম্বন্ধে যথেষ্ট ব্যবস্থা করতে কেন পারবেন না? তাঁরা যদি শিক্ষককে বেতন দিতে পারেন; তবে গ্রন্থাধ্যক্ষকে কেন বেতন দিতে পারবেন না? অধ্যাপনার ব্যবস্থা করা যদি একান্ত আবশ্যক মনে করেন তবে গ্রন্থাগারের পরিপুষ্টি সাধন সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা প্রয়োজনীয় মনে না করবার কোন কারণ নেই।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মিলনের অনেক কাজ করবার আছে। শুধু কর্ত্তৃপক্ষের মনোভাব পরিবর্ত্তন করতে পারলেই যথেষ্ট হবে না। আমাদের বিদ্যালয়গুলির স্বল্প অর্থবলের সাহায্যে সহজসাধ্য কর্ম্মপন্থার নির্দ্দেশ করা এবং সেই কর্ম্মপন্থা কর্তৃপক্ষকে গ্রহণ করানো আবশ্যক। সুখের বিষয় কলেজের গ্রন্থাগারগুলির উন্নতিবিধান সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবেচনাধীন আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাধ্যক্ষরূপে কিছুদিন পূর্ব্বে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানের অধীন সমস্ত কলেজের গ্রহণযোগ্য একটি গ্রন্থাগার-পরিকল্পনা, ও কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষদের জন্য লাইব্রেরিয়ানশিপ ডিপ্লোমার প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে উপস্থিত করি। সেই প্রস্তাবনুযায়ী কাজ করলে পাঁচ-ছয় বৎসরের মধ্যে সব কলেজের লাইব্রেরিয়ানগণ গ্রন্থাগারিক বিদ্যায় শিক্ষিত হতে পারবেন, এবং কলেজ কর্তৃপক্ষগণ গ্রন্থাগার সংগঠনের পরিকল্পনা কার্য্যে প্রয়োগ করলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই কলেজ-লাইব্রেরীগুলি সুগঠিত হয়ে উঠবে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কি সিদ্ধান্ত করেন, তার উপর সব নির্ভর করে। আমাদের স্কুলগুলি সম্বন্ধেও এইরূপ পরিকল্পনা ও প্রস্তাব প্রয়োজন। আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার-সাধনে গ্রন্থাগারের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা একটি প্রধান অঙ্গ, একথা স্মরণ রাখিতে হবে।

আমাদের দেশে কোন কোন স্থানে ক্রমশ প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন আরম্ভ হয়েছে। কর্তৃপক্ষগণ এই সকল বিদ্যালয়ের সঙ্গে ছোট একটি শিশু-গ্রন্থাগার চালনার কথা চিন্তা ক'রে দেখলে ভাল হয়। এই শিশু-গ্রন্থাগারে নির্ব্বাচিত সচিত্র কিছু বই, ম্যাপ, চার্ট, ছবি এই সব থাকবে, ঘরের ভিতরে খেলাধুলার ব্যবস্থাও থাকবে। এই রকম লাইব্রেরী খুব ব্যয়সাধ্য নয়। একটি বড় ঘর, বসবার জন্য

মাদুর বা আসন, বৎসরে পঞ্চাশ টাকা ব্যয়বরাদ্দ, এবং শিশুশিক্ষাতত্ব ও গ্রন্থাগার-বিদ্যায় শিক্ষিত একজন শিক্ষক এই হ'লেই প্রাইমারী স্কুল-সংশ্লিষ্ট শিশু-গ্রন্থাগার আরম্ভ করা যেতে পারে। কলকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষাবিভাগে অনেকগুলি মডেল প্রাইমারি স্কুল আছে ; এইগুলির সঙ্গে আদর্শ শিশু-গ্রন্থাগার পরিচালনার কথা আমি রোটারি ক্লাবে এক বক্তৃতায় বিশদভাবে আলোচনা করেছি।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মিলনের সামনে এখনও একটি প্রধান কর্ত্তব্য পড়ে রয়েছে, অবৈতনিক সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আমাদের দেশের শাসকদের সজাগ করে তোলা। আধুনিক জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ন্যায় সাধারণের নিকট বিনা ব্যয়ে উন্মুক্ত পাঠাগারও যে একান্ত আবশ্যক, এ সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করে তুলতে হবে। সাধারণ গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে কলকাতার কথা আমি রোটারি ক্লাবে আলোচনা করেছি। এখানে মফঃস্বলের কথা আলোচনা করব। সাধারণ গ্রন্থাগার পরিচালনা করা যে মিউনিসিপ্যালটির একটি প্রধান কর্ত্তব্য, এ সম্বন্ধে মফঃস্বলের মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে সজাগ করতে হবে। অনেক মিউনিসিপ্যালিটি স্থানীয় গ্রন্থাগারে সাহায্য করে থাকেন, এ কথা সত্য। কিন্তু এই সকল গ্রন্থাগার অধিকাংশ স্থলেই গ্রন্থাগার নামের অযোগ্য। অবশ্য, অনেক মিউনিসিপ্যালিটি আর্থিক ব্যাপারে সচ্ছল নয় ; কিন্তু কয়েকটি মিউনিসিপ্যালিটি ইচ্ছা করলেই এ-বিষয়ে কাজ আরম্ভ করে দিতে পারেন। মিউনিসিপ্যালিটির সীমার মধ্যে গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য অর্থব্যয় করতে কোন আইনগত বাধাও নেই। মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরী সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মিলন সহজেই প্রস্তুত করতে পারেন। যে সকল মিউনিসিপ্যালিটির অবস্থা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল তাঁরা ইচ্ছা করলেই সে পরিকল্পনাকে রূপ দিতে পারেন। অনেক মিউনিসিপ্যালিটি এখন শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য পার্ক প্রভৃতির ব্যবস্থা করছেন ; তেমনি মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি কল্পে তাঁদের গ্রন্থাগার-স্থাপনাতেও ব্রতী হওয়া দরকার। আমাদের জেলা-বোর্ড বা ও ইউনিয়ন বোর্ডগুলিকেও এইভাবে সজাগ ক'রে তুলতে হবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মিলনের চেষ্টার ফলে, এই সকল বোর্ডের পক্ষে লাইব্রেরীর জন্য অর্থব্যয় করতে এখন আর কোন আইনগত বাধা নেই। কোন কোন বোর্ড স্থানীয় গ্রন্থাগারগুলিকে কিছু কিছু সাহায্যও করেছেন। কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। ডিষ্ট্রিক্ট ও ইউনিয়ন বোর্ডগুলির উচিত গ্রন্থাগার স্থাপনা ও চালনা নিজেদের কর্ত্তব্যের অঙ্গীভূত করে নেওয়া এবং সর্ব্বত্র সহজে বই সরবরাহ করবার ব্যবস্থা করা।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সমিতি আর একটি প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারেন—যে-সকল গ্রন্থাগার দেশের নানাস্থানে বর্ত্তমান আছে, সেগুলির সুব্যবস্থা ও সুপরিচালনা সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়া। এই সকল গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষদের গ্রন্থাগার বিদ্যায় শিক্ষিত ক'রে তুলতে হবে। পুস্তকের শ্রেণীবিভাগ, তালিকা-প্রণয়ন ও গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্বন্ধে সর্ব্বত্র যাতে একরূপ নিয়ম অনুসৃত হয়, সে-সম্বন্ধেও অবহিত হ'তে হবে।

পাঠাগার

—ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস

স্বাধীন দেশগুলি বেড়ালে দেখ্‌তে পাওয়া যায় শিক্ষাই স্বাধীনতার স্বরূপ। কিন্তু শিক্ষা পাওয়া যায় কোথা হতে তাই হলো বিবেচ্য বিষয়। আমাদের গ্রামে-গ্রামে পাঠাগার গড়ে উঠ্‌ছে ; অনেকে হয়ত ভাবছেন শিক্ষার বেশ প্রসার হচ্ছে। কিন্তু পাঠাগার মোটেই শিক্ষার বাহন নয়। স্বাধীন দেশগুলিতে আমরা যেমন করে ধুতি, চাদর কামিজ, ডাল, চাল কিনি, তেমনি করে তারা কেনে সংবাদ পত্র এবং বই। বই এর দোকানে গিয়ে শুনা যায়, নূতন কোন বই আস্‌ল? পুরাতন বই পাঠ শেষ হয়েছে নূতনের চাহিদা প্রত্যহ বেড়ে যাচ্ছে। তাদের দেশ স্বাধীন, শিক্ষা বাধ্যতামূলক, তাই হুহু করে বই বিক্রি হয়, সংবাদ পত্র বিক্রি হয়। তাদের টাকাকড়ি আছে এসব কিন্‌তে পারে। কিন্তু আমাদেরত অন্নের সংস্থান নেই, বাধ্যতামূলক শিক্ষা নেই, আমরা বই বা সংবাদ পত্র কিন্‌ব কোথা হতে? তাই আমরা গড়ে তুলেছি পাঠাগার। প্রকৃত পক্ষে বিদেশে পাঠাগার মানে হলো যথায় দুষ্প্রাপ্য বই পাওয়া যায়, যথায় হয় স্কলারদের সমাবেশ, যথায় হয় মস্তিষ্কের পূর্ণ বিকাশ।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলছি, অন্ধের যষ্টি "পাঠাগার" বেঁচে থাক ; দরিদ্র এবং পরাধীন দেশে এই যে আছে তার জন্য পাঠাগার পরিচালকদিগকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ দিচ্ছি।

গ্রন্থাগার

—সুকুমার সেন

গ্রন্থ ও গ্রন্থগারের ক্রমবর্ধমান গৌরবের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। গ্রন্থের গ্রন্থি-বন্ধনের মধ্যে দিয়েই মানুষের মনীষা উর্ধ্বগামী। আর গ্রন্থাগার হল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিশ্ববিদ্যালয়। গ্রন্থ আমাদের ইতিহাসে চিরপরিচিত বলতে পারি। যতদূর জানি বই বোঝাতে গ্রন্থ শব্দটির ব্যবহার প্রথম পাণিণির সূত্রেই পেয়েছি। কিন্তু আমাদের ভাষায়—সংস্কৃতে, প্রাকৃতে, আধুনিক ভাষায় গ্রন্থাগারের (লাইব্রেরির) কোন প্রতিশব্দ ছিল না। (ইংরেজী লাইব্রেরী কথাটিও খুব পুরাণো নয়, এসেছে ফরাসী librairie "বইয়ের দোকান" থেকে।) প্রাচীনকালে আমাদের দেশে যাঁরা বিদ্যাচর্চা করতেন তাঁরা তিন শ্রেণীর ব্যক্তি ছিলেন (১) ব্রাহ্মণ্যপন্থী পণ্ডিত, (২) বৌদ্ধভিক্ষু, (৩) জৈন আচার্য। এঁদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যপন্থীরা জোট বেঁধে বিদ্যাচর্চা করতেন, স্বতন্ত্রভাবে নিজের নিজের ঘরে থেকে কাজ করতেন, ছাত্ররা গুরুদের কাছে থেকে বা দূরে থেকে পাঠ নিত, বই কপি করত। অপর দু'শ্রেণীর পণ্ডিতেরা সাধারণতঃ বিহারে অথবা মঠে থেকে সমবেত ভাবে, এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো, লেখাপড়া করতেন। বৌদ্ধ-বিহারে ও জৈন-মঠে গ্রন্থালয় বা লাইব্রেরি অর্থাৎ পুস্তকসংগ্রহ ছিল, এখন যেমন আছে রাজপুতানায় ও গুজরাটে কোন কোন জৈনমন্দিরে ও মঠে এবং তিব্বতে লামাদের মঠে। কিন্তু সাহিত্যে লাইব্রেরীর কোন নাম নেই। তবে আশ্চর্যের বিষয় লাইব্রেরিয়ানের প্রতিশব্দ আছে। গুপ্তদের আমলে বিশিষ্ট এক রাজকর্মচারীর পদের নাম ছিল "পুস্তপাল"। কিন্তু তিনি ঠিক লাইব্রেরিয়ান ছিলেন না কেন না তখনকার রাজা বা শাসন-কর্তাদের বইয়ের সঙ্গে বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না। পুস্তপাল ছিলেন রেকর্ড-কীপার এবং একাউণ্ট্যাণ্ট। 'পুস্ত' থেকে যখন 'পুস্তক' হয়েছে তখন "পুস্তপাল পদবী লুপ্ত। অনেক পরবর্তী কালে, ঠিক কখন বলা যায় না, রাজভাণ্ডারের পুথিপত্র যিনি তত্ত্বাবধান করতেন তাঁর পদবী হয়েছিল 'গ্রন্থাধিকৃত'। মল্লভূমির বৈষ্ণব-রাজারা এবং তাঁদের অন্তঃপুরিকারা লেখাপড়ার চর্চা করতেন। মল্লরাজসভায় 'গ্রন্থাধিকৃত' ছিল। এই পদবীটি পরে বংশমর্যাদাসূচক পদবীতে পরিণত হয়ে এখন 'গাঁথাইত' হয়েছে। যেমন হয়েছে, 'সেবাধিকৃত' থেকে 'সেবাইত', 'ঘোটকাধিকৃত'

থেকে 'ঘোড়াইত' ইত্যাদি। গ্রন্থাধিকৃত শব্দটি বাংলা পরিভাষায় গৃহীত হলে ভালো হত।

আপনাদের এই সংস্থা ১৯২৫ সালে স্থাপিত। খবরের কাগজের মধ্য দিয়ে এ সংস্থার ইতিহাস আমার অবিদিত নয়। আপনাদের এক বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠাতা ও উৎসাহী সদস্য স্বর্গীয় তিনকড়ি দত্ত মহাশয়ের কাছেও আপনাদের সংস্থার কথা শুনেছিলুম। আজ এ সংস্থা দৃঢ়মূল হয়েছে। সেজন্যে আমি আনন্দজ্ঞাপন করি।

গভর্ণমেণ্টের অর্থানুকূল্যে আমাদের দেশে এখন লাইব্রেরীর সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু তাতে সংস্কৃতির বিশেষ প্রসার হচ্ছে বলে আমার মনে হয় না। আগেকার ভদ্র বাঙালী বই কিনত সাধ্যমত, এবং যা সাধ্যের বাইরে অথবা অপ্রাপ্তব্য সেই বইয়ের জন্যে লাইব্রেরীতে যেত। এখন অধিকাংশ পাঠক লাইব্রেরীতে যায় গল্পের বই পড়তে। প্রয়োজনীয় বই কিছু পড়েন ছাত্রেরা। কিন্তু তাঁরাও পারতপক্ষে পাঠ্য বই কেনেন না। তাই কলেজীয় পাঠ্যপুস্তক দিয়ে লাইব্রেরী ভরাতে হয়। তার উপর বিপদ পাতা কেটে নেওয়া। এর ফলে মূল্যবান রিসার্চ ও ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরীগুলি অকেজো হয়ে যাচ্ছে। তার উপর বই চুরি তো আছেই। কিন্তু সে বিষয়ে কিছু বলতে চাই না। যে দেশে প্রত্যহ তার কেটে নিয়ে রেল চলাচল বন্ধ হচ্ছে মালগাড়ি ভেঙে হরির লুট চলছে সে দেশে লাইব্রেরীর দুচারখানি দামি বই চুরি হওয়া এমন কিছু ভাববার কথা নয়। তবে আপনাদের ভাবতে বলি।

পাঠাগার

—আশাপূর্ণা দেবী

একটি লাইব্রেরীর পঁচাত্তর বছরে পৌঁছনো আনন্দের অবশ্যই, গৌরবের নিশ্চয়। কিন্তু অবাক কেন? —এই কেন'র উত্তরটি হচ্ছে, ভাবছি—এত বয়েস কবে হল ওর? আমার অজ্ঞাতসারে!

আসলে আমারই একদম সমবয়সী এই লাইব্রেরীটি যে পাড়ায় জন্মলাভ করে বর্ধিত হয়েছে, বা হতে থেকেছে আমিও তো সেই পাড়ারই মেয়ে। অর্থাৎ দু'জনের একই সঙ্গে বাড়বৃদ্ধি। তবে আমার বাল্য কৈশোরে ওর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন হয়নি কেন?

যখন পাড়ার কাছাকাছি গোটা তিনচার লাইব্রেরী থেকে বইয়ের জোগান আসা সত্ত্বেও 'ক্ষুধার উপযুক্ত পূর্তি হচ্ছেনা, এবং আক্ষেপ হচ্ছে আরো লাইব্রেরী নেই কেন পাড়ায়, তখন তো ওই 'বয়েজ ওন্ লাইব্রেরী' থেকে বই আসতে দেখিনি। কী জানি, কেন দেখিনি। আহা, জানা থাকলে আর একটি রত্ন ভাণ্ডার তো হাতে পাওয়া যেত।

লাইব্রেরী মানেই তো রত্ন-ভাণ্ডার। আহরণ করতে সাধ যায় সবই। পৃষ্ঠ-পোষিকা ছিলেন অবশ্য আমার মা। তা আমার তো 'পাঠ ক্ষুধা' দুরন্ত। কাজেই বইয়ের যোগান আসছে 'জ্ঞানবিকাশ' 'চৈতন্য' 'রামমোহন' 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ', চারদিক থেকে 'বয়েজ ওন্‌কে' পেলে আরও একটা পাঠকতো বাড়ত!

তবে সবই পরমুখাপেক্ষিতার ব্যাপার। কেবলই মনে হতো, আহা যদি সেই স্বর্গীয় স্থানে নিজে গিয়ে পড়ে রত্ন ভাণ্ডারগুলি হাতড়াতে পেতাম, তা'হলে উদয়াস্ত সেইখানেই পড়ে থাকতাম। সেখানে কত কত বই ঠাসা আলমারীর সারি! দু'খানি চারখানি করে এনে নিয়ে আর কতই বা পড়া হয়? মনে মনে স্বপ্ন দেখতাম বই ভর্তি ভর্তি বড় বড় আলমারীর সারি সাজানো সব লাইব্রেরীর ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, দেখছি, নিজে নিজে বই বেছে নিয়ে বসে পড়ছি একটি কোণে।

এখনকার ছেলেমেয়েরা হয়তো ভাবতে পারে এর আবার স্বপ্ন দেখাদেখি কী? কী এমন ব্যাপার? পাঠাগারে গিয়ে পাঠ করাটা তো বে-আইনী নয়?

তাদের কি আর সহজে বোঝানো যাবে ষাট বাষট্টি বছর আগের উত্তর কলকাতার একটি অতিরক্ষণশীল পরিবারের কোনো মেয়ের পক্ষে এমন অনাসৃষ্টি ইচ্ছেটা কতখানি বে-আইনী!

পরবর্তীকালে যখন নানা পাঠাগারে নানান অনুষ্ঠান উৎসবে গিয়ে পৌঁছবার

সুযোগ হয়েছে, কৈশোরকালের সেই স্বপ্ন বাসনা মনে পড়ে যাওয়ায় একটু কৌতুকের হাসিই এসেছে।

যে কোন প্রতিষ্ঠানেরই প্রতিষ্ঠিত দীর্ঘ জীবনের অন্তরালে থাকে, অনেক বাধা বিপত্তি, প্রতিকূলতা, সব কিছুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে করতেই লক্ষ্য পথে এগিয়ে যাওয়া যে কোন একটি পাঠাগারের ক্ষেত্রে তো সেটি আরোই বেশী। কারণ তাদের ইতিহাস উন্মোচন করলে প্রায়শঃই দেখা যায়, সূচনাকালে তার মূলধন থাকে, মাত্র কয়েকটি স্বপ্ন-দেখিয়ে তরুণের অদম্য উৎসাহ, অফুরন্ত মনোবল, অনলস সাধনা, আর দাতব্যে পাওয়া কিছু বই, আর নড়বড়ে ছুটো র‍্যাক। কিন্তু সত্যিকার শুভ প্রেরণা কখনো ব্যর্থ হয় না। তাই অযাচিত ভাবে এসে যায় সহযোগিতা, সহায়তা। অঞ্চলের শুভবোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা অনুধাবন করেন, সমাজ-জীবনে একটি সৎ আদর্শসসম্পন্ন লাইব্রেরীর প্রয়োজনীয়তা কতখানি, উপকারিতা কতটা।

ক্রমশঃ পাঠক সমাজের চাহিদা ওঠে বেড়ে। প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠার স্পর্শ লাগে। ক্রমে ক্ষুদ্র থেকে বৃহতের রূপ পায়। যেমন চারাগাছটি থেকে মহীরুহ।... ধাপে ধাপে জয়ের নিশান বয়ে নিয়ে এগোতে থাকে রজত জয়ন্তী থেকে স্বর্ণজয়ন্তীতে, স্বর্ণজয়ন্তী থেকে 'হীরকে', আর হীরক থেকে প্ল্যাটিনামে। অতঃপর শতবার্ষিকীর পথ ধরে শত শত বর্ষের লক্ষ্যে।

এই পথ পরিক্রমার প্রধান প্রাণশক্তি উদ্যোক্তাদের আর কর্মীদের আদর্শে নিষ্ঠা নিরবচ্ছিন্ন সাধনা। একদা যে তরুণরা প্রথম প্রদীপটি জ্বালেন, তাঁরা মনে চিরতরুণ থাকলেও দেহে অবশ্যই তরুণ থাকেন না। বয়েস বাড়ে, কর্মক্ষমতা কমে, তখন এগিয়ে আসে নতুন হাত, নতুন মন, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী। আর সেটাই উত্তরোত্তর অগ্রগতির পথ সৃষ্টি করে চলে।

পাঠাগার মানে তো আর পাড়ার বাসিন্দাদের 'ইচ্ছা মত' বই জোগানো নয়, পাঠাগার গড়ে তোলা, এবং তাকে সমৃদ্ধ করে তোলা রীতিমত একটি সমাজ সেবা। সমাজ মানসকে রুচিশীল করে তোলার অনেকখানি দায়িত্ব পাঠাগার পরিচালকদের।

বললে বাহুল্য বলা হবে না একটি প্রতিষ্ঠাপন্ন পাঠাগার তার পরিচালকগণের একটি বড় শক্তি। এই শক্তিকে সুস্থ শুভ তার কল্যাণ-বোধের পথে চালিত করতে পারলে সমাজের রুচি গড়ে তোলা অসম্ভব নয়। যদি আদর্শে সেটি থাকে।

'বই পড়ুন, ভাল বই পড়ুন, বাছাই করে বই পড়ুন', এই নীতিবাক্যটি লাইব্রেরী ঘরে টাঙিয়ে রেখে, পাঠকের হাতে সৎ মহৎ চিরায়ত সাহিত্যের পশরা এগিয়ে দেওয়াই হচ্ছে পাঠাগারের রূপকারের কাজ।

গ্রাম্য লাইব্রেরী

চারুচন্দ্র রায়

বাংলা দেশে শতকরা দশ জনের অক্ষর পরিচয় আছে। বাকী সব নিরক্ষর—নিরক্ষর হইলেও অজ্ঞান নহে ইহা বলাই বাহুল্য এবং উক্ত শতকরা দশ জনের মধ্যে কয়জন নিরক্ষর নহে বলিয়া মূর্খ নহে তাহা শপথ করিয়া বলা যায় না। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন হইলে জ্ঞানের প্রচার সহজ হয় বটে, কিন্তু জ্ঞান বিস্তারের পক্ষে সাক্ষরতা একান্ত প্রয়োজন হইলে আমাদের দেশে জ্ঞান বিস্তারের পথ অতিশয় সঙ্কীর্ণই থাকিয়া যাইত। ভারতের অতীত ইতিহাস হইতে আমরা জানি যে নিরক্ষরতা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে জ্ঞানের গভীরতম তত্ত্ব সকল লোক সমাজের নিম্নতম স্তরেও প্রসারিত হইয়াছিল এবং ভারতবাসী বলিতে যে চরিত্র বুঝায় তাহা গড়িয়া তোলা সম্ভব হইয়াছিল। যে কোন ভাষাভাষী হউক, লিখিতে পড়িতে জানুক আর নাই জানুক, হিন্দুকে দেশনেতৃত্বগণ এমন একটা ছাপ দিয়াছিলেন যে বহু বিপর্য্যয়ের মধ্যেও সে ছাপ আজও মুছে নাই। দাক্ষিণাত্যে শিক্ষাকেন্দ্র হইতে বহুদূরে অবস্থিত সামান্য গ্রামের নিরক্ষর অধিবাসীকে আমার হিন্দু বলিয়া তাহার ভাষা না জানিয়াও, চিনিতে কিঞ্চিৎ মাত্র কষ্ট হয় নাই। এই ছাপ লেখা পড়া শিখাইয়া তাহার পর দেওয়া হয় নাই, কারণ ঐ গ্রামবাসীগণ তখনও নিরক্ষর ছিল—এখনও নিরক্ষর আছে। কিন্তু এই যে একটা ছাপ তাহাদের অন্তরে বাহিরে পড়িয়া গিয়াছে তাহা কি উপায়ে সাধিত হইল? আমি দুইটী ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

প্রথম বৌদ্ধ ধর্ম। কপিলাবস্তুর রাজপুত্র যে বেদ বহির্ভূত ধর্ম্ম বেদাশ্রিত ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বন্যা-প্রবাহের ন্যায় প্রসারিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা কোন্ ভাষা, কোন্ অক্ষর জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া সংসাধিত হইয়াছিল? বৌদ্ধ শাস্ত্র যে ভাষায় লিখিত আছে অর্থাৎ পালী তাহা ভারতবর্ষের সার্ব্বজনীন ভাষা নহে এবং সে ভাষাও যে জন-সমাজের সকল স্তরের মধ্যে প্রসারিত হইয়াছিল তাহারও কোন প্রমাণ নাই।

দ্বিতীয় ঘটনা। চৈতন্য মহাপ্রভু পুরী হইতে দাক্ষিণাত্যে এবং বম্বাই প্রদেশে যে ভক্তি ধর্ম্ম প্রচারিত করিয়াছিলেন সে প্রচার-কার্য্য কোন্ ভাষায় সাহায্যে সংসাধিত হইয়াছিল? তেলেগু এবং তামিল ও মালেয়ালম্ ভাষা-ভাষী পণ্ডিত

হইতে মূর্খ পর্য্যন্ত সকল লোকে বাঙালী চৈতন্য দেবের হৃদয়ের কথা কিরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল? কোনও পুস্তকের সাহায্যে, পঠন ও পাঠনের দ্বারা যে এ কার্য্য সাধিত হয় নাই তাহার প্রমাণ আছে। আর এই দুই ঘটনা হইতে আমরা বুঝি যে জ্ঞানের কথা বা হৃদয়ের কথা অক্ষর সাহায্যে প্রচার সহজ হইলেও—প্রচার কার্য্যের একমাত্র নির্ভর নহে।

নিরক্ষর শতকরা নব্বই জন। অতএব জ্ঞান বিস্তারের পথ প্রায় রুদ্ধ এ কথা কেহ যেন মনে না করেন এবং যত দিন লোকে লেখাপড়া না শিখিতেছে ততদিন আমাদের বেশী কিছু করিবার নাই এ কথাও কেহ যেন মনে না করেন। গ্রামে গ্রামে প্রাইমারী স্কুল, জ্ঞান বিস্তারের একমাত্র পন্থা নহে। সুতরাং স্কুল স্থাপনের দিকে যতই ঝোঁক দেওয়াই হউক—জ্ঞান বিস্তারের জন্য স্কুলের উপর একান্ত ভাবে নির্ভর করিয়া থাকিলে একশত বৎসরে শতকরা দশ জন যদি সাক্ষর হইয়া থাকে তাহা হইলে, আর নব্বই জনকে সাক্ষর করিতে অন্ততঃ আরও পাঁচ শত বৎসর লাগিবে। যে উপায়ে জ্ঞান বিস্তার করা যায় এবং সকল জ্ঞানের চরম জ্ঞান—আধ্যাত্ম জ্ঞান যে উপায়ে লাভ করা যায়—বুদ্ধদেব ও চৈতন্যদেবের ইতিহাস হইতে তাহা আমরা বুঝিতে পারি। সেই উপায়—ব্যক্তিত্বের আদর্শ। সেই আদর্শ কার্য্যে ও কথায় বিকশিত হইয়া উঠিলে—এক জনের নিকট হইতে আর এক জনের নিকট সেই আদর্শ বিসর্পিত হইতে থাকে। সাক্ষরতা তাহার ক্ষীণ সহায়ক মাত্র এবং নিরক্ষরতা তাহার প্রতিবন্ধক নহে।

তবে নিরক্ষরতাকে সত্বর দূর করিতে পারিলে আদর্শ সংযুক্ত হইয়া প্রচার কার্য্যে সহায়তা করিতে পারে। নিরক্ষরতা যতদূর হইবে পঠন পাঠন ততই বাড়িবে কিন্তু আদর্শের মূল্য এবং প্রয়োজনীয়তা সকল অবস্থাতেই বলবৎ থাকিবে।

বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষাকার্য্যের সহায়করূপে গ্রামে গ্রামে পুস্তকাগার স্থাপনের একটা হুজুক আসিয়াছে। আমি ইহাকে হুজুক বলিলাম কারণ আমি বিশ্বাস করি না যে কোন গ্রাম্য পুস্তকাগারের সাহায্যে নিরক্ষর গ্রামবাসীর নিরক্ষরতা বিদূরিত হইবে। যে নিরক্ষর তাহার পক্ষে গ্রামের লাইব্রেরী "কিবা রাত্র কিবা দিন"। কিন্তু এই গ্রামের লাইব্রেরীকে এমন একটী রূপ ও গঠন দেওয়া যাইতে পারে এবং এই লাইব্রেরীর এমন ব্যবহার করা যাইতে পারে যদ্দ্বারা নিরক্ষর হইয়াও গ্রামবাসী লাইব্রেরীর পুস্তক সকলের মধ্যগত জ্ঞান সহজে আয়ত্ব করিতে পারে, আর ঐ লাইব্রেরী বিদ্যা দানের প্রকৃত সহায়ক হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারে।

প্রথম কথা এই যে আমাদের দেশে লাইব্রেরী সকল (দুই একটী বড় লাইব্রেরী

ছাড়া) জীবন-মৃত অবস্থায় বর্ত্তমান আছে—তাহার কারণ শতকরা নব্বই জন নিরক্ষর এবং সাক্ষর দশ জনের মধ্যে অধিকাংশই মূর্খ। আমাদের দেশে বড় লাইব্রেরী চিরকালই ছিল—নালন্দা, বিক্রমশীলা ইত্যাদি—কিন্তু তাহা নিরক্ষরের জন্য ছিলনা পণ্ডিতের জন্যই ছিল। আজকালকার যে সকল বড় বড় লাইব্রেরী আছে তাহাও পণ্ডিতের জন্যই আছে মাত্র—নিরক্ষরের জন্য নহে। গ্রাম্য লাইব্রেরীকে যতই সমৃদ্ধ করা যাউক—তাহাকে জ্ঞান বিস্তারের সহায়ক করিতে হইলে—মাত্র পুঞ্জীকৃত পুস্তক সকল সে কার্য্যে সহায়তা করিবে না। এই সকল পুস্তকাগারকে সমৃদ্ধ করিয়া, যে উপায়ে চিরদিন আমাদের দেশে ও অন্য দেশেও জ্ঞানের বিস্তার সাধন করা হইত—সেই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। অর্থাৎ "পুস্তকস্থা যা বিদ্যা" তাহাকে একজন, দুজন, দশজন আয়ত্ব করিয়া মুখে মুখে সেই পুস্তক অবলম্বন করিয়া গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে দশজনকে ডাকিয়া পাঠ করিতে হইবে, ব্যাখ্যা করিতে হইবে—নিরক্ষর হইলেও গ্রামবাসীর সহজ বুদ্ধির সাহায্যে, রসের কথা, জ্ঞানের কথা, তত্বের কথা, তাহাদের হৃদয়ে প্রসারিত করিয়া দিতে হইবে। কবে নিরক্ষরতা দূর হইবে, কবে সেই গ্রামবাসীগণ গ্রামের পুস্তকাগার হইতে পুস্তক লইয়া জ্ঞান আহরণ করিয়া নিজ নিজ জীবন জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিবে তাহার প্রত্যাশায় বসিয়া থাকিলে চলিবে না। এখানেও এবং পুরাকালেও প্রচারকের আদর্শ চরিত্র, অধ্যবসায় এবং আন্তরিকতা—জ্ঞান বিস্তারের একমাত্র কৌশল। পুস্তকাগার একটা উপলক্ষ্য মাত্র।

বাংলার লাইব্রেরী

শিবশঙ্কর মিত্র

ঐতিহাসিকেরা প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগের সভ্যতার পরিমাপ করিতে গিয়া লৌহ-ধাতুকেই মানদণ্ড বলিয়াই ধরিয়া লইয়া থাকেন। কোন গোষ্ঠি কত পরিমাণে লৌহকে সামাজিক কাজে ব্যবহার করিতে পারিয়াছিল, তাহাতেই সভ্যতার আপেক্ষিক বিচার চলে। বর্তমান যুগের অধুনাতম সভ্যতাকে যদি বিচার করিবার তেমন কোন পরিমাপ কাঠি নির্ণয় করিতে হয়, তবে সংবাদপত্র এবং গ্রন্থাগারই উপযুক্ত মানদণ্ড। একটা দেশের গ্রন্থাগারের সংখ্যা, তাহার আদর ও মর্যাদা দেখিয়াই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে সে সমাজ অতীত ও বর্তমানের কতখানি সঞ্চিত জ্ঞানের আলোকে মানব-কল্যাণের পথ সন্ধানে সচেষ্ট হইয়াছে।

ইহারই বিচারে বাংলাদেশের গ্রন্থাগারের সংখ্যা ও তাহার ব্যবস্থার হিসাব করিলে, আমরা সভ্যযুগে কতখানি পিছাইয়া পড়িয়াছি,, তাহা সহজেই ধরা পড়ে। আমাদের দেশে গ্রন্থাগার বা গ্রন্থাগার আন্দোলনের দুরবস্থার কথা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বহু প্রকার কারণের দোহাই মানা সহজ। আমরা পরাধীন ; সরকারের উপযুক্ত সাহায্য নাই ; দেশের লোকের পুস্তকের প্রতি মমতা নাই, পড়িবার আগ্রহও নাই ; লোকের হাতে অর্থের সংস্থান নাই—এমনি ধারা অনেক কারণই চোখের উপর ভাসিয়া উঠে। ইহাদের অস্বীকার করিবার কিছু নাই। প্রধান ও প্রথম ওজর হইল—অর্থের অভাব। কিন্তু সত্যই কি একমাত্র অর্থের অভাব এদেশে সুষ্ঠু ও সংগঠিত গ্রন্থাগার দেখা দেয় নাই ? বাংলা দেশে লাইব্রেরী পরিচালনা-শিক্ষা গ্রহণের সময় এক তিক্ত অভিজ্ঞতায় মনে হইয়াছিল, না তাহা নহে।

শিক্ষকের মুখে শুনিয়াছি ও পড়িয়াছি, পশ্চিম দেশগুলিতে গ্রন্থাগার আন্দোলন ধীরে ধীরে এক উন্নততর স্তরে পৌছিয়াছে। সে দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের স্রষ্টারা অনুভব করিয়াছেন—কোন গ্রন্থাগারের মূল প্রাণ হইল, পাঠকের পুস্তকের প্রতি আকর্ষণ। তাঁহারা অনুভব করিয়াছেন, এই আকর্ষণ সৃষ্টি করিতে পারিলে, পাঠকেরা তাহার স্বল্প উপার্জন হইতেই আপন ঐকান্তিক ইচ্ছায় গ্রন্থাগারকে ধীরে ধীরে পুষ্ট করিয়া তুলিবে। পুস্তকের প্রতি এই আকর্ষণ সৃষ্টি করিবার জন্য

সেদেশের গ্রন্থাগারিকেরা আদেশ দিতেছেন—তোমার গ্রন্থাগারের আকরে সঞ্চিত রত্নরাজিকে অবরুদ্ধ করিয়া বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিও না। সেই রত্ন-রাজিতে পৌঁছাইবার পথে, বুক ক্যাটালগ, কার্ড ক্যাটালগ, কাউণ্টার, রিকুইজেসন স্লিপ প্রভৃতির দেওয়াল সৃষ্টি করিয়া পাঠককে ঠোক্কর খাইতে খাইতে অগ্রসর হইতে দিও না। তোমার রত্নরাজির দ্বার উন্মুক্ত কর। পাঠক ইহার সঞ্চিত পুস্তকের সারিতে পৌঁছাইয়া তাহার কাম্য জ্ঞান-ভাণ্ডার যাচাই করিয়া লউক। তুমি শুধু তোমার জ্ঞান-ভাণ্ডারকে বিজ্ঞানমত সাজাইয়া রাখ। এই ব্যবস্থাকেই "অবাধগতি-গ্রন্থাগার" (Open access library) বলা হয়। পশ্চিম দেশে এই ব্যবস্থাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। লাইব্রেরী পরিচালনা-শিক্ষা গ্রহণের সময় আমরাও শুনিলাম, ইহাই লাইব্রেরী সংগঠনের উন্নততম আদর্শ। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের সারা বাংলা দেশে এমন একটি গ্রন্থাগার মিলিল না যেখানে এই নূতনতম সংগঠন দেখিয়া এ বিষয়ে সঠিক ধারণা করিয়া লইতে পারি।

অথচ, এই ব্যবস্থার জন্য কোন নূতন বাজেটের বা অর্থের আবশ্যকতা নাই এবং বাংলাদেশে দুই একটি ভাল ও মর্যাদা সম্পন্ন লাইব্রেরী যে নাই, এমন নয়; ইহা জানিয়া এই কথাই মনে হয়, আমাদের দেশে বহু শিক্ষিত গ্রন্থাগারিক দেখা দিয়াছেন বটে, কিন্তু গ্রন্থাগারের প্রতি ঐকান্তিক অনুরক্ত গ্রন্থাগারিক আজিও মিলিতেছে না। ইহাতে যখন অর্থের কোন সমস্যা নাই; অধিকন্তু কাউণ্টার কেরানীর খরচ যখন কমিয়া আসিবে, তখন কেন আমরা পাঠকেরা দাবী করিব না—গ্রন্থাগারিক তোমার রত্নসম্ভার আমার সম্মুখে উন্মুক্ত কর। স্থিতিশীল ও রক্ষণশীল মনোবৃত্তি পরিহার করিয়া বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং বাংলার গ্রন্থাগারিকেরা সোৎসাহে এই নূতন ব্যবস্থার পত্তন করুন, ইহাই আমরা কামনা করিতেছি।

কলিকাতার গ্রন্থাগার

সুখেন চট্টোপাধ্যায়

১৯২৬ অব্দের কলকাতার ভয়াবহ হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার কথা স্মরণ করলে এতদিন পরেও শরীর কাঁটা দিয়ে উঠে। কিন্তু এ দাঙ্গা যতই নিন্দার্হ হোক্ না কেন—এর ফল যে খুব সুদূর প্রসারী হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। হিন্দু-মুসলমানের এই দাঙ্গার পরেই হিন্দু ও মুসলমান পল্লীতে সংগঠন কার্য্য আরম্ভ হোল। ছোট ছোট ক্লাব—সিমলা ব্যায়াম সমিতির আদর্শে গড়ে উঠতে লাগল। প্রায় প্রতি ক্লাবের সঙ্গে একটি করে লাইব্রেরী দেখা দিল। সেই সময় নূতন মিউনিসিপ্যাল আইন সবে কার্য্যকরী হয়েছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আদর্শে জাতি অনুপ্রাণিত। রক্তের কণায় কণায় যেন নবজীবনের সাড়া। কর্পোরেশন অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সুরু করেছেন; আইনের বাধা অতিক্রম করে কলিকাতার লাইব্রেরীগুলিকে সাহায্য দেবার ব্যবস্থা সাব্যস্ত হয়েছে। চতুর্দ্দিকে উৎসাহ ও আনন্দ।

সুতরাং শহরে লাইব্রেরীর সংখ্যা একটু দ্রুত গতিতে বেড়েই চললো। কিন্তু ভাল জিনিষের সঙ্গে মেকী বা ঝুটা দেখা দিতে আরম্ভ করে। এখানেও সেই সনাতন নিয়মের ব্যতিক্রম হোল না। দেশে লাইব্রেরী গড়ে উঠুক, জ্ঞান বিজ্ঞানের বিস্তার হোক। দেশের অন্ধ ও অসহায় মানুষগুলো একটু জান্‌তে, একটু ভাবতে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকারের ক্ষমতা সংগ্রহ করতে প্রয়াস পাক্, এই চিন্তায় মন মাঝে মাঝে উন্মাদ হয়ে উঠতো।

জ্ঞানরঞ্জন নিয়োগী মশায় সবে আমেরিকা থেকে ফিরে এসে ছায়াচিত্রের সাহায্যে উদ্দীপনাময়ী ভাষায় দেশের দুর্দ্দশার চিত্র নির্ম্মমভাবে উন্মুক্ত করে দিচ্ছেন, সেই সঙ্গে সে সব দেশে কিভাবে গ্রন্থাগারের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাও প্রচার করেছেন। তাঁর বক্তৃতা শুনে জাতি গঠনে গ্রন্থাগারের স্থান কত উচ্চে তা অন্তরে অন্তরে অনুভব করতুম ও ভাবতুম ছোট ছোট লাইব্রেরীগুলিকে সংস্কারের ভার যদি কোনদিন আমার উপর ভগবান দেন, তাহলে একবার আপ্রাণ চেষ্টা করবো। সুযোগ মিললো। কলিকাতার লাইব্রেরীগুলি পরিদর্শন করবার কতকটা দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হোল।

কার্য্য ক্ষেত্রে নেমে নূতন অভিজ্ঞতা হোল। গ্রাণ্টের দরখাস্ত হাতে ছোট

গলির ভিতর অযথা লাইব্রেরী খুঁজেই আর তার অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। ব্রত নিয়েছি জাতি গঠনে আমার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়োগ করবো, কিন্তু কার্য্য ক্ষেত্রে দেখি আমি যেন দারোগা বা গোয়েন্দা। লাইব্রেরী কর্ত্তৃপক্ষ আমার সহিত ভয়ে ভয়ে ব্যবহার করেন। সব রেকর্ড দেখাবার সময় কেমন যেন একটা সতর্ক চাপা দেবার প্রয়াস লক্ষ্য করি। অন্তরে ব্যথা ও দুঃখ পাই। সে বছর বড়বাজার অঞ্চলে একটা লাইব্রেরী তিন দিন খুঁজে বার করতে না পেরে, একটা প্রকাণ্ড প্রাসাদের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছি, নম্বরটা কি ভুল লিখেছে ; এমন সময় মাথায় পক্কর বেঁধে এক পণ্ডিতজী দর্শন দিলেন। ব্যাপার কি পণ্ডিতজী ? আপনার লাইব্রেরী কোথায় ? উত্তরে পণ্ডিতজী গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন,—কাহে, লাইব্রেরী ত হ্যায় ? কোথায় ? হিঁয়া ? পণ্ডিতজী বলিলেন,—সংসার মায়া ! লিখ দিজীয়ে হিঁয়াই হ্যায়। মনুষ্য মায়া, সংসার মায়া, সব কুছ মায়া ! ইহার উপর তর্ক চলে না। লাইব্রেরী নাই, গ্রাণ্টের দরখাস্তে পণ্ডিতজী সবই মিথ্যা লিখেছেন, কিন্তু একটুও লজ্জা নাই, আশ্চর্য্য ! ইচ্ছা আমি মিথ্যা রিপোর্ট দিই যেহেতু সংসার মায়া।

তবে প্রশংসা করবার কিছু নেই, আমি সে কথা বল্‌ছি না। ক্লাব ও সমিতি সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারগুলিতে কাজ হচ্ছে মন্দ নয়, কিন্তু আমার বক্তব্য এগুলিকে আরও উন্নত প্রণালীতে চালাতে সাহায্য করতে হবে। গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্যকে আরও কার্য্যকরী করে তোলবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।

পাঠাগারের দুর্দ্দশা

ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সম্প্রতি কয়েকটি সাধারণ পাঠাগার পরিদর্শনের সুযোগ আসিয়াছিল। পাঠাগারগুলির নাম করিব না—কারণ আমাদের দেশে সকল পাঠাগারেরই এক অবস্থা। আলমারী হইতে নিজের ইচ্ছামত এক এক স্থান হইতে ৫।৭ খানা করিরা বই বাহির করিয়া দেখিতে লাগিলাম। গল্প ও উপন্যাসের বই গুলিরই চাহিদা বেশী—ইহা স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত। জগতের সকল লোক দার্শনিক হইয়া উঠুন—শুধু প্রবন্ধের বই বা ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করুন, ইহা কেহই চাহেন না। কিন্তু উপন্যাসগুলি খুলিলে কি দেখা যায়। বই এর উপর অতি কুৎসিত ভাষায় নানাস্থানে মন্তব্য লেখা হইয়াছে। পাঠকরা ভুলিয়া যান যে বইগুলি লাইব্রেরীর সম্পত্তি, তাঁহাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে। একজন আবার বইএর পাতায় পাতায় কুৎসিত ছবি আঁকিয়াছেন। তিনি চিত্রকর হইতে পারেন, কিন্তু লাইব্রেরীর পুস্তক তাঁহার বিদ্যাপ্রকাশের উপযুক্ত স্থান নহে। তাহা ছাড়া অধিকাংশ বইএর পাতা ছেঁড়া—বোধ হয় সেই পাতায় লিখিত বিষয়টি পাঠকের ভাল লাগিয়াছে, যে জন্য পাতাটি ছিঁড়িয়া নিজের কাছে রাখিয়া বইখানি ফেরত দিয়াছেন। সে জন্য পরবর্ত্তী পাঠকের যে অসুবিধা হইবে, সে কথা চিন্তা করিবার শক্তিও তাঁহার নাই।

আজকাল পাঠাগারের পরিচালকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছেন। সেজন্য অধিকাংশ পাঠাগারেই নাটক নভেলের সঙ্গে বহু প্রবন্ধপুস্তকও ক্রয় করা হইতেছে। ইহা যে দেশের পক্ষে সুলক্ষণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐরূপ পুস্তকের আলমারী খুলিয়া কয়েকখানি করিয়া বই বাহির করিয়া দেখিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারি নাই। দেখিলাম, অধিকাংশ পুস্তকের পাতা পর্য্যন্ত কাটা হয় নাই। বোধ হয় খবরের কাগজের সমালোচনা পাঠ করিয়া সেগুলি ভাল বই বলিয়া স্থির করা হইয়াছিল এবং সেজন্য কেনাও হইয়াছে। কিন্তু পাঠাগারে এমন একজনও সদস্য নাই, যিনি তাহা পড়িয়া দেখেন। এক সময়ে একটি পল্লীগ্রামে মসলার দোকানে বহু ইংরাজি পুস্তক স্তূপীকৃত দেখিয়াছিলাম। সেগুলি কোথা হইতে আসিল জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলাম, স্থানীয় পাঠাগারের কর্ত্তারা ঐগুলি সের দরে বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের পাঠাগারে ইংরাজি পুস্তকের পাঠক নাই—আলমারীতে স্থানাভাব—কাজেই সেই

মূল্যবান গ্রন্থগুলি মসলার দোকানে বিক্রয় করা হইল। অবশ্য বড় লোকের বাড়ীর চাকররা অনেক সময় বই চুরি করিয়া বাজারে নাম মাত্র মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে। তাহারা হয়ত ঐভাবে নেশার পয়সা সংগ্রহ করে; কিন্তু লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষকে ঐভাবে ইংরাজি পুস্তক বিক্রয় করিতে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। একটি পাঠাগারে গিয়া দেখিয়াছিলাম এক কোণে মোটা বড় বড় কতকগুলি বই অযত্নে ধূলার মধ্যে পড়িয়া আছে। সেগুলি কি তাহা পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখিলাম —শ্রীমদ্‌ভগবত। ভাগবতের ঐ সংস্করণ এখন আর বোধহয় বাজারে কিনিতে পাওয়া যায় না। সেজন্য বইগুলির ঐ অবস্থা দেখিয়া সত্যই চোখে জল আসিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, পাঠাগারে পাঠকগণের মধ্যে কেহ ঐ পুস্তক কখনও পাঠ করে না। —কাজেই ঐ বইগুলিকে আলমারী হইতে বিদায় দিয়া ঐ ভাবে ফেলিয়া রাখা হইয়াছে। পরে হয়ত একদিন সের দরে মসলার দোকানে বিক্রয় করা হইবে—তাহাতেও আশ্চর্য্য হইবার কিছু থাকিবে না।

এই ভাবে বহু ঘটনার উল্লেখ করা যায়। আমরা কি আমাদের পাঠাগারগুলিকে এই সকল ত্রুটির কথা বার বার স্মরণ করাইয়া দিয়া সচেতন করিতে পারি না? উপযুক্ত ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে আলোচনা করিলে দেশের সকল লোকই উপকৃত হইবে।

গ্রন্থাগারের ইতিহাস

গুরুদাস রায়

গ্রন্থাগারের ইতিহাস বহু প্রাচীন—অনেকে মনে করেন যে গ্রন্থালয়গুলো সবই একালের আমদানী। বর্ণমালা আবিষ্কৃত হবার বহু পূর্ব্বেই যখন মানুষ নিজের অন্তরের ভাবকণা এঁকে দেখাতে শিখেছে, তখন থেকেই গ্রন্থাগারের উৎপত্তি হয়েছে। এর প্রমাণ স্বরূপ আমি শুধু কতকগুলি বিদেশের ও দেশের দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করব। মিশরের প্রাচীন সভ্যতা ও শিল্পকলার জীবন্ত বিগ্রহ যে পিরামিড তা তৈরি করারও পূর্ব্বে, যিশুর জন্মের প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে ঐ মিশরেরই পাথরের টালির পাঠাগার এখন মাটি খুঁড়ে ব্যবহার করা হয়েছে। —আর সেই সব টালিতে শুধু আছে কতকগুলো ছবি আঁকা। তারপর আমেরিকার অধ্যাপক মিঃ হিল্‌প্রেখট্‌ ব্যাবিলনের নিপুর সহরের মাটির নীচে পঁচিশ হাজার মৃত্তিকা ফলক সমেত একটা বড় গ্রন্থাগারের ধ্বংসাবশেষ বার করেন, এবং প্রমাণ করেন যে সেটি অন্ততঃ খৃষ্টের জন্মাবার ৩।৪ হাজার বছর আগের। ১৮৫০ সালে মিঃ লেয়ার্ড নিনেভা সহরে ত্রিশ চল্লিশ ফুট খোঁড়ার পর একটা বড় বারান্দায় তেকোণা অক্ষরে লেখা কতকগুলি পাথরের টালি পান, এবং পণ্ডিতরা আবিষ্কার করেন যে সেটা বোধ হয় অ্যাসিরিয়ার রাজা সার্ডানাপলসের পাঠাগার। আর সেই পাঠাগার থেকেই "ইস্তার ও ইসতুবাল" একখানা মহাকাব্য এবং "সুমের" ও "আকাদ" নামে দুটো জাতির বহু প্রাচীন ইতিহাস এবং আরও কত কি আবিষ্কৃত হয়।

গ্রীসের বিপুল শক্তিরও ভিত্তি ছিল এই সব পাঠাগার। সেই মৌলিক সাহিত্য স্বষ্টির যুগেই ইউক্লিড পিসিসট্রেটাস্‌ প্লেটো অ্যারিষ্টটল প্রভৃতি সবারই নিজের নিজের পাঠাগার ছিল। লুসিয়ানের সময় নানারকমের নূতন নূতন পুস্তকাদি সংগৃহীত হ'তে থাকে। এমনকি শেষকালে ওটা যেন বিলাসিতার পর্য্যায় পড়ে। এবং এই সমস্ত পুস্তক সংগ্রহের ফলে আলেকজাণ্ড্রিয়ার-পাঠাগার সব পাঠাগারকে ছাপিয়ে উঠেছিল। মহাবীর আলেকজ্যাণ্ডারের সেনাপতি প্রথম টলেমি ঐখানে দুইটি গ্রন্থালয় স্থাপন করেন। —একটি ব্রুকিয়াম এবং আর একটি সেরাপিয়ামে। দ্বিতীয় টলেমী আবার এই পাঠাগার দুটিতে সর্ব্বসমেত ৬।৭ লক্ষ বই সংগ্রহ করতে পেরে-ছিলেন। তৃতীয় টলেমীর সময় উৎপীড়ন করে পুস্তক সংগ্রহের চেষ্টা চলেছিল তাই আলেকজ্যাণ্ড্রিয়ার বন্দরে যখন কোন জাহাজ বই নিয়ে আস্‌ত, অমনি জাহাজের অধ্যক্ষের কাছ থেকে বল-প্রয়োগে সে সমস্ত বই হস্তগত করা হত। এরকম করে

শুধু তারা পুস্তক সংগ্রহ করেই নিশ্চিন্ত ছিল না—নানা দেশদেশান্তর থেকে পণ্ডিত, কবি, সাহিত্যিক ও লেখক এনে "স্ক্রীপটোরিয়ামে" (নকলখানায়) তাদের দিয়ে হাজারে হাজারে-নানাদেশের বই নকল করা হত—টীকাটিপ্পনি লেখান হত আবার কত নৃতন নৃতন বইও রচনা করা হত। এতখানি অক্লান্ত চেষ্টা পরিশ্রম ও আয়োজনের ফলে আলেকজ্যাণ্ড্রিয়ার পাঠাগার যখন সর্ব্বজনবিদিত হ'য়ে উঠেছিল তখন জুলিয়াস সিজার উদ্দাম জয়লালসায় অধীর হ'য়ে একদিন আলেকজ্যাণ্ড্রিয়ার সব নৌবহরে আগুন লাগিয়ে দেন—আর সেই আগুনের লেলিহান শিখার মুখে সমুদ্রের কাছে ঐ বড় পাঠাগারটি একেবারে পুড়ে যায়। সিজারের বন্ধু এণ্টনি ক্ষতিপূরণ-স্বরূপের পারগামামের-একটা পাঠাগার প্রকাণ্ড ব্রুকিয়াম পাঠাগারের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন—তবে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে অরেলিয়ানের আক্রমণের সময় এই পাঠাগারটিও ভস্মীভূত হ'য়ে যায়।

এইবার রোমের গ্রন্থালয় সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক্।… এভেণ্টাইন পাহাড়ের উপরে খৃষ্টের জন্মাবার প্রায় ৪০।৫০ বৎসর আগে ইলিরিয়ান যুদ্ধের পর এসিনিয়াস পলিও প্রথম পাঠাগার স্থাপন করেন—তারপর তখন থেকে প্রথম শতাব্দীর মধ্যে রোমে অনেকগুলো পাঠাগারই হ'য়েছিল; তবে আল্পিয়াস্ ট্রাজান্সের গ্রন্থাগারই সকলের চেয়ে সমৃদ্ধিশালী বলে পরিচিত হয়েছিল। কনষ্ট্যান টাইন যখন বাইজ্যানটিয়াম্ বা কনষ্ট্যান্টিনোপলে তাঁর রাজধানী উঠিয়ে নিয়ে যান্ তখনও সেখানে অনেক বড় বড় পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি গ্রন্থাগারে প্রায় ত্বলক্ষ আন্দাজ বই ছিল—তবে পুনঃ পুনঃ অগ্নিদাহে কনষ্ট্যান্টিনোপলের প্রায় ২৭।২৮টি গ্রন্থাগারে অ'নেক ক্ষতিই হয়েছিল। তারপর রোমরাজ্য ভেঙে গেলেও পোপেরা বড় বড় পাঠাগার স্থাপন করেছিলেন এবং সাধারণের পাঠের সুবিধা ও সুবন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন।

আরবীয়েরাও গ্রীকদের মত পুস্তক সংরক্ষণ ও সংগ্রহে সচেষ্ট ছিল। হারুণ অল্‌রশিদ ও তার ছেলেদের রাজত্ব সময়ে বাগদাদ, বাসোরা, কর্ডোভা প্রভৃতি নানা স্থানে গ্রন্থালয় স্থাপিত হয়েছিল—কাইরো সহর বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র হ'য়ে উঠেছিল—আর সেখানকার ফতিমিদ বংশীয়দের পাঠাগারে প্রায় দেড় লক্ষ আন্দাজ পুস্তক ও পুঁথিপত্রাদি সংগৃহীত হয়েছিল—শেষে তুর্কদের দ্বারা বিতাড়িত হবার পরও তাঁরা আবার নতুন নতুন গ্রন্থালয় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে আরবদের অধিকারভুক্ত (স্পেনরাজ্য) ইয়োরোপের মধ্যে অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়ে উঠেছিল—সেখানে অল্‌হাকিম নামে একজন

আরবীয় পণ্ডিতের চেষ্টায় ও যত্নে কর্ডোভার প্রায় ৬।৭ লক্ষ পুস্তকাদি সংগৃহীত হয়েছিল।

এ সমস্ত ত গেল সেকালের পুরণো কথা। সম্প্রতি আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন নগরে নতুন একটি পাটাগার প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে—সেখানে এক কোটীরও বেশী বই রাখার বন্দোবস্ত আছে এবং দরকার হলে আরও বেশী রাখার ব্যবস্থা করা যায়। সেখানকার গ্রন্থাধ্যক্ষদের কি করে বই সাজাতে ও তালিকাভুক্ত করতে হয়, এর জন্যে কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়—আর তাদেরই সুবিধার জন্য কতকগুলি মাসিক পত্রিক পর্য্যন্ত বার করা হ'য়েছে।

তক্ষশীলা ও নালন্দা আজও ভারতের স্মৃতিতে জল্ জল্ কোরে ফুটে উঠছে—লিপি প্রচলনের যুগে বৌদ্ধদের চেষ্টার ফলেই এরাই ভারতের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষাকেন্দ্র বলে পরিগণিত হয়েছিল—এই নালন্দাতেই ফাহিয়ান, ইটসিং, হিয়ানসাং প্রভৃতি চৈনিক পরিব্রাজকেরা শিক্ষালাভ করে নিজেদের কৃতার্থ মনে করেছিল—এবং যাবার সময় কুড়িটা ঘোড়ার পিঠে বোঝাই দিয়ে এখানকার সব পুঁথিপত্র নিয়ে যায়—আর এইগুলোই এখন নানা পণ্ডিতের দ্বারা অনুদিত হয়ে ভারতের গৌরবের কথা প্রচার করে বেড়াচ্ছে। নালন্দার "রত্নোদধি" নামে একটা নয়তল বিশিষ্ট প্রাসাদে এত পুঁথি ছিল যে ভারতের প্রাচীন শিক্ষা ও সভ্যতা সম্বন্ধে অক্ষয় কীর্ত্তি থেকে যেত—কিন্তু দুঃখের বিষয় যে কতকগুলো বৌদ্ধদ্বেষী সন্ন্যাসী অত বড় গ্রন্থাগারটাকে অগ্নিদাহে নষ্ট করে দেয়।

তারপর বিক্রমশীলা ও ওদন্তপুরীর পাঠাগার বিশ্ববিশ্রুত হ'য়ে ওঠে সেখানে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুঁথিই রাখা হ'ত—কিন্তু মুসলমান বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সদলবলে বক্তিয়ার খিলিজী তাইতে আগুন দিয়ে শেষ চিহ্নটুকুও মুছে ফেলে। বিক্রমশীলার পাঠাগারও এইরকমে নষ্ট হয়। বল্লালসেনের একটা বড় পাঠাগার ছিল. সেটাও কিনা শেষে মুসলমানের আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারল না। শেষকালে প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও মুসলমানের হাত থেকে গ্রন্থাগারগুলো রক্ষা করতে অকৃতকার্য্য হ'য়ে কতকগুলো বৌদ্ধ ভিক্ষু নেপালে পালিয়ে গিয়ে খানকতক গ্রন্থরক্ষা করেছিল।

ধাররাজ্যের ভোজরাজার পাঠাগার, তারপর মালব প্রদেশ জয় করার পর চালুক্যরাজ বিজাপুরে যে প্রস্তরনির্মিত প্রকাণ্ড ত্রিতল বিদ্যামন্দির স্থাপন করেন সেই বিদ্যামন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আজও তার জীর্ণ স্মৃতি বুকে করে অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিচ্ছে। এ ছাড়াও ভারতীভাণ্ডার জয়পুর, যোধপুর, ঝান্সি, তাঞ্জোর,

বরোদা, মহীসুর প্রভৃতি রাজ্যের গ্রন্থালয়গুলো একদিন যে বিশ্বের বুকের ওপর আলো জেলে দিয়েছিল একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

নেপালে অনেকদিন পর্য্যন্ত মুসলমান আক্রমণ হয়নি বলে সেখানকার নিবার রাজারা প্রায় দু'হাজার বছরের পুরাণো পুঁথি সংগ্রহ করে রাখতে পেরেছিল—তারপর নিবার রাজাদের হাত থেকে গুর্খা রাজাদের হাতে রাজ্য এলে সঙ্গে সঙ্গে পাঠাগারটিও লুট হয়ে যায়। তবে সুখের বিষয় এই যে, ৫০।৬০ বছর হল জঙ্গ-বাহাদুরের সময় থেকে এই পাঠাগারটি আবার নতুন ক'রে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এখন এই পাঠাগারের সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড হল ও ঘণ্টাঘর তৈরী হ'য়েছে—আর বইও আছে অনেক। তালপাতার পুঁথি তিন হাজার, সংস্কৃত পুঁথি কুড়ি হাজার, ভোটদেশের পুঁথি দশ হাজার, চীনদেশের ত্রিপত্রক পুঁথি ৪।৫ হাজার এবং এসব ছাড়া অনেক পুরাতন ও নব্যতন্ত্রের অনেক ইংরাজি বই ও ছবি আছে।

রাজপুতানার প্রায় সকল রাজার কেল্লাতেই এক একটা করে পুঁথিখানা ছিল। এখনও ৫।৭ হাজার পুঁথি অনেক পুঁথিখানাতেই আছে। মহারাজ রণজিৎ সিংহের পুরোহিত মধুসূদন অনেক বই সংগ্রহ করেছিলেন। গুজরাটের জৈনেরা আলা-উদ্দিনের সময় বহু-সংখ্যক পুঁথিপত্রাদি নিয়ে যশল্মীরে পালিয়ে যায়। তারপর বরুণার ধারে তিন-চারশ বছর আগে সর্ব্ববিদ্যানিধান কবীন্দ্রাচার্য্য সরস্বতী নামে এক সন্ন্যাসী একটা প্রকাণ্ড পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন—এখনও তার একটা তালিকা আছে একথা আমি সেদিনেও কাশীতে শুনেছি।

প্রায় সমস্ত মুসলমান সম্রাটদেরই এক একটা নিজস্ব গ্রন্থালয় ছিল—এতে যে শুধু আরবী ফারসী বই থাকত তা নয়—হিন্দুস্থানেরও অনেক বই থাকত,—আবার শিক্ষানুরাগী বাদসাহেরা অন্যান্য ভাষার বই আরবী ফারসীতে অনুদিত করবার জন্যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করতেন।

তারপর আমাদের বাঙ্গলাদেশেও পাঠাগার ছিল— বাঙ্গলার জগদ্দল-বিহারের নাম একদিন সবার কাছেই চিরপরিচিত হ'য়ে উঠেছিল—এইখানে থেকেই ভুটিয়ারা প্রায় দশ হাজার বই অনুদিত করে নিয়ে গিয়েছিল।

ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থাগার

নিউটনমোহন দত্ত

সম্মেলনের রীতি অনুসারী কাজ আরম্ভ করিবার পূর্বে এই শুভ উপলক্ষে আমাকে সভাপতিপদ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাইয়া বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদ যে সম্মান দিয়াছেন তাহার জন্য উহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা কর্তব্য বলিয়া মনে করি। নিজেদের বৃত্তিতে গর্ব বোধ করিয়া থাকে আমার মত এহেন ব্যক্তির নিকট সমবৃত্তিধারী এবং গ্রন্থাগারের সহিত সংশ্লিষ্ট সহকর্মীদের এই স্বতঃপ্রবৃত্ত নির্বাচন অত্যন্ত প্রীতিপদ। যে প্রতিষ্ঠান গত ছয় বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলার গ্রন্থাগারের উন্নতি ও বিকাশসাধনের জন্য প্রভূত কাজ করিয়াছে তাহার সহিত জড়িত হওয়ার ছাড়পত্র পাইয়া আমি অসীম আনন্দ লাভ করিয়াছি। আমার নিজের কাছে এই সম্ভাব্য কথাটি গোপন নয় যে, আপনারা ব্যক্তিগত কারণে আমাকে নির্বাচন করিতে যতটা প্রণোদিত হইয়াছেন তাহার চেয়ে অধিক হইয়াছেন আমি মহানুভব মহারাজা সয়াজিরাও গায়কোয়াড়ের প্রতিষ্ঠিত ভারতের বৃহত্তম গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠানের সর্বপ্রধান পদাধিকারী হওয়ার দরুন এবং আমাকে সম্মানিত করিতে গিয়া যে মহানুভব নিয়োগকর্তার অধীনে আমি কাজ করিতেছি প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকেই আমার মাধ্যমে আপনারা সম্মানিত করিয়াছেন। বরোদা সরকার উহার রাজা ও রাষ্ট্রের প্রতি এই অব্যক্ত সম্মান প্রদর্শনের স্বীকৃতিস্বরূপই আমাকে রাজার খাস প্রতিনিধিরূপে এখানে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন। রাজ্যের অস্থায়ী দেওয়ান মহানুভব আম্বেগাওকরের সম্মেলনের জন্য শুভেচ্ছা এবং তাঁহার আন্তরিক সম্ভাষণ আমি সানন্দে বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদের নিকট বহন করিয়া আনিয়াছি।

এখানকার আলোচনার জন্য যে বিষয় আমি বাছিয়া লইয়াছি তাহা হইল, ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থাগার ; কিন্তু এই বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা ছাড়া অধিক কিছু এই অল্প সময়ের মধ্যে করা যাইবে না। বিশারদ হইবার ইচ্ছা লইয়া যিনি একটি উপযুক্ত বিষয় বাছিয়া লইবার সন্ধানে আছেন এমন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের উপরই এই প্রসঙ্গে আলোচনার ভার ছাড়িয়া দিব।

আয়ারল্যাণ্ডের কোনও ইতিহাসের একটি অধ্যায়ে 'আয়ারল্যাণ্ডের সাপ' এই শিরোনামা রহিয়াছে। এই অধ্যায়টি খুবই সংক্ষিপ্ত এবং 'আয়ারল্যাণ্ডে কোন

সাপ দেখা যায় না' এই একটি মাত্র বাক্যই এই অধ্যায়ে আছে। সেইরূপ সুদূর অতীতের দিকে তাকাইলে আমরা ইহাই মনে করিব যে প্রাচীন ভারতে কোন গ্রন্থাগার ছিল না। যে দেশে জ্ঞানচর্চা সকল সময়েই সর্বোচ্চ মর্যাদা পাইত এবং নানা জাতি বিদ্যমান থাকিলেও বিদ্বান সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিত সেই দেশে এই কথাটি বাস্তবিকই অদ্ভুত নয় কি? অতি প্রাচীন কালে লিখনপদ্ধতি এখানে অজ্ঞাত ছিল এমন নয়। খৃষ্টের জন্মের তিন শত বৎসর পূর্বে লেখা রাজা অশোকের যে সকল শিলালিপি ও স্তম্ভলিপি দেশের চারিদিকে ছড়ান দেখিতে পাই সেগুলিতে দুইটি লিপি দেখা যায়। তাহারা খুব সম্ভব তদপেক্ষা পাঁচ শত বৎসর আগেকার হইবে। এ ছাড়া সিন্ধু উপত্যকায় এবং বালুচীস্তানে খননকার্য চালাইবার সময় এমন কিছু কিছু মোহর পাওয়া গিয়াছে যাহাতে খৃষ্টের জন্মের আড়াই হাজার বৎসর পূর্বেকার লিখনপদ্ধতির নিদর্শনও মিলে। এই মোহরে লিখিত বর্ণমালা ব্যাবিলনে প্রাপ্ত কোন কোন মোহরের বর্ণমালার মত একই ধরনের এবং নিশ্চয়ই একই যুগের।

আসল কথা এই যে, অতি প্রাচীনকালে রাজকীয় অনুশাসন, জমিজমার স্বত্বপত্র এবং সাধারণ ব্যবসায়ের কাজে লেখার কাজ সীমাবদ্ধ ছিল। সেই যুগের প্রায় অধিকাংশ বিদ্যাই ছিল ন্যূনাধিক পরিমাণে ধর্মশাস্ত্র সংক্রান্ত, ধর্মশাস্ত্রের অধিকর্তারা তাঁহাদের পবিত্র গ্রন্থারাজিকে জনগণের গোচরীভূত করার বড় একটা ধার ধারিতেন না। কাজেই বেদ, বেদাঙ্গ প্রভৃতি মুখে মুখে শিক্ষা দেওয়ারই রীতি ছিল। এইভাবে গুরুর মুখ হইতে চেলার মুখে এই শিক্ষা চলিত। এই ধরনের শিক্ষাপদ্ধতিতে স্মৃতিশক্তির উপর বিশেষ চাপ পড়িত সন্দেহ নাই। অধিক বিষয় স্মৃতিতে ধরিয়া রাখিবার জন্য ছাত্রদিগকে নানা কৌশল ও শিক্ষা দেওয়া হইত। পাঠ্য বিষয় শুধু শিখান ও মুখস্থ করানই হইত না, প্রত্যয় যোগ না করিয়া প্রতিটি শব্দকে পৃথকভাবে শিখান হইত। অপর এক প্রণালী ছিল যে প্রত্যেকটি শব্দকে দুইবার উচ্চারণ করিতে হইত। প্রথম বার পূর্ববর্তী শব্দের সঙ্গে এবং দ্বিতীয়বার পরবর্তী শব্দের সঙ্গে।

পাশ্চাত্যের প্রাচীন গ্রন্থাগারের সুবিজ্ঞ ঐতিহাসিক ডঃ রিচার্ডসন এই ধরনের গ্রন্থাগারকে স্মৃতিসহায়ক গ্রন্থাগার বলিয়া ঠিকই অভিহিত করিয়াছেন, পণ্ডিতেরা প্রকৃতপক্ষে জীবন্ত গ্রন্থাগার ও চলন্ত গ্রন্থাগারই ছিলেন। ভারতীয় ছাত্রদের অসাধারণ স্মৃতিশক্তি অদ্যাপি সর্বজনবিদিত এবং প্রাচীন কালে যে সকল পণ্ডিত বেদ মুখস্থ বলিতে পারিতেন তাঁহাদিগের নামের শেষে দ্বিবেদী ও ত্রিবেদী কথাটী

জুড়িয়া দেওয়া হইত। আজ গুজরাতের পণ্ডিতগণ এই কথার যথার্থতা প্রমাণ করিতেছেন।

ধর্মশাস্ত্রের অধিকর্তা ছাড়া প্রাচীনকালে চারণকবিও ছিলেন। তাঁহারা রাজদরবারে ও জনসমাবেশে পুরাকালের বীরদের বীরত্বের কাহিনী গাহিয়া শুনাইতেন। স্বতন্ত্রভাবে রচিত তাঁহাদের কবিতাগুলি পরবর্তীকালে সংযোজিত হইয়া মহাকাব্যের সৃষ্টি করিয়াছে। সেই মহাকাব্যই বর্তমানে আমাদের নিকট মহাভারত বলিয়া পরিচিত। আমরা জানিতে পারি যে, তক্ষশিলার বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে এই মহাকাব্য প্রথম লোকসমক্ষে আবৃত্তি করা হইয়াছিল। হোমারের প্রণীত ইলিয়াডও অনুরূপ একটি কাব্য। ট্রয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের সময় গ্রীসীয় বীরদের সাহসিকতাপূর্ণ কার্যাবলীর স্মরণে যে সকল কবিতা বিভিন্ন ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে রচনা করিয়াছিলেন সেগুলি একত্রে গ্রথিত করার পরই ইলিয়াড কাব্য সৃষ্ট হয়।

মনে হয়, ব্রাহ্মণদের বেদ লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে যেমন অনাগ্রহ ছিল তেমনি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও তাঁহাদের ধর্মশাস্ত্র লিপিবদ্ধ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। গৌতম বুদ্ধ তাঁহার উপদেশাবলী লিখিয়া গিয়াছেন এরূপ কোন প্রমাণ আমরা পাই নাই। তাঁহার মৃত্যুর অনতিকাল পরেই তাঁহার শিষ্যরা তাঁহার উপদেশাবলী একত্র সংগ্রহ করিয়া তিনটি ভাগে অর্থাৎ ত্রিপিটকে বিভক্ত করেন, যথা – সূত্র, বিনয়, ও অভিধর্ম। সূত্রে শিষ্যদের প্রতি উপদেশাবলী, বিনয়ে শৃঙ্খলাবিধি এবং অভিধর্মে ধর্মের তত্ত্বকথা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। চিরকাল স্মৃতিতে জাগরূক রাখার জন্য ত্রিপিটক শিষ্যদের সমাবেশে সুর করিয়া গাওয়া হইত। বহু বৎসর ধরিয়া সংঘবদ্ধভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে ধর্মশিক্ষা দেওয়ার প্রচলন ছিল। সিংহলের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টের জন্মের অষ্টাশী বৎসর পূর্বে তথাকার বৌদ্ধ ভিক্ষুরা যখন দেখিলেন যে আসল ধর্মতত্ত্ব বিকৃত বা লুপ্ত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে তখন তাঁহারা ইহা লিপিবদ্ধ করিবার কাজে হাত দিলেন। জৈনদের বেলায়ও এইরূপ হইয়াছিল। শেষ মহান জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের মৃত্যুর পর নয়শত আশী বৎসর পার না হওয়া পর্যন্ত জৈন ধর্মশাস্ত্র লিপিবদ্ধ হয় নাই।

পরবর্তী কালে লিখিত শব্দের বিরুদ্ধে কুসংস্কার তিরোহিত হইল এবং একটি প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। তাহার ফলে সকল সম্প্রদায়ের পণ্ডিতরা বই লিখিবার এবং উহাকে সংরক্ষণ করিবার কাজে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। প্রত্যেক মঠ মন্দিরেরই এই সকল সাহিত্যরত্ন সংগ্রহের দিকে বিশেষ ঝোঁক দেখা গেল। তাহার ফলেই সূত্রপাত হইল ভারতের সর্বজনীন গ্রন্থাগারের। রাজা ও ধনাঢ্য ব্যক্তি-

দিগকে হাতেলেখা পুঁথির সংখ্যা বাড়াইবার নির্দেশ দেওয়া হইল। এই নির্দেশটি যে একটি কর্তব্য বলিয়া ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হইল তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় পশ্চিম ভারতের বল্লভী রাজাদের ৫৬৫ খৃষ্টাব্দের এক খোদিত লিপিতে। আজও অনুরক্ত জৈন মোহান্তরা কোন ধর্মশাস্ত্র নকল করার বরাত দিয়া সাহিত্য বিক্রয়ের উৎসব করিয়া থাকেন। প্রথম খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরে যে পাচ শত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সঙ্গীত হইয়াছিল তাহাতে বুদ্ধের সময় হইতে যত নূতন ভাব ও ক্ষত দেখা দিয়াছিল তৎসহ ত্রিপিটক সম্পর্কে বিস্তৃত ভাষ্য সঙ্কলন করিবার জন্য বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগকে বলা হইয়াছিল। কথিত আছে, এই সকল ভাষ্য তাম্রফলকে বিস্তৃতভাবে খোদাই করিয়া কোন এক স্তূপের নীচে প্রোথিত করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। এই ভাষ্যের নাম ছিল বিভাষা এবং ইহা হইতেই বিখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক সম্প্রদায় বৈভাষিক বলিয়া পরিচিত হন।

একেবারে প্রথম হইতেই বৌদ্ধধর্ম প্রচারব্রতী ছিল এবং অতি শীঘ্রই ইহা তিব্বত, নেপাল ও চীনে বিস্তার লাভ করিল। এই দেশগুলি হইতে স্রোতধারার মত বহু তীর্থযাত্রী এদেশে আসিয়াছিল। বৌদ্ধ দর্শনরূপ প্রস্রবণের উদ্ভবস্থলের পবিত্র বারিধারা পান করিবার জন্য এই তীর্থযাত্রীজনিত কষ্ট ও বিপদের প্রতি তাঁহারা ভ্রূক্ষেপই করিতেন না। এই সকল ভক্ত তীর্থযাত্রীদের নিকট হইতেই আমরা প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের জ্ঞানলাভ করি। ফা-হিয়ান, হিউয়েন সাঙ এবং ইৎসিং পঞ্চম ও সপ্তম খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারত পর্যটনে আসিয়া ছিলেন। এই অত্যুৎসাহী পণ্ডিতেরা এদেশে বহুদিন কাটাইয়াছিলেন। তাঁহারা স্থানে স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, মঠ-মন্দির-ভরা ভারতের বহু মঠ মন্দিরে তাঁহারা বাস করিয়াছেন, পাণ্ডুলিপি নকল করিয়াছেন এবং হিন্দু পুরোহিত ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়ের জীবনযাত্রা ও পণ্ডিতদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন। প্রত্যেক বিদ্যালয়েই গর্ব করিবার মত পুস্তকসংগ্রহ ছিল। সেখানে প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা থাকিতেন। তক্ষশীলা, পাটলীপুত্র, বারাণসী, ওদন্তপুরী, বিক্রমশীলা এবং এইরূপ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক কথা আমরা চীনা পরিব্রাজকদের নিকট হইতেই পাই। তক্ষশিলায় এমন কয়েকজন বিশারদ ছিলেন যাঁহারা চৌদ্দটি বিভিন্ন প্রকার বিষয়ের ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সুরম্য গ্রন্থাগার ছিল। এই গ্রন্থাগার ভবনের নয়টি তলা ও তিনশতটি কক্ষ। নিকটবর্তী ওদন্তপুরী বিহার নামক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচুর পুস্তকসংগ্রহের খ্যাতি ছিল এবং ১২০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহা ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। এই সালেই বখতিয়ার খলজীর

সেনাপতি মহম্মদ বিন সিবে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি বিধ্বস্ত করিয়া ভিক্ষুদিগকে পাইকারীভাবে হত্যা করেন। এত পাণ্ডুলিপির সংগ্রহ দেখিয়া আক্রমণকারী নিজেই অবাক হইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু যে সকল গ্রামবাসীকে ইহাদের মর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছিলেন তাহারা কেহই সমুচিত জবাব দিতে পারে নাই। কারণ তাহারা বলিল যে, যাঁহারা এই পাণ্ডুলিপি পড়িতে পারিতেন তাহাদের সকলকেই হত্যা করা হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া উদ্ধত সেনাপতি এই মন্তব্য করিলেন যে যেহেতু এই বইগুলি কাফেরের লেখা সেহেতু ইহারা হয় অপ্রয়োজনীয়, নয় মারাত্মকরূপে ক্ষতিকর, কাজেই ইহাদিগকে ধ্বংসই করিয়া ফেলিতে হইবে। মুসলমান আক্রমণকারীদের হাতে অন্যান্য বিহার গ্রন্থাগার-গুলিরও যে এই দশাই ঘটিয়াছিল অন্যান্য নগরে প্রাপ্ত স্তূপীকৃত দগ্ধ পাণ্ডুলিপি হইতেই তাহার প্রমাণ মিলে।

নালন্দার শ্রীবৃদ্ধির দিনে ভারত ও তিব্বতের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ছিল। তিব্বতীরা সংগ্রামে বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিয়াছিল। স্থানীয় ভাষায় যাহাতে সংস্কৃত পুস্তক অনূদিত হইতে পারে তাহার জন্য তাহারা বরফের দেশে পণ্ডিতদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া নিয়া যাইত, এই অনূদিত পুস্তকই কাঙ্গিয়ুর ও তাঙ্গিয়ুর পুস্তক সংগ্রহ বলিয়া খ্যাত। মূল সংস্কৃতের যে সকল গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ আর পাওয়া যায় না সেগুলি তিব্বতী সাজে সজ্জিত হইয়া বিলুপ্তির হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

পৌষ্কর সংহিতা নামক পুস্তকে আমরা প্রাচীন গ্রন্থাগার পরিচালনার একটা তৎকালীন চিত্র পাই। এই গ্রন্থাগারটি একটি সুরম্য পাথরের দালানে অবস্থিত। ইহার মধ্যস্থিত লোহার সিন্দুকে সযত্নে খেরুয়ামোড়া ও সুতলিবাঁধা পাণ্ডুলিপি-সমূহ রক্ষিত হইত। একজন গ্রন্থাগারিক এই গ্রন্থাগারের তত্ত্বাবধান করিতেন। জ্ঞানপিপাসুদিগের বিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়াই ছিল তাঁহার কাজ। এই জ্ঞানপিপাসুদিগকে কিন্তু অবিবাহিত জীবনযাপন করিতে হইত। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, ব্রিটিশ যাদুঘরের বিশাল পাঠাগারের নির্মাতা মহান গ্রন্থাগারিক স্যার অ্যাণ্টনি প্যানিৎসি ধাতব পুস্তকাধারের উদ্ভাবক বলিয়া গৌরবের অধিকারী হইয়াছেন। সুতরাং ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্যজনক যে অত প্রাচীন-কালেও পুস্তক সংরক্ষণের জন্য ধাতুর উপযোগিতার কথা অজানা ছিল না।

সম্প্রতি আবিষ্কৃত এবং হায়দরাবাদ প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণী সংস্করণের অষ্টম সংখ্যায় প্রকাশিত কন্নড় খোদাইলিপিও সেকালের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে কিছু আভাস দেয়। ওয়াদির নিকটবর্তী গ্রাম নাগাইর বৃহৎ মন্দিরে এই লিপিটি রহিয়াছে। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর চালুক্যরাজা রায় নারায়ণের সেনাপতি ও মন্ত্রী মধুসূদনের

প্রতিষ্ঠিত একটি মহাবিদ্যালয়ের উল্লেখ ইহাতে আছে। এখানে ২৫২ জন ছাত্রের, এবং মহাবিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানকারী ছয়জন অধ্যাপক ও ছয়জন গ্রন্থাগারিকের থাকিবার ব্যবস্থা ছিল। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ছাত্রদের জন্য অত জন গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজন ছিল এবং অধ্যাপকদের বেতনের প্রায় সামিল বেতনের হার এই কর্মচারীদের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল। সত্য বটে, আমেরিকার ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষ একথা ঘোষণা করিয়াছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকের মর্যাদা আর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিদ্যাবিভাগের অধ্যক্ষের মর্যাদা এবং মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থা-গারিকের মর্যাদা আর অধ্যাপকের মর্যাদা একই হওয়া উচিত। তাঁহারা আরও ঘোষণা করিয়াছেন যে পৌরসভার গ্রন্থাগারিকের বেতন, মর্যাদা ও অন্যান্য দায়িত্বপূর্ণ পদাধিকারী, যথা স্বাস্থ্য ও শিক্ষাবিষয়ক কর্মচারী এবং প্রধান স্থপতির বেতন ও মর্যাদা সমতুল্য হওয়া উচিত। প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বদান্য প্রতিষ্ঠাতাদেরও যে আমেরিকায় বর্তমানে প্রচলিত গ্রন্থাগারিকের মর্যাদার অনুরূপ মর্যাদাদানে উদার ও সদাশয় দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ইহা হইতে তাহাই প্রতীয়মান হয়। আধুনিক ভারতের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারসমূহের মর্যাদা সম্পর্কে কার্পণ্যপূর্ণ এবং হীন ধারণা হইতে এই দৃষ্টিভঙ্গীর কত পার্থক্য!

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় প্রথম উল্লিখিত রাজকীয় গ্রন্থাগার হইল ভোজরাজার গ্রন্থাগার। ধারানগরীতে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে তিনি রাজত্ব করিতেন। এই রাজা একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহাকে বহু গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া আখ্যান করা হয়। তন্মধ্যে একখানার নাম ছিল 'সমরাঙ্গন'। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্পর্কে এই পুস্তকখানা গায়কোয়াড়ের প্রাচ্য পুস্তক সংস্করণে স্থান পাইয়াছে। কয়েক বৎসর আগে এই বইখানা প্রকাশ করার অধিকার লাভ করিয়াছিলাম। চালুক্যরাজ সিদ্ধরাজ তাঁহার রাজ্য জয় করিলে এই গ্রন্থাগার আন্‌হিলওয়াড়ে অর্থাৎ মহানুভব গায়কোয়াড় মহারাজের রাজ্যভুক্ত বিখ্যাত পাটন-নগরীতে স্থানান্তরিত হয় এবং সেখানকার রাজকীয় চালুক্য গ্রন্থাগারের সহিত ইহা মিশিয়া যায়।

হিন্দু সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধির দিন ঘুচিয়া যায় গজনীর সুলতান মাহমুদের আক্রমণে। তিনি স্থানীয় মন্দিরগুলি ধ্বংস করিয়া সন্ন্যাসী ও পুরোহিতদিগকে পাইকারীভাবে হত্যা করেন। যাঁহারা জীবিত ছিলেন তাঁহারা যতটা সম্ভব এই সাহিত্যরত্নভাণ্ডার লইয়া তিব্বত ও নেপাল রাজ্যে, জয়শলমীরের মরুভূমিতে অবস্থিত সুরক্ষিত স্থানে এবং পশ্চিম ভারতের অন্যান্য আশ্রয়স্থলে পলাইয়া যান।

মুসলমান রাজারা দেশের মধ্যে স্থায়ীভাবে আস্তানা গাড়িয়া বসিলে তাহারা

দেশব্যাপী মসজিদ ও মক্তব স্থাপন করিয়া তাঁহাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে শিক্ষাদানের ব্যাপারে উৎসাহ দেন। পরবর্তী কালে সম্রাটরা 'কলিশঃ দম্নঃ' প্রভৃতি হিন্দু পুস্তকের প্রতি আগ্রহ দেখাইতে থাকেন। 'আনোয়ারী-ই সুহেইলী' নামে ইহা পারসী ভাষায় অনুদিত হয়।

দাসরাজগণের আমলে দিল্লী প্রাধান্য লাভ করিল। ইহার প্রাধান্যের মূলে যে শুধু ইহার মহাবিদ্যালয়গুলি ছিল তাহা নহে বহু সাহিত্যসভাও ছিল। এই সাহিত্যসভাগুলি গজাইয়া উঠিলে রাজপরিবারের লোকেরা ইহাদিগকে উৎসাহ দিতেন। এইগুলিতে বাদশাহজাদা ও আমীরওমরাহেরা নূতন কবি ও পণ্ডিতদের লেখা শুনিবার জন্য সমবেত হইতেন। খলিজীবংশের প্রতিষ্ঠাতা জলালউদ্দীনের সম্বন্ধে আমরা শুনিতে পাই যে তিনি আমীর খসরু নামক এক বিশিষ্ট পণ্ডিত ও কবিকে রাজকীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই পদের জন্য তাঁহাকে উপযুক্ত মাসোহারা দেওয়া হইত আর তাঁহাকে কোরানরক্ষক বলিয়া একটি অতিরিক্ত খেতাবেও ভুষিত করা হইল।

একজন গ্রন্থাগারিক যে সম্ভ্রান্ত পদে উন্নীত হইয়াছিলেন এখন সেই কথা বলিব। আমার মনে হয়, ইতিহাসে উল্লিখিত ইহাই একমাত্র দৃষ্টান্ত। নয় বৎসর আগে অ্যাকিলে র‍্যাগি নামক রোমের বিখ্যাত ভ্যাটিকাননগরীর গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক একাদশ পায়াস নাম ধারণ করিয়া পোপ নির্বাচিত হইয়াছেন। সম্প্রতি কয়েক বৎসর আগে পূজ্যপাদ পোপ রোমে 'আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগারিক সম্মেলনে' সভ্যদের সঙ্গে যখন মিলিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি বিদ্বজ্জন বৃত্তির একজন ভুতপূর্ব বৃত্তিধারী হিসাবে তাঁহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়াছিলেন। অধিকন্তু মার্কিন গ্রন্থাগার পরিষদের পরামর্শে জগতে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ ভ্যাটিকান গ্রন্থাগারের বাস্তবিক সম্পূর্ণ পুস্তক-তালিকা প্রণয়নার্থ 'আন্তর্জাতিক শান্তির জন্য কার্ণেগী গচ্ছিত অর্থভাণ্ডার' হইতে তিনি আর্থিক সাহায্য চাহিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

সম্ভবতঃ প্রাক্-মোগল আমলের সম্রাটদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান ছিলেন ফিরোজ তুঘলক। তিনি নিজে একজন পণ্ডিত এবং পণ্ডিতদের প্রতিপালক ছিলেন। বিদেশী পণ্ডিতদিগকে তাঁহার সহিত দেখা করিতে রাজী করাইয়া এবং আঙ্গুর প্রাসাদ নামক প্রাসাদটি তাঁহাদের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিয়া তিনি মহানন্দ পাইতেন। এই সংস্কারমুক্ত বাদশাহ হিন্দুদিগকে তাঁহার অধীনে চাকরী গ্রহণ করিতে উৎসাহ দিতেন এবং হিন্দু সাহিত্যে স্বজাতিকে আগ্রহান্বিত করিয়া তোলার চেষ্টাও করিতেন। নগরকেষ্টের মন্দিরে একটি ভাল সংস্কৃত গ্রন্থাগার দেখিয়া

তিনি ইহার কিছু পুস্তক পারসীতে অনুবাদ করাইবার জন্য হিন্দু পণ্ডিতদিগকে নিযুক্ত করেন। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ভীষণপ্রকৃতি তৈমুরের আক্রমণে ভারত আর একবার বিনাশের সম্মুখীন হইয়াছিল। তৈমুর দিল্লী দখল করিয়া লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। বড় বড় মোগল সম্রাটদের রাজত্বের কথা অবতারণা করিবার পূর্বে হিন্দুস্থানের ছোট ছোট রাজাদের প্রতি দ্রুত দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাইতে পারে। আহম্মদনগরে ভাল গ্রন্থাগার গড়িয়া তুলিবার জন্য বাহমনি বংশ নজরে পড়ার যোগ্য। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজ্যমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত মহম্মদ গাওয়াকের সদাশয়তায় রাজার বদান্যতা পর্যন্ত চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি গ্রন্থাগারে তাঁহার কিছু কিছু কবিতা আজও পাওয়া যায়। প্রভূত ধনৈশ্বর্যের অধিকারী হইলেও তাঁহার সদাশয়তা এমনই ছিল যে তাঁহার মৃত্যুর পরে সামান্য অর্থই তাঁহার ধনাগারে পাওয়া গিয়াছিল। তিনি নিজে সন্ন্যাসীর মত জীবনযাপন করিতেন—উচ্চ চিন্তা ও সাদাসিধা জীবন উভয়ই তাহার মধ্যে দেখা গিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সমস্ত অর্থ পণ্ডিতদের উৎসাহদানে এবং সুরম্য মসজিদ ও গ্রন্থাগার গড়িয়া তুলিতেই ব্যয়িত হইত। আদিল শাহী বাদশাহদের বিজাপুরে একটি ভাল গ্রন্থাগার ছিল। পরবর্তী কালে আওরঙ্গজেব ইহার অনেক বই সরাইয়া নিয়াছিলেন। তৎসত্ত্বেও ব্রিটিশ স্থপতি ডঃ ফারগুসন উনবিংশ শতাব্দীতে ইহা দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া তাঁহার যতদূর মনে হয় ইহার শ্রীবৃদ্ধির দিনে নিশ্চয়ই ইহা একটি সুন্দর গ্রন্থাগার ছিল। মহাভারতের বাঙ্গালা ভাষায় সর্বপ্রথম অনুবাদ করার আদেশ দেওয়ার জন্য বাঙ্গলার প্রাচীন বাদশাহদের মধ্যে নাদির শাহ (১২৮২-১৩২৪ খৃষ্টাব্দ) ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে নজরে পড়িবার মত যোগ্য ব্যক্তি।

মোগল বংশের অধিকাংশ বংশধরই—সম্রাট ও বাদশাহজাদা নারীপুরুষ ন্যূনাধিক পরিমাণে পাণ্ডিত্য ও কলার অনুরাগী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ গ্রন্থও রচনা করিয়া গিয়াছেন। যথা তাঁহাদের পূর্বপুরুষ তৈমুর। তাঁহার আত্মজীবনী আমাদের নিকট আজও বিদ্যমান। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বাবর একজন মার্জিত রুচিসম্পন্ন ও গুণী বাদশাহ ছিলেন। বর্তমানে যে সকল আত্ম-জীবনী আছে তাহাদের মধ্যে বাবরনামায় তিনি একখানা সর্বাধিক মনোজ্ঞ আত্ম-জীবনী রাখিয়া গিয়াছেন। মোগল আমলের গৌরবের বস্তুগুলির মধ্যে অন্যতম ক্ষুদ্রোচিত এবং সচিত্র গ্রন্থের ক্রমোন্নতির জন্য আমরা বাবরের নিকট ঋণী, কারণ তিনিই সচিত্র গ্রন্থ রচনা করিবার পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী হুমায়ুন তাঁহার বহু যুদ্ধাভিযানের সময় বাছাই-করা বইয়ের একটি

গ্রন্থাগার সঙ্গে নিয়া যাইতেন। সম্ভবতঃ ইহাই সর্বপ্রথম চলন্ত গ্রন্থাগারের উল্লেখ। এই সম্পর্কে আমরা এই কথাও স্মরণ করিতে পারি যে অপর একজন পুস্তকপ্রেমিক মহাবীর নেপোলিয়ন এরূপ নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, তিনি যেখানেই যাইবেন তাঁহার সঙ্গে নিয়া যাওয়ার জন্য যেন সুনির্বাচিত, বিশেষভাবে মুদ্রিত ও বাঁধাই করা এক প্রস্থ ক্ষুদ্র সংস্করণের বই তৈয়ারী রাখা হয়।

পূজ্যপাদ ডিব্‌ডিন সাহেব 'গ্রন্থাগারের পক্ষে মারাত্মক বই' নামক একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি যদি সামান্য পরিবর্তন করিয়া 'গ্রন্থকারের পক্ষে মারাত্মক কাজ' নামটি তাহার বইয়ের জন্য রাখিতেন তবে তিনি অন্ততঃ একটি অনুচ্ছেদ এই সম্রাট হুমায়ুনের জন্য লিখিতে পারিতেন, কারণ যে প্রমোদপ্রাসাদকে তিনি তাঁহার গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার মর্মান্তিক ও অকাল মৃত্যুর মূলে ছিল। জ্যোতিষ্কের অবস্থিতি লক্ষ্য করিতে করিতে তিনি মোয়াজ্জেমের আজান শুনিয়া হঠাৎ প্রস্তুতির জন্য দাঁড়াইয়া পড়িলে তাঁহার পদস্খলন হয়। তিনি পিছল সিঁড়ি বাহিয়া নীচে ছিটকাইয়া পড়েন এবং তাহাতে যে গুরুতর আঘাত পান তাহার ফলে তাঁহার শীঘ্র জীবনাবসান ঘটে।

মহামতি আকবর একজন উৎসাহী পুস্তক সংগ্রাহক ছিলেন। তিনি শুধু যে এক গুজরাতী রাজাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার গ্রন্থাগার করায়ত্ব করিয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহার নিজমন্ত্রী ফৈজীর গ্রন্থাগারও স্বীয় অধিকারে আনিয়াছিলেন। এই বইগুলি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—প্রথমটির মধ্যে ছিল কবিতা, চিকিৎসা-শাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র ও সঙ্গীতশাস্ত্র—দ্বিতীয়টির মধ্যে ছিল ভাষাতত্ত্ব, দর্শন, সুফীবাদ, জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যামিতি—আর শেষটিতে ছিল ভাষ্য, বংশপরম্পরাগত ঐতিহ্য, ভগবততত্ত্ব ও আইন। তাঁহার রাজত্বের সময় ছবি দিয়া বই সাজানর প্রথা বেশ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল এবং সৌখীন বাঁধাইয়ের দিকে বিশেষ যত্ন নেওয়া ও দৃষ্টি দেওয়া হইত।

মোগলেরা তাঁহাদের পূর্বপুরুষদের গ্রন্থাগার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করিতে খুবই গর্ববোধ করিতেন, কিন্তু সবই বৃথা গেল। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে পারস্যের আক্রমণকারী নাদির শাহ দিল্লী লুণ্ঠন করিলে এই পুস্তকসংগ্রহ তাঁহার হাতে পড়িয়া বিনষ্ট হয়।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের শ্রীরঙ্গপত্তনের ঝড়ে টিপু সুলতানের চমৎকার পুস্তকসংগ্রহ নষ্ট হইয়া যায়। আর ইহারই পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে লক্ষ্ণৌ অধিকৃত হইলে অযোধ্যার রাজার গ্রন্থাগারেরও একই দশা ঘটে। যাহা হউক, ইহা জানিয়া আনন্দিত হইবেন যে, বহু রাজকীয় গ্রন্থাগার কালের অবস্থা বিপর্যয় ও যুদ্ধের

দুর্ভাগ্য সাফল্যের সহিত কাটাইয়া উঠিয়াছে এবং ভারতের বর্তমান রাজন্যবর্গের মধ্যে অনেকে, যথা নেপাল, কাশ্মীর, মহীশূর, জয়পুর, যোধপুর, ভূপাল, আলোয়ার অদ্যাপি তাহাদের পূর্বপুরুষের গ্রন্থাগার নিজ অধিকারে রাখিয়াছে।

সুদক্ষ গ্রন্থবিবরণী সঙ্কলকগণ এই গ্রন্থাগারগুলির পুস্তকতালিকাও প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঞ্জোরের রাজারা ইতিহাসে স্থান পাইয়াছেন। সৌভাগ্যের বিষয়, মহারাজা সারফোজীর চমৎকার পুস্তক সংগ্রহ মাদ্রাজ সরকার সংরক্ষণ করিয়া উহাকে চাঁদাহীন সর্বজনীন গ্রন্থাগারে পরিণত করিয়াছেন।

যে সকল পাণ্ডুলিপি অন্যথা ধ্বংসের মুখে যাইতে বসিয়াছিল সেগুলিকে সংরক্ষণ ও তালিকাবদ্ধ করণের জন্য গত অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া প্রাদেশিক সরকার ও ভারতীয় রাজন্যবর্গ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। বোম্বাই সরকার বহু ভারতীয় ও ইউরোপীয় বিশিষ্ট পণ্ডিতদিগকে এতদর্থে নিযুক্ত করিয়াছেন। এইভাবে সংরক্ষিত বহু পাণ্ডুলিপি ভাণ্ডারকর অরিয়েন্ট্যাল ইনষ্টিটিউটের রক্ষণাবেক্ষণে রহিয়াছে। অন্যান্য প্রশাসকবর্গ ও ভারতীয় রাজন্যবর্গ এই কর্মধারা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। প্রাদেশিক সরকার বরোদা, কাশ্মীর, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য এবং বিদ্বজ্জন সমিতি, যথা এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল অমুদ্রিত গ্রন্থের মধ্য হইতে অধিকতর প্রয়োজনীয় গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিতেছেন। প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের জন্য জৈন সম্প্রদায়ের সতত যত্নশীলতাও ভূয়সী প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। জয়শলমীর, পাটনা, বরোদা, গোয়ালিয়র, আহাম্মদবাদ, কাম্বে প্রভৃতি স্থানের মন্দির এবং ভাণ্ডারে প্রয়োজনীয় অনেক গ্রন্থ আছে। এইগুলি সম্প্রতি জগতে পণ্ডিতদের গোচরে আসিয়াছে।

নিজ নিজ রাজ্যের সর্বপ্রকার সম্বল যাঁহাদের পিছনে ছিল এখন গ্রন্থানুরাগী রাজন্যবর্গের রাজ্যের কথা স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা জীবনের অধিকতর নগণ্য ক্ষেত্রে পণ্ডিতরা যে সৎ কাজ করিয়া গিয়াছেন তাহা যেন ভুলিয়া না যাই। 'দৌড়ের গতি সব সময়ই দ্রুত হয় না, আর সংগ্রাম সব সময় বলবানদের জন্যই নয়'। ঊনবিংশ শতাব্দীর পণ্ডিত মৌলভী খোদা বক্স সামান্য মাত্র সম্বল লইয়াও নিজের জীবদ্দশায় বাঁকিপুরের অরিয়েন্ট্যাল পাবলিক লাইব্রেরিতে মুসলমান পাণ্ডিত্যের এক কীর্তিস্তম্ভ গড়িয়া তুলিয়াছেন। ইহা জগতের যে কোন বড় মুসলমান গ্রন্থাগারের সঙ্গে টক্কর দিতে পারে। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা ইহা দেখিবার সুযোগ পান নাই তাঁহাদিগকে অন্ততঃ 'অ্যান ইষ্টার্ণ লাইব্রেরী নামক চিত্তাকর্ষক বইখানা পড়িবার জন্য পরামর্শ দিতেছি। এই বইখানাতে ও' কনর স্কট সাহেব কিছু কিছু সাহিত্যরত্নের বিবরণসহ এই অদ্ভুত প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস দিয়াছেন।

পণ্ডিতদের নিকট যে সকল গ্রন্থাগারের আকর্ষণ আছে সেগুলির কথাই এতক্ষণ বলিলাম। সর্বজনীন গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎ হইলেন বরোদার মহানুভব মহারাজা গায়কোয়াড়। তিনি বিশ বৎসর পূর্বে এই রাজ্যের সহরে ও গ্রামে চাঁদাহীন সর্বজনীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। জনগণের সামর্থ্যে কুলায় এরূপভাবে বই পড়ার ব্যবস্থা করিবার জন্য যে উল্লেখযোগ্য ও সার্থক চেষ্টা করা হইয়াছে নিশ্চয়ই তাহার কাহিনী আপনাদের জানা থাকা উচিত। আপনাদিগকে ইহা জানান প্রয়োজন যে, এখানে গত বৎসরে মোট ৫৭৩, ১৭০ গ্রন্থভাণ্ডার সহ রাজধানীর বাহিরে ৭৭৩টি গ্রন্থাগার ছিল। মোটামুটি এই গ্রন্থাগারগুলি হইতে ৪০২, ২৮৬ খানা বইএর আদানপ্রদান চলিয়াছে। রাজধানীতে যে দুইটি প্রয়োজনীয় গ্রন্থাগার রহিয়াছে তাহাদের হিসাব ইহা হইতে পৃথক। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে ১১৯, ৮১৪ খানা বই আছে এবং চলন্ত গ্রন্থাগার শাখার বইএর আদান-প্রদান সহ বৎসরে ১৩৫, ১০ বইএর আদানপ্রদান হইয়াছে আর অরিয়েণ্ট্যাল ইনষ্টিটিউট হইতে ২১,০০০ বই ও পাণ্ডুলিপি সরবরাহ করা হইয়াছে। অন্যান্য রাজ্য, যথা মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর ও পদুকোটাই এবং কয়েকটি ব্রিটিশ প্রদেশ বরোদার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

পাঞ্জাবে গ্রন্থাগার আন্দোলনের কাজ বেশ অগ্রসর হইতেছে। গত ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে আন্দোলন আরম্ভ হয়। সেই সময় গ্রন্থাগারিকের শিক্ষণের উদ্দেশ্যে বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করা এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে পুনর্গঠন করার জন্য ডিকিনসন সাহেবকে আমেরিকা হইতে আমন্ত্রণ করিয়া আনা হইয়াছিল। উপরোক্ত বক্তৃতামালার ব্যবস্থা অদ্যাবধি করা হইতেছে। তাঁহার লিখিত সুন্দর প্রাথমিক পাঠ্য পুস্তক 'পাঞ্জাব লাইব্রেরি প্রাইমারকে' গ্রন্থাগার সম্পর্কে আগ্রহী ব্যক্তিদিগের নিকট সর্বান্তঃকরণে সুপারিশ করা যাইতে পারে। পাঞ্জাব সরকার সম্প্রতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দে তাহার সংখ্যা ১৬০০ শতের কম ছিল না। তাহারা উচ্চ এবং নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। শুধু ছাত্ররাই নয় গ্রামবাসী সর্বসাধারণই ঐ গ্রন্থাগার ব্যবহার করিতে পারে। সরকারী অর্থসাহায্যে জিলা বোর্ড দ্বারা ঐগুলি পরিচালিত হয়। সাক্ষর লোকদিগকে গ্রন্থাগারের ব্যবহারে সহায়তা করার জন্য এবং সাধারণভাবে জনগণের নিকট গ্রন্থাগারিকরা নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিয়া থাকেন। এই উদ্দেশ্যে সাধারণ বই ছাড়া জিলা বোর্ডগুলি কৃষি, সমবায় ও স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রাপ্তব্য সর্বোৎকৃষ্ট বই সরবরাহ করে এবং গ্রাম্য সমাজের পক্ষে বিশেষ আকর্ষণমূলক অন্যান্য বিষয় যোগায় গ্রাম্য সমাজ বোর্ড ; আবার গ্রন্থাগারিকের ভাতার ব্যবস্থাও করে। যুক্ত প্রদেশের

(বর্তমানে উত্তর প্রদেশের) কয়েকটি জিলায় অনেকটা সাফল্যের সহিত চলন্ত গ্রন্থাগার এবং পুস্তক পরিবেশনকারী গ্রন্থাগার চালাইবার পরীক্ষা চলিতেছে। ব্রহ্মের জনশিক্ষার অধিকর্তা কিছুদিন আগে আমাকে জানাইয়াছিলেন যে, বরোদায় প্রচলিত চলন্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অনুরূপ ব্যবস্থা তিনি অবলম্বন করিয়াছেন এবং দেখিয়াছেন যে, তাহার পরিকল্পনাকে সার্থকভাবেই রূপ দেওয়া হইয়াছে। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীরঙ্গনাথনের পেশাগত শিক্ষণ লাভান্তে লণ্ডন হইতে প্রত্যাগমনের পর মাদ্রাজও সম্প্রতি এই বিষয়ে অনেকটা অগ্রগতি লাভ করিয়াছে। মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপিত হইয়া গ্রামে গ্রামে সক্রিয় প্রচার কার্য চালাইতেছে। জিলা গ্রন্থাগার পরিকল্পনাটি প্রথম ক্ষুদ্রাকারে আরম্ভ করিবার জন্ম চিঙ্গলপেট ও মালাবার জিলাকে ইহা রাজী করাইতে পারিয়াছে।

জনগণের পড়ার জন্য ইহা স্থানীয় ভাষার প্রয়োজনীয় বইগুলির একটি তালিকা প্রকাশ করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের পাঠক্রম বর্তমানে চালু করা হইয়াছে। গ্রন্থাগার সম্পর্কিত নির্দেশপুস্তকের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করা ইহার কার্যাবলীর মধ্যে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ইহাদের মধ্যে দুইখানা ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থাগারের পরিচালনা এবং গ্রন্থাগারের প্রচারকার্যে আগ্রহান্বিত ব্যক্তিদের নিকট আমি এই দুখানা বইকে সানন্দে সুপারিশ করি। প্রথম গ্রন্থখানি হইল গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে লর্ড গশেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, রঙ্গনাথন ও অন্যান্যের প্রবন্ধসংগ্রহ। আর দ্বিতীয়টি 'দি ফাইভ ল' অব লাইব্রেরী সায়েন্স' বা 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঁচটি নিয়ম' গ্রন্থাগার ব্যবহারের মূলকথা-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছে এবং ইহা ছবি, উপকথা ও মনোরঞ্জক হাস্যরস পরিবেশন করায় অত্যন্ত সুপাঠ্য হইয়াছে।

৯১৯ খৃষ্টাব্দে (১৩২৫-২৬ বঙ্গাব্দে) ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন সময়ে বার্ষিক সম্মেলনের ব্যবস্থাকল্পে ইহা বেশ কর্মতৎপর ছিল। যাহা হউক গত বহু বৎসর ইহার জীবনের স্পন্দন দেখা গিয়াছিল। আমার আশঙ্কা হয়, ইহাকে অচল বলিয়া মনে করা হইতেছে। অবশ্য ভারতের মত বিশাল দেশে প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলিই দক্ষতার সহিত সারগর্ভ কাজ করিতে পারে। মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদের কথা আমি পূর্বেই বলিয়াছি। বরোদা গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপিত হইয়াছে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে (১৩৩১-৩২ বঙ্গাব্দে)। ইহা রাজ্যের বারটি তালুক হইতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকরী সহযোগিতার সুবিধা পাইয়াছে। অপর একটি প্রতিষ্ঠান পাঞ্জাব গ্রন্থাগার পরিষদও আমাদের দৃষ্টিতে পড়ার যোগ্য। ইহা 'দি মডার্ণ লাইব্রেরিয়ান' নামক একটি উত্তম ত্রৈমাসিক

প্রকাশ করিতেছে। এই বৎসর দুইটি অগ্রগামী দেশীয় রাজ্য ত্রিবাঙ্কুর এবং কোচিন ও ব্রিটিশ জিলা মালাবারকে লইয়া কেরল গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হইয়াছে।

বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদ সম্বন্ধে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে আমার মাননীয় বন্ধু আপনাদের একনিষ্ঠ ও উৎসাহী সম্পাদক শ্রীসুশীল কুমার ঘোষের নিকট হইতে স্থাপনাবধি এই পরিষদ কি কাজ করিয়া আসিতেছে তাহা শুনিবার আশা রাখি। আমি ইহার কতকগুলি ভাল কাজের কথা জানি। ইহা এই কলিকাতানগরীর পৌরসভার সহানুভূতি ও সক্রিয় সমর্থন লাভ করিতে পারিয়াছে। কলিকাতা গ্রন্থাগারসমূহের কার্যদক্ষতা বৃদ্ধির পক্ষে অনেক কল্যাণকর সুফল পাওয়া গিয়াছে। ইহার পক্ষ হইতে জিলায় জিলায় গ্রন্থাগার সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়া হইতেছে। আর আমি জানিলাম যে, কলিকাতাকে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী হইতে বঞ্চিত করিবার এক ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য ইহা নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে। লাইব্রেরী আন্দোলন নামক একখানা উপকারী বইও ইহা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথম নিখিল এশিয়া শিক্ষা সম্মেলন গত ডিসেম্বর মাসে বারাণসীতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার অঙ্গীয় ছিল গ্রন্থাগারের জনসেবা বিভাগ। এই বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল 'লাইব্রেরী এনেব্লিং' বিল বা গ্রন্থাগারকে ক্ষমতার্পণ করার বিল-এর খসড়া প্রস্তুত করা। প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে প্রত্যেক প্রদেশের অভ্যন্তরে সরকারকে সর্বজনীন গ্রন্থাগার স্থাপন ও উহার শাসনসংরক্ষণকল্পে একটি গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ নিয়োগের ক্ষমতা দিয়া প্রত্যেক প্রাদেশিক আইন সভায় উক্ত খসড়া আইন উপস্থাপিত হইবে। আমার জানা আছে অনুরূপ ধরনের একটি খসড়া আইন বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদের সভাপতি কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় কর্তৃক বঙ্গীয় আইনসভায় উপস্থাপিত হইয়াছিল এবং বর্তমানে ইহা জনসমক্ষে প্রচার করা হইতেছে। ভারতময় চাঁদাহীন সর্বজনীন গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করিবার চেষ্টাকে সফল করিতে হইলে কয়েক বৎসর লাগিয়া যাইবে সন্দেহ নাই কিন্তু ইহা ঠিক যে, এদিকে অন্ততঃ কার্যারম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেক গ্রন্থাগার কর্মী উঠিয়া পড়িয়া লাগিলে পরিণামে সাফল্য করায়ত্ত হইবেই।

মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী ব্যক্তি জ্ঞানকে যখন যক্ষের ধনের মত সতর্কতার সহিত পুষিয়া রাখিত সেই প্রাচীনতম অবস্থা হইতে ভারতীয় গ্রন্থাগারের ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া আমরা গণতান্ত্রিক আমলে আসিয়া পৌঁছিলাম। বর্তমানে জনগণেরও জ্ঞানার্জনের অধিকার আছে বলিয়া দাবী করা হইতেছে। যে সকল জাতি সভ্য বলিয়া দাবী করে তাহাদের প্রত্যেকটিই দেশবাসীদিগকে বিনাব্যয়ে

বাধ্যতামূলক শিক্ষা দিতেছে। অবৈতনিক গ্রাম্য বিত্থালয়ের অপরিহার্য সহচর হইল চাঁদাহীন গ্রাম্য গ্রন্থাগার। ইহার অভাবে গ্রাম্য যুবকদের জন্য ব্যয়িত অর্থের বেশীর ভাগ্যরই যে অপচয় হইবে তাহা নিঃসন্দেহে। কারণ পাঠদ্দশার পরবর্তী জীবনে বই পড়ার সুযোগের অভাবে বালকবালিকাদের নিরক্ষরতার স্তরেই ফিরিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিবে। স্যার ওয়ালটার বেসান্তের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, 'চাঁদাহীন গ্রন্থাগার হইল বয়স্কদের বিত্থালয়, স্থায়ী এবং জীবনব্যাপী একনাগাড়ী পাঠস্থল এবং শিক্ষার যে কয়টি উপকরণ আমাদের আছে তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান। আর গ্রন্থাগারিক হইতেছে আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও উপদেষ্টা'।

ভারতে সর্বজনীন গ্রন্থাগার আন্দোলন বর্তমানে বিশ বৎসর যাবৎ চলিতেছে। ইহার অগ্রগতির কথা পর্যালোচনা করিয়া কোন কোন একনিষ্ঠ এবং আগ্রহশীল কর্মী এপর্যন্ত কালপ্রাপ্তিতে নিরুৎসাহ হইতে পারে। এই নিরুৎসাহ ব্যক্তিদিগকে আমি আশা ও সান্ত্বনার বাণী শুনাইতে চাই। তাঁহারা যেন মনে রাখেন যে, তাঁহাদিগকে দেশের ভয়াবহ দারিদ্র্য এবং নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতাজনিত নিষ্ক্রিয়তা এই দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হইতেছে। স্বভাবতঃই আমি আপনাদিগকে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য সহৃদয় ও সাহসী হইতে বলি, বিশ্বাস করিতে বলি যে, আপনাদের চেষ্টা পরিণামে সফলতা লাভ করিবেই এবং একদা এশিয়ার পবিত্র স্থান, সংস্কৃতি ও আলোকের উৎস আমাদের প্রিয় জন্মভূমি ভগবৎকৃপায় এবং তাহার অনুরক্ত সন্তানসন্ততিদের চেষ্টায় পৃথিবীর মহান এবং আলোকপ্রাপ্ত জাতিগুলির মধ্যে যথাযোগ্য স্থান পাইবে।

ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরী

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ভারতবর্ষে আসিবার পথ আবিষ্কৃত হইবার পর ইউরোপীয় বণিকেরা দলে দলে এদেশের ধন-সম্পদ আহরণের জন্য আসিতে লাগিল ; তাহারা ভারতবর্ষের মণি-মুক্ত-হীরা-জহরতের কাহিনী শুনিয়াছে ; কিন্তু আমাদের সভ্যতার ইতিহাস তাহাদের তো দূরের কথা, ইউরোপে পণ্ডিতমণ্ডলীরও জানা ছিল না। যে সব ইংরেজ, পর্তুগীজ প্রভৃতি প্রথম এদেশে আসিয়াছিল তাহারা ভাগ্যান্বেষী ভবঘুরে। প্রায় দেড় শত বৎসর তাহারা স্বর্ণের সন্ধানে ফিরিয়াছে এই দেশকে চিনিবার ক্ষমতা বা আগ্রহ তাহাদের ছিল না। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করিবার পর শাসন কার্য পরিচালনার জন্য যোগ্যতর ইংরেজ এদেশে আসিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাদের দৃষ্টি ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের জ্ঞানভাণ্ডারের দিকে আকৃষ্ট হইল।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনে তখনও মুসলমান প্রভাব অপ্রতিহত। ফার্সী ছিল রাষ্ট্রভাষা। তাই বিদেশীরা প্রথম আসিয়া ফার্সীর চর্চা আরম্ভ করিল এবং এইজন্যই ইউরোপে প্রাচ্য বিদ্যার প্রথম আলোচনা সুরু হয় আরবী ফার্সীকে কেন্দ্র করিয়া। সংস্কৃতের সমাদর কিছুকাল পরে হইয়াছিল। কিন্তু পরে আসিয়াও সংস্কৃত প্রাচ্য-বিদ্যার চর্চায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংস এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি ঘোষণা করিলেন যে, এদেশীয়রা তাহাদের নিজেদের প্রাচীন আইন অনুসারেই শাসিত হইবে। সুতরাং হিন্দু আইনের পুথিগুলি অনুবাদের প্রয়োজন হইল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ইংরেজী জানিতেন না, ফার্সী জানিতেন আবার ইংরেজদেরও সংস্কৃতের জ্ঞান ছিল না, কিন্তু ফার্সীর জ্ঞান ছিল। অতএব আইনের সংস্কৃত পুথিগুলি ফার্সীতে ভাষান্তরিত করা হইল। ইহাই ভারতবর্ষে সংস্কৃত চর্চ্চার সূত্রপাত।

ইহার আট বৎসর পরে স্যার উইলিয়াম জোন্স এশিয়ার ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, শিল্প ও সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করে। এই সমিতির সভ্যগণের সমবেত প্রচেষ্টায় এবং অনেক বিদেশী বিদ্যোৎসাহীর ব্যক্তিগত উদ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যের গবেষণা

চলিতে লাগিল। বাংলাদেশই এবিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উৎসাহী ছিল। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরবর্গ ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মে তারিখের এক "পাবলিক লেটারে" তাঁহারা বলেন :

"We understand it has been of late years a frequent practice among our servants, especially in Bengal to make collections of Oriental Manuscripts, many of which have afterwards been brought into this country."

এই সব প্রাচীন পুথিগুলি যাঁহারা সংগ্রহ করিতেন তাঁহাদেরই ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিগণিত হইত। কেহ কেহ ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় পুথি, দেবদেবীর মূর্তি এবং ভারতীয় সভ্যতার অন্যান্য প্রাচীন নিদর্শনগুলি ইংলণ্ডে লইয়া যাইতেন। কিন্তু বিক্ষিপ্তভাবে ছড়াইয়া থাকিত বলিয়া এগুলি পণ্ডিতমণ্ডলীর কাজে আসিত না এবং যথাযোগ্য যত্নের অভাবে অনেক অমূল্য নিদর্শন বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছিল। ইহা খুবই প্রশংসার কথা যে, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরবর্গের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়। উপরোক্ত "পাবলিক লেটারে" তাঁহারা মন্তব্য করেন যে,

"By the accidents of time, and the exportation of many of the best manuscripts, a progressive diminution of the original stock, Hindostan may at length be much thinned of its literary stores without greatly enriching Europe. To prevent in part this injury to Letters, we have thought that the Institution of a public Repository in this Country for Oriental Writings would be useful, and that a thing professedly of this kind is still a bibliothecal desideratum here··· We think the India House might with particular propriety be the centre of an ample accumulation of that nature."

ইণ্ডিয়া আপিস গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ইহাই প্রথম অস্পষ্ট সূচনা। অস্পষ্ট বলা হইল এইজন্য যে, ডিরেক্টরবর্গ পরিষ্কারভাবেই বলিয়াছেন, এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য তাঁহারা অর্থব্যয় করিবেন না। গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্দেশ্য তাঁহাদের ছিল না। ইণ্ডিয়া হাউসের একটি ঘরে ভারতীয় সভ্যতার চিহ্নগুলি গুদামজাত করিয়া রাখা হইবে এবং দাতার নাম সহ একটি তালিকাও প্রস্তুত করা হইবে,

ইহাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। কোম্পানীর কর্মচারীদিগকে ভারতীয় সভ্যতাসম্পর্কিত সংগ্রহগুলি ইণ্ডিয়া হাউসে জমা দিবার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

কেহ কেহ বলেন যে, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিজস্ব ঐতিহাসিক এবং *Historical Fragments of the Mogul Empire* (1805) এর লেখক রবার্ট অর্‌ম কোম্পানীকে এই বিষয়ে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। অর্‌ম যদিও এদেশীয় ভাষা ও সাহিত্যে দক্ষতা লাভ করিতে পারেন নাই তথাপি ভারতীয় সংস্কৃতির উপর তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। তিনি লণ্ডনে তাঁহার বন্ধুমহলে বলিয়া বেড়াইতেন যে, শুধু মৌলিক ও মূল্যবান পুথিগুলি ইংলণ্ডে লইয়া যাইবার জন্যই প্রকাণ্ড বড় এক জাহাজের সম্পূর্ণটা বোঝাই করিতে হইবে।

ডিরেক্টরবর্গের মনে যাহা অঙ্কুর মাত্র ছিল চার্লস্ উইলকিন্সের তাগিদ ও উৎসাহ ব্যতীত তাহা বর্ত্তমান গ্রন্থাগারে পরিণত হইতে পারিত কিনা সন্দেহ। ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে কিংবা তাহার পরবর্ত্তী বৎসরে ইংলণ্ডের সমারসেট অঞ্চলে উইলকিন্স জন্মগ্রহণ করেন। বিশ বৎসর বয়সে তিনি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকুরী লইয়া বাংলাদেশে আসেন। প্রথম সাত আট বৎসর বাংলা ও ফার্সী ভাষার চর্চ্চা করিবার পর সংস্কৃত ভাষার রত্নখনির উপর তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই উইলকিন্স সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের চেষ্টায় ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যয়ে তৎকৃত ভগবদ্গীতার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এই অনুবাদ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই; কিন্তু ১৫৬ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পুস্তকটি বিদেশীদের নিকট এক নূতন জগতের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। উইলকিন্স ইহার পর মনুসংহিতার অনুবাদ আরম্ভ করেন। এক-তৃতীয়াংশ অনুবাদ হইবার পর স্যার উইলিয়াম জোন্স ইহা দেখিতে পান এবং অনুবাদ সম্পূর্ণ করিবার জন্য পাণ্ডুলিপি তাঁহার হাতে দিবার অনুরোধ জানাইলেন। উইলকিন্স সানন্দে অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি জোন্স সাহেবের হস্তে অর্পণ করেন। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে স্যার জোন্সের নামাঙ্কিত হইয়া *Institutes of Hindu Law* প্রকাশিত হয়। এই ব্যাপারে উইলকিন্সের স্ব নাম প্রচারে যে নির্লিপ্ততা দেখা যায় তাহা সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল। বাংলা হরফের আবিষ্কর্ত্তা হিসাবে বাঙালীর ইতিহাসে উইলকিন্সের নাম চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। হ্যাল্‌হেড সাহেবের *Grammar of the Bengali Language* (1778) মুদ্রিত করিবার সময় বাংলা হরফের প্রয়োজন দেখা দেয়। ওয়ারেন হেষ্টিংসের অনুরোধে উইলকিন্স এই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং প্রথম প্রবর্ত্তকের পক্ষে প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়ায় মাত্র ১৬ বৎসর চাকুরীর পর উইলকিন্স স্বদেশে

প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দেশে ফিরিয়াও তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা হইতে বিরত হন নাই। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে অগ্নিসংযোগের ফলে তাঁহার গৃহ এবং অন্যান্য সম্পত্তি ভস্মীভূত হইয়া যায়। ইহাতে উইলকিন্স বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়েন। এই সময় কোম্পানীর প্রস্তাবিত পুস্তক-সংগ্রহশালার কথা শুনিতে পাইয়া তিনি একটু আশান্বিত হইয়া উঠেন। কারণ এই ব্যাপারে তাঁহার ন্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি তখন ইংলণ্ডে অপর কেহ ছিলেন না।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে উইলকিন্স ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর-বর্গের নিকট নিজের যোগ্যতা উল্লেখ করিয়া প্রস্তাবিত 'ওরিয়েণ্টাল মিউজিয়াম' (Oriental Museum) এর পদের জন্য আবেদন করেন। বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ তাঁহার নিকট হইতে ইহার একটি পরিকল্পনা চাহিয়া লওয়া ছাড়া এই আবেদন সম্পর্কে আর কিছুই করিলেন না। উইলকিন্স ওরিয়েণ্টাল মিউজিয়ামের যে খসড়া করিয়াছিলেন তাহাতে মোটামুটি তিনটি বিভাগ দেখানো হইয়াছিল : (১) গ্রন্থাগার ও মিউজিয়াম, (২) প্রকৃতিজাত ও (৩) শিল্পজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী। প্রাচ্যের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে পুথি পুস্তক, ম্যাপ, চার্ট, ছবি, মূর্ত্তি, ঐতিহাসিক লিপি, মুদ্রা প্রভৃতি সকল নিদর্শনের সংগ্রহশালা গড়িয়া তুলিবার ব্যাপক পরিকল্পনার আভাস উইলকিন্স দিয়াছিলেন। বাংলার কয়লা, বীরভুমের পোর্সিলিন মাটি প্রভৃতির নমুনা রাখিবার জন্য উইলকিন্স তাঁহার রিপোর্টে বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। উইলকিন্সের এই পরিকল্পনা কখনো সফল হয় নাই। তথাপি ইণ্ডিয়া আপিসের প্রাচ্য সংগ্রহশালা এক সময় বিশেষ জনপ্রিয় ছিল।

উইলকিন্স ওরিয়েণ্টাল রিপোজিটরী (Oriental Repository) সম্বন্ধে তাঁহার রিপোর্ট পেশ করিয়া নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত কোম্পানীর নিকট হইতে কোন জবাব পাইলেন না। তখন তিনি ওয়ারেন হেষ্টিংসের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। হেষ্টিংস সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং অল্পদিন পরেই উইল-কিন্সের জন্য সুপারিশ করিয়া ডিরেক্টরবর্গের নিকট এক চিঠি লিখিলেন। ইহাতে তিনি লেখেন যে, উইলকিন্সই এই কাজের একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি।

কোম্পানীর ডিরেক্টরবর্গের সভায় হেষ্টিংসের চিঠি পড়া হইল। কিন্তু সত্যকার কোন কাজ হইল না ; চিঠি নথিভুক্ত হইয়া রহিল মাত্র। কিন্তু উইলকিন্স ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। তিনি হতাশ না হইয়া বৎসরখানেক অপেক্ষা করিবার পর পুনরায় ওরিয়েণ্টাল রিপোজিটরী'র লাইব্রেরীয়ান এবং কোম্পানীর Oriental Translator-এর পদ প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত করিলেন। গ্রন্থাগার স্থাপনের পূর্ব্বেকার সকল প্রস্তাব ইণ্ডিয়া বোর্ডের সভাপতি ডাণ্ডাসের বিরোধিতায় বিফল

হইয়াছিল মনে হয়। এবার যখন উইলকিন্সের চিঠি আসিল তখন ডাণ্ডাস পদত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং উইলকিন্সের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল। উক্ত রিপোজিটরী সম্পর্কিত সমগ্র ব্যাপার আলোচনার পর কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ সিদ্ধান্ত করিলেন :

"Resolved that Mr. Charles Wilkins be appointed Librarian to the Oriental Repository with a salary of £200 per annum, and that Mr. Bruce the Company's Historiographer be always permitted to have free access to the Books and Papers contained therein."

উইলকিন্স ১৮০১, ১৮ই ফেব্রুয়ারী কোম্পানীর লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হন।

লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হইল, উপযুক্ত লাইব্রেরিয়ানও পাওয়া গেল। কিন্তু ইহা যে ধরনের সংগ্রহশালা হইবার কথা তাহার জন্য যোগ্য পুথি-পুস্তক পাওয়া সময় ও আয়াস-সাধ্য। পুথি এবং প্রাচ্য সভ্যতার নিদর্শনসমূহের সংগ্রহ সম্পূর্ণ নির্ভর করিত কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের ব্যক্তিগত দানের উপর। এই সব জিনিষ সংগ্রহ করিবার জন্য কোম্পানীর নিজস্ব কোন ব্যবস্থা ছিল না।

লাইব্রেরীর 'ডে বুক' বা দৈনিক পুথি-পুস্তক প্রাপ্তির তালিকা হইতে দেখা যায় যে, সর্ব্বপ্রথম তিনটি হাতীর মাথার খুলি পাওয়া গিয়াছিল (২০শে নভেম্বর, ১৮০১)। ইহার তিন দিন পরে পাওয়া গেল একটি মূল ফার্সী পুথির নকল; ইংরেজী নাম—*Mogul History*।

লাইব্রেরীর প্রথম বৎসরের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান প্রাপ্তি কোম্পানীর নিজস্ব ঐতিহাসিক রবার্ট অর্মের সংগ্রহ। এই সংগ্রহে ১৭৫০-৮৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত ১৯০ খানা ভারতবর্ষ সম্পর্কিত পুস্তিকা; ২৩১ খানা পুথি, এবং ম্যাপ, স্কেচ, নক্সা, ছবি, চিঠিপত্র, ইত্যাদি।

প্রথম সংস্কৃত পুঁথি যাহা পাওয়া গেল তাহা শাহ্‌নামার সংস্কৃত অনুবাদ।

ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে মেজর বীট্সনের নিকট হইতে পাওয়া গেল *The Original Manuscript Record of Tippoo Sultan's Dreams*। টিপু ইহা অত্যন্ত গোপনে আপন কক্ষে লুকাইয়া রাখিতেন। দুই এক জন বিশ্বস্ত পরিচারক ব্যতীত অন্য কেহ ইহার অস্তিত্ব জানিত না। ইংরেজদের তাড়াইয়া কি করিয়া দেশ স্বাধীন করা যায় এই চিন্তা যে টিপুর হৃদয় দিবা-রাত্রি সর্ব্বক্ষণ অধিকার করিয়া ছিল এই রোজ-নাম্চা তাহার প্রমাণ।

এই প্রসঙ্গে কয়েক বৎসর পরে প্রাপ্ত টিপু সুলতানের বাঘের কথা বলা যাইতে পারে। সেরিঙ্গাপট্টম পতনের পর টিপুর প্রাসাদ হইতে এই বাঘ পাওয়া

গিয়াছিল। একটি বাঘ প্রতিশোধ লইবার জন্য ভূতলশায়ী এক ইংরেজের বুকের উপর চড়িয়া বসিয়াছে। এই মূর্ত্তির মধ্যে আশ্চর্য্য কারিগরি ছিল। একটা হাতল ঘুরাইলেই বাঘের গর্জ্জনের সঙ্গে মুমূর্ষু ইংরেজের আর্ত্তনাদ মিশ্রিত একটা শব্দ বাহির হইত। এই মূর্ত্তিটা ছিল তখনকার লণ্ডনবাসীদের পরম বিস্ময়ের বস্তু। ইংরেজ জাতির পক্ষে মর্য্যাদাহানিকর বলিয়া অনেক কাগজে সমালোচনা হওয়ায় মূর্ত্তিটি ভিক্টোরিয়া এণ্ড এল্‌বার্ট মিউজিয়ামের 'ইণ্ডিয়া' বিভাগে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

গ্রন্থাগারের জন্য কিছু কিছু পুথি ও অন্যান্য নিদর্শন পাওয়া গেলেও ভারতবর্ষ হইতে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া গেল না। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুনের *Dispatch to Bengal*-এ বলা হইয়াছে ঃ

"We cannot but express our disappointment that our intentions have not been attended with that success we had reason to expect. and we are sorry to be under the disagreeable necessity of attributing the failure in some degree to the indifference it has experienced from our Bengal Government, by whom it does not appear that any particular exertions have been made to forward our views."

এই ডেস্‌পাচে কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগকে ভারতবর্ষ সম্পর্কিত পুথি, পুস্তক, মুদ্রা এবং অন্যান্য নিদর্শন সংগ্রহ করিবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইল।

প্রকৃতপক্ষে কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা এই বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। ইতিমধ্যে এশিয়াটিক সোসাইটি এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সংগৃহীত পুথি ইত্যাদির অধিকাংশই লণ্ডনে না পাঠাইয়া এই দুই স্থানে রাখা হইত।

যাহাই হউক, বাংলা-সরকার লণ্ডনের নির্দ্দেশপত্র কর্ম্মচারীদের মধ্যে প্রচার করিলেন এবং প্রাসঙ্গিক অংশ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত করিলেন (২৬শে জুন, ১৮০৬)। ইহার পর লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষকে আর কখনও বইয়ের অভাবের জন্য অভিযোগ করিতে হয় নাই।

লাইব্রেরীর আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাজও বাড়িয়া গেল। উইলকিন্স একা কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন। এখন একে একে তাঁহার অধীনে দুই-একজন কেরাণী নিযুক্ত হইতে লাগিল। কোম্পানী যাহা বইয়ের গুদাম করিতে চাহিয়াছিল ক্রমশঃ তাহা গ্রন্থাগার না হইয়া পারিল না। অর্থাৎ জনসাধারণের মধ্য হইতে অনেকে এই

পুস্তক-সংগ্রহ ব্যবহার করিবার জন্য আবেদন করিতে লাগিল। কোম্পানী অনুমতি দিতে বাধ্য হইল।

এদিকে মিউজিয়াম বিভাগে সংগৃহীত দ্রব্যের সংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এশিয়া ও আফ্রিকার যে সব জায়গায় কোম্পানীর কারবার ছিল সেই সব স্থান হইতে ক্রমাগত বিচিত্র দ্রব্যসম্ভার আসিতে লাগিল: ঠগ দস্যু দল-পতির মাথার খুলি, স্পিরিটে রাখা সাপ, ব্যাঙ্, মাছ, বিভিন্ন দেশের মুদ্রা, প্রস্তরমূর্ত্তি ইত্যাদি; কৃষিজাত ও খনিজ দ্রব্যাদি। মিউজিয়াম বিভাগের প্রসার হওয়ায় ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে লাইব্রেরিয়ানের অধীনে একজন কিউরেটর নিযুক্ত করা হইল।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুনের বেঙ্গল ডেস্‌পাচের নির্দ্দেশ এদেশে প্রচারিত হইবার পর হইতে ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরীতে অবিরাম গতিতে পুথি ও পুস্তক আসিতে লাগিল। বিভিন্ন ব্যক্তিগত সংগ্রহগুলির উল্লেখ করিতে গেলেও এক বিরাট তালিকা হইয়া পড়িবে। ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরীতে বিশ হাজারের অধিক মূল্যবান হস্তলিখিত পুথি আছে, ইহাদের সবগুলির সম্যক্ আলোচনা এখনও হয় নাই। রবার্ট অর্মের ব্যক্তিগত সংগ্রহ লইয়া লাইব্রেরী আরম্ভ হইয়াছিল, একথা বলা যাইতে পারে। এই সংগ্রহ হইতে ইংরেজদের ভারতবর্ষে তৎকালীন সামরিক কার্য্যকলাপ এবং ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও সামাজিক তথ্য জানা যায়। হায়দার আলির সঙ্গে যুদ্ধ সম্পর্কে অনেক গোপন তথ্য একমাত্র অর্মের দলিলপত্র হইতে পাওয়া যাইতে পারে। ভারত সরকারের সার্ভেয়ার-জেনারেল কর্ণেল ম্যাকেঞ্জির সংস্কৃত, ফার্সী, আরবী, তামিল, তেলুগু পুথি-সংগ্রহ দক্ষিণ-ভারত সম্পর্কে বিশেষ মূল্যবান। হজসন (Brian Houghton Hodgson) নেপাল ও তিব্বত হইতে নানা জাতীয় পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং ইহার পর হইতে ঐ দুই দেশের সম্পদের প্রতি পণ্ডিতমণ্ডলীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ওয়ারেন হেষ্টিংস ও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস্; লিডেন, স্যার উইলিয়াম জোন্স; বুলার প্রভৃতি প্রত্যেকটি সংগ্রহ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। কোল্‌ব্রুক্‌-সংগ্রহকে সংস্কৃত বিভাগের মেরুদণ্ড বলা হইয়া থাকে। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল বাওয়ার পূর্ব্ব তুর্কীস্থানে ভূর্জ্জপত্রে লিখিত আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধীয় সংস্কৃত পুথি আবিষ্কার করেন। এই বিখ্যাত 'বাওয়ার ম্যানাস্‌ক্রিপ্ট' ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরীতে রহিয়াছে। স্যার অয়েল ষ্টেন তুর্কীস্থান, খোটান ও মধ্য এশিয়ার ভ্রমণ করিয়া খরোষ্ঠী লিপিতে লেখা যে-সব সংস্কৃত পুথি পাইয়াছিলেন তাহাও এই গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।

লাইব্রেরীর মুদ্রিত পুস্তক-সংগ্রহের ইতিহাসে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ স্মরণীয় বৎসর। ঐ

বৎসর Indian Press and Registration of Books Act (Act XXV of 1867) পাস হইয়াছিল। এই আইনানুযায়ী ভারতবর্ষে মুদ্রিত প্রত্যেক পুস্তকের এক কপি ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরীর পাইবার ব্যবস্থা হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহাদ্বারা ভারতীয় পুস্তক সম্পর্কে এই গ্রন্থাগার ঐ বৎসর হইতে কপিরাইট লাইব্রেরীর সুবিধা পাইতে থাকে। কিন্তু এই ব্যবস্থা অবলম্বনের পর এত অধিক সংখ্যক বই আসিতে লাগিল যে, তাহার সবগুলি রাখিবার বন্দোবস্ত করা সম্ভব হইল না। সুতরাং দশ বৎসর পরে তৎকালীন লাইব্রেরিয়ান রষ্ট সাহেব এক নূতন পরিকল্পনা করিলেন। স্থির হইল, প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট প্রকাশিত পুস্তকের ত্রৈমাসিক তালিকা মুদ্রিত করিয়া লণ্ডনে প্রেরণ করিবেন এবং ঐ তালিকা হইতে লাইব্রেরিয়ান যে সব পুস্তক নির্ব্বাচন করিবেন সেগুলিই শুধু ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরীতে পাঠাইতে হইবে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমানে পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক সভ্য দেশেই জাতীয় গ্রন্থসূচী (National Bibliography) প্রকাশিত হয়। প্রাদেশিক সরকার প্রকাশিত ত্রৈমাসিক তালিকাগুলিই আমাদের জাতীয় গ্রন্থসূচীর অভাব কিয়দংশে পূরণ করে। অবশ্য 'লালফিতা'র বন্ধন মুক্ত হইয়া এই তালিকা জনসমক্ষে প্রকাশিত হইতে কখনও কখনও তিন-চারি বৎসর বিলম্ব ঘটে।

এই তো গেল বিনামূল্যে লাইব্রেরীর জন্য পুস্তক সংগ্রহের ব্যবস্থা। পুস্তক ক্রয় সম্বন্ধে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত নীতি অনুসরণ করা হইতেছে : (১) একেবারে নিকৃষ্ট না হইলে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সকল পুস্তক ; (২) গৌণভাবে ভারতবর্ষের কথা আলোচিত হইয়াছে এরূপ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ; এবং (৩) এশিয়া সম্বন্ধীয় যে কোন পুস্তকে ভারতবর্ষের আলোচনা আছে তাহা ক্রয় করিতে হইবে।

পুথি ও মুদ্রিত পুস্তক ছাড়া এই গ্রন্থাগারে ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় ছবি ও ফটোর অপূর্ব্ব সংগ্রহ আছে।

ইণ্ডিয়া আপিস গ্রন্থাগারকে সম্পদশালী করিবার মূলে রহিয়াছে ইহার বিভিন্ন গ্রন্থাগারিকদের ঐকান্তিক সাধনা। ইঁহারা গ্রন্থাগারের তত্ত্বাবধায়ক শুধু ছিলেন না ; প্রায় প্রত্যেকেরই ছিল প্রাচ্য-বিদ্যায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। আমরা দেখিয়াছি উইলকিন্সের আগ্রহ ও অধ্যবসায় না থাকিলে এই লাইব্রেরী স্থাপিত হইত কিনা সন্দেহ। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হোরেস হেমান উইলসন লাইব্রেরীয়ান নিযুক্ত হন। তাঁহার কার্য্যকালেই মিউজিয়াম বিভাগটী লাইব্রেরী হইতে পৃথক করা হয় এবং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর হাত

হইতে গ্রন্থাগার খাস গবর্ণমেন্টের অধীনে চলিয়া যায়। ইহার পর ডাঃ ব্যালেন্টাইন, অধ্যাপক হল, ডাঃ রষ্ট, অধ্যাপক টনি, ডাঃ টমাস প্রভৃতি একে একে গ্রন্থাগারিকের কাজ করেন। ইহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কার্যকালে লাইব্রেরীর উন্নতি সাধন করিয়াছেন।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের হিসাব অনুসারে দেখা যায় যে, ইণ্ডিয়া আপিস গ্রন্থাগারে প্রায় দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার পুস্তক ও বিশ হাজার পুথি আছে। ঐ বৎসরের কমিটি অব ইন্‌ভেষ্টিগেশানের রিপোর্টে মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা এইরূপ:

১। প্রাচীন (Classical) ভাষা সমূহ:	
আরবী ও ফার্সী	১০,০০০
সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত	২,০০০
তিব্বতী	১০০
চীনা	১,৮০০
জেন্দ্‌ ও পহ্লবী	২০০
২। ইউরোপীয় ভাষাসমূহ	৬০,০০০
৩। আধুনিক ভারতীয় ভাষা:	
আসামী	৭০০
বাংলা	২৪,০০০
গুজরাটি	৯,৫০০
হিন্দী	১৯,০০০
কানাড়ী	৩,১৬০
মালায়ালাম	১,৩৫০
মৈথিলী	২৯
মারাঠী	৯,২০০
নেপালী	৩৭০
ওড়িয়া	৩,৯৫০
পাঞ্জাবী	৪,৯২৫
পুস্ত	৩১৫
সাঁওতালী	১২৫
সিন্ধি	২,৫০০
তামিল	১৫,২৫০
তেলুগু	৯,৫০০
উর্দ্দু	১৯,০০০, ইত্যাদি।

ইহা ছাড়া বার্মিজ, স্যামিজ, মালয়, জাভানিজ, প্রভৃতি ভাষায় লিখিত পুস্তকও রহিয়াছে। আর রহিয়াছে বহু মূল্যবান ছবি এবং ভারত সম্পর্কিত মূল রেকর্ড-পত্র, ইত্যাদি।

যে সকল জ্ঞানতপস্বী ভারতবর্ষের সত্য পরিচয় জানিবার জন্য গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া প্রাচীন নিদর্শন সংগ্রহ করিয়াছেন, একটি হস্তলিখিত পুথি পাইবার আশায় নেপাল ও তিব্বতের বিপদসঙ্কুল বনে ও পর্ব্বতে যাঁহারা ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে যাঁহারা মধ্য এশিয়ার মরুভূমিতে প্রাণ বিপন্ন করিতেও দ্বিধা করেন নাই তাঁহাদের সংগ্রহগুলি লইয়াই ইণ্ডিয়া আপিস গ্রন্থাগারের প্রধান গৌরব। মুদ্রিত পুস্তক ক্রয় করিতে পারা যায় কিন্তু আমাদের অতীত গৌরবের যে নিদর্শনগুলি এখানে দেখিতে পাই তাহা নির্লোভ জ্ঞানতপস্বীদের তপস্যালব্ধ ফল।

লাইব্রেরীর অমূল্য সম্পদগুলি ব্যবহার সম্বন্ধে কঠোর বিধি নিষেধ আছে বলিয়া আশঙ্কা হইতে পারে। কিন্তু তাহা অমূলক, লাইব্রেরী-কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে উদার মত পোষণ করেন। প্রত্যেক পাঠককেই পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হয়। হস্তলিখিত পুথি, ছবি, ইত্যাদি ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতদের নিকট ডাকে পাঠানো হইয়া থাকে। এগুলি হারাইয়া গেলে পূরণ করা যায় না, কিন্তু সুখের বিষয় যে, আজ পর্য্যন্ত কিছু হারায় নাই। এই উদার নীতির ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সুধীবৃন্দ গ্রন্থাগার ব্যবহারের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা পাইয়াছেন।

আমরা টাকা দিয়াছি বলিয়া নয়, আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের নজিরগুলির উপর আমাদের নৈতিক দাবি রহিয়াছে। এই নজিরগুলি কাগজ, কাঠ, ভূর্জ্জপত্র, তালপত্র, চামড়া, হাতীর দাঁত, পোড়ামাটি, স্বর্ণ, রৌপ্য, শিলা, তাম্র প্রভৃতির উপর সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, খরোষ্ঠী, বাংলা, হিন্দী, তামিল, তেলুগু, মারাঠী ইত্যাদি ভাষায় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। সুখের বিষয়, ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরীর উপর তাঁহাদের অধিকার ত্যাগ করিতে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু তিন বৎসর চলিয়া গেল ; তথাপি এই গ্রন্থাগার আনা হইল না। গ্রন্থাগার এখানে আনিয়া পুনঃস্থাপন করিবার জন্য যে বিরাট ব্যবস্থার প্রয়োজন তাহাও আরম্ভ করা হয় নাই। সুতরাং একদিন পরাধীনতার অন্ধকারে যে অমূল্য বস্তুগুলি দেশের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল সেগুলি যে কবে স্বদেশে ফিরিয়া আসিবে তাহার নিশ্চয়তা দেখা যাইতেছে না। এই অবহেলা ভারতের প্রাচীন সভ্যতার প্রতি প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা সূচনা করে না কি ?

গুজরাটের প্রাচীন জৈন-গ্রন্থাগার

বিমলকুমার দত্ত

প্রাচীন ভারতের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও প্রসার আন্দোলনে বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় জৈনধর্ম্মের দানও অবিসম্বাদিত। জৈনধর্ম্মের প্রধান ও প্রাচীন কেন্দ্র হিসাবে গুজরাট বিশেষ খ্যাত। ৭৪৫-৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বনরাজ নামক জনৈক নৃপতি গুজরাটের প্রাচীন রাজধানী পত্তন বা আনিহল পত্তনের প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমান আক্রমণে বার বার বিধ্বস্ত হয়েও সেই প্রাচীন কাল থেকে পত্তননগরী তার সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে। একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দে রাজা কুমারপাল ও সচিব বাস্তুপালের পৃষ্ঠপোষকতা ইহার অন্যতম প্রধান কারণ।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে পত্তনের নাম চিরপ্রসিদ্ধ। পত্তনের জৈন-গ্রন্থাগারগুলি জৈন-ভাণ্ডার নামে খ্যাত। রাজা কুমারপালের পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্ম্ম ও সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হয়। সে সময় জৈন-আচার্য্যদের পঠন-পাঠনের জন্য পুঁথি দান করা বিশেষ পুণ্যকার্য্য বলে গণ্য হ'ত। সাধারণ লোক এরূপ দানের জন্য প্রচুর অর্থব্যয়ে জৈন পুঁথি নকল করাতেন। জানা যায় যে, কুমারপালের রাজত্বকালে ২১টি ও মন্ত্রী বাস্তুপালের আমলে তিনটি গ্রন্থভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ২৪টি গ্রন্থ-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠায় ব্যয় হয়েছিল ১৮ কোটি টাকা।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, রাজা কুমারপালের আদেশে যে সকল জৈন পুঁথি রচিত হয় আজ তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ তাঁর পরবর্ত্তী সম্রাট্ অজয়-পালের দ্বারা উক্ত পুঁথিপত্র বিনষ্ট হয়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত জৈনবিদ্বেষী। অজয়পালের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য তাঁর মন্ত্রী উদয়ন কিছু কিছু পুঁথি জয়সলমীরে স্থানান্তরিত করেন। বাস্তুপালের সমসাময়িক পুঁথিগুলি মুসলমানদের দ্বারা ভস্মীভূত হয়। হিন্দু ও মুসলমান রাজাদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচবার জন্য বহু লেখক ও শিল্পী জয়সলমীরে আত্মগোপন করেন। ঐ সকল স্থানে প্রাপ্ত পুঁথিপত্রই পত্তনের অবশিষ্টাংশ।

প্রায় ১০০ বছর আগে কর্ণেল টড্ তাঁর *Annals of Rajasthan* নামক বিখ্যাত পুস্তকে এই সকল জৈন-ভাণ্ডারের কথা উল্লেখ করেন। অতঃপর ডাঃ বুলার, ডাঃ ভাণ্ডারকর ও অধ্যাপক পিটারসন প্রমুখ মনীষিগণ উক্ত লুপ্ত ভাণ্ডার থেকে

জ্ঞানরত্ন উদ্ধারকার্য্যে ব্রতী হন। বরোদা সরকার উক্ত কার্য্য সমাপ্ত করবার জন্য শ্রীমণিলাল দ্বিবেদী মহাশয়কে নিয়োগ করেন। দ্বিবেদী মহাশয় নিম্নলিখিত বারটি ভাণ্ডারের সন্ধান দিয়েছেন।

১। পোফালিয়া ভাদোর ভাণ্ডার : ১নং
২। ঐ : ২নং
৩। ঐ : ৩নং

৪। ক্ষেত্তরসির ভাণ্ডার, ৫। ভবন পাদোর ভাণ্ডার, ৬। নিলেমিদা পাদোর ভাণ্ডার, ৭। ভাদি পাশ্বনার্থের ভাণ্ডার, ৮। সালি ভাদোর ভাণ্ডার, ৯। ধনদের ভাদোর ভাণ্ডার, ১০। লুঙ্ক উপাশ্রয়ের ভাণ্ডার, ১১। রঙ্গুদা ভরদ্বাজের ভাণ্ডার, ১২। মণিশঙ্কর দেশাইয়ের ভাণ্ডার।

উক্ত বারটি ভাণ্ডার ব্যতীত আরও একটি ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তন্মধ্যে ১১ ও ১২ নং ভাণ্ডার দুটি হিন্দুধর্ম সংক্রান্ত পুঁথির। উক্ত তালিকার ১, ২ ও ৪ নং ভাণ্ডার ব্যতীত অন্য ভাণ্ডারগুলির পুঁথিসকল কাগজে লিখিত ; কেবল-১।২ ও ৪ নং ভাণ্ডারের পুঁথিগুলি তালপাতার। ৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে অধ্যাপক পিটারসন কাজ আরম্ভ করেন : তিনি দ্বিবেদী মহাশয়ের সমসাময়িক। কিছু দিন হ'ল উক্ত জৈন-ভাণ্ডারগুলির একটি ধারাবাহিক তালিকা জৈন সম্মেলন কর্তৃক প্রণয়নের ব্যবস্থা হয়েছে। উক্ত জৈন ভাণ্ডারগুলির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে অধ্যাপক পিটারসনের নিম্নলিখিত মত উল্লেখযোগ্য,—

"I know of no other town in India and a few in the world, that can boast of so great a store of documents of such venerable antiquity, They would be the pride and jealously guarded treasure—of any University Library in Europe".

বরোদার গ্রন্থাগার

নক্ষত্রলাল সেন

ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্য (Native State) সমূহের মধ্যে বরোদা যে একটি প্রধান উন্নতিশীল রাজ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বরোদাতে মহীশূর ও হায়দ্রাবাদের মত বিশ্ববিদ্যালয় না থাকিলেও জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারে এই রাজ্য অগ্রগণ্য। বস্তুতঃ, শিক্ষা যে সকল উন্নতির মূল ইহা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়া গাইকোয়ার বাহাদুর তাঁহার প্রজাদিগের শিক্ষার জন্য যে-সব অভিনব ও সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা সমগ্র ভারতের আদর্শস্থল। তাঁহার অনুসৃত নীতির ফলে বরোদা হইতে নিরক্ষরতা ক্রমশঃ দূরীভূত হইতেছে এবং শিক্ষার দ্রুত প্রচার হইতেছে। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে (১৮৯৩ খৃঃ) তিনি নিজ রাজ্যের একটি জিলাতে আবশ্যক শিক্ষার (Compulsory education) প্রবর্ত্তন করেন এবং পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে (১৯০৭ খৃঃ) বরোদার সর্ব্বত্র ইহা প্রবর্ত্তিত হয়। শিক্ষাবিস্তার ব্যাপারে বরোদার আর এক বিশেষত্ব উহার গ্রন্থাগার বিভাগ ও তাহার অধীন গ্রন্থাগার সমূহ। এই দুই বিষয়েই গাইকোয়ার বাহাদুর সমগ্র ভারতের পথ-প্রদর্শক।

শিক্ষা-প্রচারে গ্রন্থাগারের স্থান যে অতি উচ্চে সে বিষয়ে বেশী লেখা বাহুল্য। বর্ত্তমান জগতে গ্রন্থাগার কেবল সমাজের মুষ্টিমেয় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির অবসরক্ষেপণ ও চিত্তবিনোদনের স্থান নহে; ইহা জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের একটি প্রধান কেন্দ্র। জনসাধারণের উদ্দেশ্যে স্থাপিত ভাল লাইব্রেরীকে আমরা বৃহত্তর বিশ্ববিদ্যালয় বলিতে পারি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ হইলে আমাদের জ্ঞান পূর্ণতর করিতে হইলে ভাল লাইব্রেরীর সাহায্য না নিলে চলে না। আবার যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুযোগ পান নাই বা ঐ শিক্ষায় বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই তাঁহারাও লাইব্রেরীর গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া প্রচুর জ্ঞানলাভ ও মানসিক উন্নতি বিধান করিতে পারেন। এস্থানে ধনী দরিদ্র, উচ্চশিক্ষিত অল্পশিক্ষিত, ডিগ্রিধারী ও ডিগ্রিহীন সকলেরই সমান অধিকার। পাব্‌লিক লাইব্রেরী সকলের সম্মুখে নির্ব্বিচারে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া ধরে। বিখ্যাত পাশ্চাত্য মনীষী গিবন্, জনসন্ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ না করিয়াও

গ্রন্থালয়ের সাহায্যে জ্ঞানলাভ করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। স্কুল কলেজের শিক্ষায় বহুদূর অগ্রসর না হইয়াও গ্রন্থালয়ের সাহায্যে জ্ঞানলাভ করিয়া দেশে গণ্য-মান্য হইয়াছেন, এরূপ লোকের দৃষ্টান্ত আমাদের দেশেও একেবারে বিরল নহে। সুতরাং লাইব্রেরী স্থাপন লোকশিক্ষার ও জ্ঞান বিবর্দ্ধনের প্রকৃষ্ট উপায়। গাইকোয়ার বাহাদুর বাইশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার প্রজাদের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া অপূর্ব্ব দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের নৃপতিবর্গ নিজ নিজ রাজ্যে লাইব্রেরী স্থাপন করিতেছেন; ব্রিটিশ ভারতেও স্থানে স্থানে লাইব্রেরী গড়িয়া উঠিতেছে এবং লাইব্রেরী আন্দোলন ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গাইকোয়ার বাহাদুর ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে স্বীয় রাজ্যে আবশ্যক শিক্ষার প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার সংকল্প ছিল যে এই উপায়ে প্রজাদের অজ্ঞতা দূর করিবেন; কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গেল যে কেবল প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করিলেই নিরক্ষরতা দূর ও শিক্ষার প্রচার হইবে না। স্কুল ছাড়িবার পরও বিদ্যার্থীদের লেখাপড়া করিবার সুবিধা থাকা দরকার; নতুবা তাহারা অধীত বিষয় ভুলিয়া যায়, তাহাদের জ্ঞান প্রসার লাভ করিতে পারে না। এইরূপে শিক্ষার উদ্দেশ্য যাহাতে ব্যর্থ না হইয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যে গাইকোয়ার বাহাদুর রাজ্যের সর্ব্বত্র লাইব্রেরী স্থাপনের সংকল্প করেন।

১৯১০ খৃঃ বরোদারাজ আমেরিকায় ভ্রমণ করিতে যান। লাইব্রেরী স্থাপনে ও লাইব্রেরী পরিচালনায় আমেরিকা সমস্ত জগতের শীর্ষস্থানীয়। তথাকার লাইব্রেরী সমূহের ব্যবস্থা দেখিয়া এবং তাহাদের অপূর্ব্ব কার্য্যকারিতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সংকল্প দৃঢ় হয়। ঐ বৎসরই তিনি লাইব্রেরী পরিচালনায় অভিজ্ঞ মিঃ বর্ডেন নামক জনৈক আমেরিকাবাসীকে তাঁহার রাজ্যের লাইব্রেরী বিভাগের ডিরেক্টার পদে নিযুক্ত করেন। বরোদারাজ্যে ১৮৬৫ খৃঃ প্রথম পাব্‌লিক লাইব্রেরী স্থাপিত হয়, ১৮৭৭ খৃঃ প্রথম সরকারী লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৯১০ সন হইতেই ব্যাপকভাবে লাইব্রেরী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

মিঃ বর্ডেন তিন বৎসর বরোদাতে থাকিয়া লাইব্রেরী বিভাগ স্থাপন ও লাইব্রেরী পরিচালনার সুব্যবস্থা করেন। তাহার পর মিঃ জে, এস্ কুডালকর (J. S, Kudalkar M. A. LL. B) মহাশয় লাইব্রেরী বিভাগের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করেন, এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার লাইব্রেরী ব্যবস্থা পরিদর্শন করিতে যান। দুঃখের বিষয় ১৯২১ সনে তাঁহার অকালমৃত্যু ঘটে।

তাঁহার মৃত্যুর পর বর্ত্তমান অধ্যক্ষ (Curator) মিঃ নিউটন মোহন দত্ত F. L. A. কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ইনি লাইব্রেরী পরিচালনায় বিশেষ পারদর্শী।

বরোদা রাজসরকারের গ্রন্থাগার বিভাগ (Library Department) নামে একটী বিশেষ বিভাগ আছে। ইহা Commissioner of Education (বিদ্যাধিকারী)-এর অধীনে বরোদা সরকারের ব্যয়ে পরিচালিত হয়। এই বিভাগে স্ত্রী পুরুষ, উচ্চনীচ, সাক্ষর নিরক্ষর, বয়স্ক ও শিশু প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর লোকের বিনা পয়সায় শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এইরূপ ব্যাপকভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের দেশে খুব অল্প স্থানেই আছে।

বরোদা রাজ্যের বর্ত্তমান লোকসংখ্যা (১৯৩১ সনের সেন্সস্ অনুসারে) ২.৪৪৩,০০৭। লোকসংখ্যা হিসাবে বরোদারাজ্য বাংলাদেশের ফরিদপুর জিলার প্রায় অনুরূপ। ফরিদপুর জিলার বর্ত্তমান লোকসংখ্যা ২,৩৫৫,৯৪৩ জন কিন্তু বরোদা-রাজ্যে ৭৭৫টি সরকারী ও সরকারী সাহায্যে পরিচালিত লাইব্রেরী আছে। সম্প্রতি বরোদা সরকার হইতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে-প্রতিবৎসর ১০০ গ্রাম্য লাইব্রেরী স্থাপন করিতে হইবে।

বরোদা সহরে সরকারের ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (Central Library) ও সংস্কৃত লাইব্রেরী (Oriental Institute) আছে। এতদ্ব্যতীত সরকারী সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত ও লাইব্রেরী বিভাগের অধীনে পরিচালিত সমগ্র বরোদাতে ৭৭৩টি গ্রন্থালয় আছে। বরোদা রাজ্যের ৪৫টি সহরের প্রত্যেক সহরেই একটি করিয়া এবং ৭২৮টি গ্রামে গ্রন্থাগার আছে। উক্ত লাইব্রেরী সমূহের পাঠাগার (Reading Room) ব্যতীত আরও প্রায় ২০০টি পৃথক পাঠাগার আছে। বে-সরকারী লাইব্রেরীও কোন কোন স্থানে আছে।

বরোদা লাইব্রেরী বিভাগের কার্য্য মোটামুটি এই কয়েকটি শাখায় বিভক্ত করা যাইতে পারে :—(১) বরোদা সহরের লাইব্রেরী :—(ক) সেন্ট্রাল লাইব্রেরী ও তাহার অন্তর্ভুক্ত শিশুবিভাগ (খ) মহিলা লাইব্রেরী (গ) সংস্কৃত লাইব্রেরী।

(২) মফঃস্বল বিভাগ :—ইহার অধীন অন্যান্য সহর ও গ্রামের লাইব্রেরী।

(৩) ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরী (Travelling Library)

(৪) চিত্রের সাহায্যে শিক্ষাবিভাগ (Visual Instruction Branch).

(১) বরোদা সহরের লাইব্রেরী

সেন্ট্রাল লাইব্রেরী বরোদা সহরের ও বরোদা রাজ্যের প্রধান লাইব্রেরী। ইহা ইং ১৯১০ সনে স্থাপিত হয়। গাইকোয়ার বাহাদুর প্রদত্ত তাঁহার নিজের

লাইব্রেরীর ২০,০০০ পুস্তক লইয়া এই লাইব্রেরীর কাজ আরম্ভ হয়। এই লাইব্রেরীর পুস্তক সংখ্যা বর্ত্তমানে একলক্ষ বিশ হাজারের উপর। এবং এই লাইব্রেরী হইতে ১৯৩০ সনে একলক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজারের উপর বহি বিলি করা হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের লাইব্রেরী বই সমূহের মধ্যে এই লাইব্রেরীর বই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক পাঠক পড়িয়া থাকে। লাইব্রেরীতে ইংরাজী, গুজরাটী, মারাঠী, হিন্দী ও উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষার পুস্তক রাখা হয়। গুজরাটী ভাষার পুস্তকের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ; কারণ বরোদার অধিবাসীদের শতকরা ৮৮ জনের মাতৃভাষা গুজরাটী এবং গুজরাটীতে প্রকাশিত সমস্ত বই এই লাইব্রেরীতে রাখিবার নিয়ম আছে।

সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীর সাধারণ বিভাগের দুইটি শাখা আছে ঃ—(১) লেনদেন বিভাগ (Lending Section), (২) পরামর্শ বিভাগ (Reference Section)।

লেনদেন বিভাগ (Lending Section) ঃ—এই বিভাগ রবিবার, সরকারী ছুটীর দিন ও বুধবার সকাল ব্যতীত প্রত্যহ সকাল বিকাল খোলা থাকে। বরোদা সহরের অধিবাসীই এই লাইব্রেরীর গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। গ্রাহকদের কোনরূপ চাঁদা দিতে হয় না। বরোদার সরকারী কর্ম্মচারী পেন্সনভোগী ও দুই বৎসরের পুরাতন ব্যবহারজীবী প্রভৃতি কয়েকশ্রেণীর গ্রাহকের কোনরূপ টাকা জমা (deposit) দিতে হয়না। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য গ্রাহকেরা উপরি-উক্ত-শ্রেণীর কাহাকেও জামিন রাখিয়া কিম্বা ১৫৲ টাকা জমা দিয়া বই পড়িতে পারেন। গ্রাহকশ্রেণী হইতে নাম তুলিয়া নিলে ঐ টাকা ফেরত দেওয়া হয়। সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীতে “Open Access System” প্রচলিত আছে। এই ব্যবস্থা অনুসারে গ্রাহকগণ নিজের ইচ্ছামত শেল্‌ফ্‌ হইতে দেখিয়া শুনিয়া পুস্তক বাছাই করিয়া নিতে পারেন। ইচ্ছামত দেখিয়া পছন্দ করিবার সুবিধা থাকিলে পাঠকের অনুসন্ধিৎসা ও পাঠেচ্ছা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে ক্রমশঃ এই ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সুশৃঙ্খলার সহিত পুস্তকের শ্রেণীবিভাগ গ্রন্থাগারিকের একটি প্রধান কর্ত্তব্য। আমাদের দেশের সাধারণ গ্রন্থালয়ে সচরাচর পুস্তকবিভাগ সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়না। অনেক লাইব্রেরীতেই পুস্তকের মোটামুটি অল্প কয়েকটী বিভাগ থাকে ; এবং লাইব্রেরী কর্ত্তৃপক্ষ পুস্তক সংগ্রহ করা হইলে উপরি-উক্ত কয়েকটি বিভাগ অনুসারে পুস্তকের ক্রমিক নম্বর দিয়া থাকেন। কিন্তু এই প্রথা বিজ্ঞান-সম্মত নহে। প্রথমতঃ বিষয় বিভাগ ও তৎপরে শ্রেণীবিভাগ করিয়া পুস্তকের

নম্বর দেওয়া দরকার। আমেরিকার প্রসিদ্ধ লাইব্রেরী ব্যবস্থাপক Dr. Melvil Dewey প্রবর্ত্তিত জগদ্বিখ্যাত দশমিক শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতি (Decimal Classification Scheme) অনুসারে সুশৃঙ্খলার সহিত পুস্তক বিভাগ করা যাইতে পারে। (সম্প্রতি ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে ; ইঁহার মৃত্যুতে গ্রন্থালয়-জগৎ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে)। মিঃ বর্ডেন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত এক অভিনব পদ্ধতি অনুসারে বরোদার সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী পুস্তকের শ্রেণীবিভাগ করা হইয়া থাকে। কাটারের (Cutter) "Expansive" ও ডিউই-র "Decimal classification"—এই দুই ব্যবস্থার সংমিশ্রণে এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থা অনুসারে পুস্তক সমূহের মোটামুটি ২৬টি বিভাগ করা হইয়াছে। এক একটি বিভাগ এক একটি ইংরাজী বর্ণমালা দ্বারা সূচিত হয়, এবং প্রত্যেক বিভাগের উপরিভাগ আছে।

পরামর্শ বিভাগ—(Reference Section)

এই বিভাগটিও বরোদা সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীর একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। এই বিভাগের পাঠাগারে বসিয়া যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছামত লাইব্রেরীর যে কোন বই পড়িতে পারেন। এই বিভাগে নানারূপ প্রয়োজনীয় সাময়িক পত্রিকা ও reference বহি রাখা হয়। এই বিভাগটি সাংবাদিক ও গবেষণাকারীদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। পাঠকদিগের সুবিধার জন্য পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদির নির্ঘণ্ট (index) পূর্ণ বহি রাখা হয়। ইহা ব্যতীত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান (library science), প্রমাণপঞ্জী (bibliography) পুস্তক-বিভাগ ও তালিকা প্রস্তুত (classification and cataloguing) সম্বন্ধে বহু মূল্যবান পুস্তকে এই বিভাগ পূর্ণ।

ইহা ব্যতীত, এই বিভাগ হইতে নানারূপ প্রয়োজনীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়া থাকে। এই বিভাগের কার্য্য কেবল বরোদারাজ্যে নিবদ্ধ নহে। ভারতের নানাস্থান হইতে. এমন কি ইয়োরোপ ও আমেরিকার কোন স্থানের অনুসন্ধিৎসুগণ ডাকযোগে এই স্থান হইতে নানারূপ তথ্য সংগ্রহ করেন।

লাইব্রেরী মিউজিয়ম:—কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের (Central Library) অন্তর্ভুক্ত একটি লাইব্রেরী মিউজিয়ম আছে। ইহাতে কতগুলি কৌতুহলোদ্দীপক প্রাচীন পুস্তক সংগ্রহ জগতের বিখ্যাত লাইব্রেরী সমূহের ফটো, গুজরাটী কবিদের প্রতিকৃতি প্রভৃতি রাখা হইয়াছে।

শিশুবিভাগ :—সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীর অন্তর্ভুক্ত এই বিভাগটি বরোদার বিশেষত্ব। এই বিভাগ ইং ১৯১৩ সনে স্থাপিত হয় এবং একজন মারাঠী মহিলার তত্ত্বাবধানে ইহা পরিচালিত। লাইব্রেরীর সাধারণ বিভাগে অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের উপযোগী ৩০০০ পুস্তক আছে। ইহা ব্যতীত কেবল খুব অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদের পড়িবার ও খেলিবার জন্য একটি পৃথক ঘর আছে। এইস্থানে শিশুদের উপযোগী বই রাখা হয় এবং নানাবিধ ক্রীড়াকৌতুক ও চিত্রের সাহায্যে তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এই ঘরটি বেশ প্রশস্ত এবং ইহাতে আলো ও বাতাস যাইবার সুব্যবস্থা আছে ; ইহার দেওয়াল নানারূপ সুন্দর চিত্রে পূর্ণ। এইখানে শিশুদের চিত্তাকর্ষক নানারূপ খেলিবার সরঞ্জাম (indoor games) আছে। লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ মাঝে মাঝে স্কুলের ছেলেদের এখানে আহ্বান করিয়া আনেন এবং নানারূপ শিক্ষাপ্রদ গল্প শুনাইবার ও বায়স্কোপের ছবি দেখাইবার ব্যবস্থা করেন। এই বিভাগে প্রত্যহ গড়ে প্রায় ৭০ জন শিশু যোগদান করিয়া থাকে।

মহিলা লাইব্রেরী :—

মহিলাদের জন্য একটি পৃথক্ লাইব্রেরী আছে। একটি গুজরাটী মহিলার হস্তে ইহার পরিচালনার ভার ন্যস্ত আছে। ইহা ব্যতীত মহিলাগণ সাধারণ লাইব্রেরীর পুস্তকও পড়িতে পারেন।

এই গ্রন্থালয়ের লাইব্রেরীয়ান মাঝে মাঝে মহিলাদের ক্লাবে গমন করিয়া পাঠের জন্য পুস্তকাদি বিলি করিয়া থাকেন।

পাঠাগার (Reading Room)—

সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীর অন্তর্ভুক্ত একটি পাঠাগার আছে। এই স্থানে প্রায় শতাবধি সংবাদপত্র ও অন্যান্য সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়। ইহা বৎসরের প্রত্যেক দিন ১২ ঘণ্টা করিয়া খোলা থাকে।

সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীর নিজস্ব পুস্তক বাঁধাই বিভাগ আছে।

সংস্কৃত লাইব্রেরী (Oriental Institute) :—

বরোদা সহরের আর একটি দর্শনীয় স্থান ও গৌরবের বিষয় ইহার সংস্কৃত লাইব্রেরী (Oriental Institute)। ইহা ভারতবর্ষের একটী শ্রেষ্ঠ পুঁথি সংগ্রহালয়। প্রথমত; ইহা সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীর অন্তর্ভুক্ত সংস্কৃত বিভাগ নামে পরিচিত ছিল। ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন কাল হইতেই জ্ঞানানুশীলনের জন্য

প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিয়াছে। ভারতের নানাস্থানে দর্শন ও জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনাপূর্ণ অনেক প্রাচীন পুঁথি বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই সব অমূল্য পুঁথি সংগ্রহ করিয়া রক্ষা করিবার ও গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত গাইকোয়ার বাহাদুর এই বিভাগের সৃষ্টি করেন এবং ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে প্রাচ্য জ্ঞানবিজ্ঞান গ্রন্থমালার (Gaekwar Oriental Series) সৃষ্টি হয়। এই বিভাগের জন্য অনেক সংস্কৃত গ্রন্থও সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই বিভাগ হইতে প্রধানতঃ সংস্কৃত ভাষা বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেও অন্যান্য ভাষার মূল্যবান প্রাচীন গ্রন্থ ছাপিবারও ব্যবস্থা করা হয়। প্রাচীন গ্রন্থ ও পুঁথি সংগ্রহ করিবার জন্য বরোদার রাজসরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। বরোদাসরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া পণ্ডিত অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী সাত বৎসর ভারতের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া ১০,০০০ পুঁথি সংগ্রহ করেন। এই গ্রন্থশালার দ্রুত বিস্তার লক্ষ্য করিয়া এবং ইহার কার্য্যের সুবিধার জন্য ১৯২৭ সনে এই সংস্কৃত লাইব্রেরীটি সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী হইতে পৃথক করিয়া ওরিয়েণ্টাল ইন্‌ষ্টিটিউট নামক একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়। এই স্থানে এখন ২১,০০০ পুঁথিও মুদ্রিত পুস্তক আছে। সংগৃহীত পুঁথিসমূহের তালিকাও ক্রমশঃ প্রস্তুত হইতেছে। Gaekwar's Oriental Series-এ এই পর্য্যন্ত ৪৩ খানা গ্রন্থ প্রকাশিত করা হইয়াছে; এবং আরও অনেক গ্রন্থ মুদ্রিত করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই গ্রন্থাবলী ভারতে ও ভারতের বাহিরে আদৃত হইয়াছে। এই বিভাগটি একজন অধ্যক্ষের (Director) অধীনে পরিচালিত হয় এবং গ্রন্থসমূহ তাঁহার তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়। ডাঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য পি, এইচ, ডি, বর্ত্তমানে ইহার অধ্যক্ষ।

২। **মফঃস্বল বিভাগ ঃ—**

বরোদা সহরের গ্রন্থালয় সমূহ ব্যতীত অন্যান্য সহরের ও গ্রামের লাইব্রেরী এই বিভাগের অধীন। বরোদাসরকারের আর্থিক আনুকূল্যেই এই বিভাগের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়াছে এবং ইহার অধীন লাইব্রেরীসমূহ বরোদাসরকারের সাহায্যে পরিচালিত। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে এই বিভাগ স্থাপিত হয় এবং লাইব্রেরী বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ (Assistant Curator) মহাশয় এই বিভাগের কার্য্য পরিচালনা করেন। সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীর পুস্তক ব্যবহার করিবার সুযোগ সাধারণতঃ বরোদা সহরের অধিবাসীরাই পাইয়া থাকেন। কিন্তু সমগ্র বরোদারাজ্যের লোকসংখ্যার শতকরা ৮০জন গ্রামে বাস করিয়া থাকে; সুতরাং লাইব্রেরীর সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানপ্রচার করিতে হইলে মফঃস্বলের সহরে সহরে এবং গ্রামে

গ্রামে লাইব্রেরী স্থাপন করা কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্যে বরোদার সর্ব্বত্র সরকারী সাহায্যে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমস্ত লাইব্রেরী হইতে বই পড়িতে কোনরূপ চাঁদা দিতে হয় না।

মফঃস্বলের লাইব্রেরী তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে;—যথা, (১) জিলার প্রধান সহরের লাইব্রেরী (২) অন্যান্য সহরের লাইব্রেরী (৩) গ্রাম্য লাইব্রেরী। এই সমস্ত লাইব্রেরী পরিচালনার ব্যবস্থা বিচিত্র। উক্ত লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষগণকে কেবল বাৎসরিক খরচের এক তৃতীয়াংশ অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়; বাকী দুই তৃতীয়াংশ অর্থ বরোদাসরকার ও জিলাবোর্ড সমপরিমাণে দিয়া থাকেন। উপরি-উক্ত তিন শ্রেণীর লাইব্রেরী বৎসরে শ্রেণীবিভাগ অনুসারে যথাক্রমে ৭০০, ৩০০ ও ১০০ টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলেই বরোদাসরকারের লাইব্রেরী বিভাগ ও জিলাবোর্ড, প্রত্যেকে উক্ত লাইব্রেরী সমূহে সমপরিমাণ অর্থ সাহায্য করিয়া থাকে। মিউনিসিপ্যালিটি সমূহও সময়ে সময়ে লাইব্রেরীতে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকে। গ্রামে কোন নূতন লাইব্রেরী স্থাপন করিবার সময় লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষ লাইব্রেরী বিভাগের হস্তে ২৫৲ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিলে উক্ত বিভাগ হইতে ১০০৲ মূল্যের গুজরাটী পুস্তক পাইতে পারেন। কোন গ্রামে লাইব্রেরী স্থাপনের উপযোগী অর্থ সংগ্রহ না হইলে একটি পাঠ-গৃহ (Reading room) স্থাপিত হইয়া থাকে; এই জন্য বরোদাসরকার ও জিলা বোর্ড সাহায্য করিয়া থাকে।

কোন স্থানের অধিবাসীগণ লাইব্রেরী গৃহ নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাদিগকে কেবল ব্যয়ের এক তৃতীয়াংশ অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়। বাকী দুই তৃতীয়াংশ অর্থ বরোদা সরকার ও জিলা বোর্ড দিয়া থাকে। এইরূপ অর্থ সাহায্যের ফলে বরোদারাজ্যের প্রায় একশতটি লাইব্রেরীর নিজস্ব সুদৃশ্য গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। লাইব্রেরী গৃহগুলি অনেক স্থানেই দ্বিতল অট্টালিকা।

এই সব লাইব্রেরী পরিচালনার নিমিত্ত লাইব্রেরী বিভাগ কতকগুলি নিয়ম গঠন করিয়াছেন। সেই নিয়মানুসারে স্থানীয় লোকদের একটি কমিটি লাইব্রেরীর কার্য্য পরিচালনা করে। গ্রাম্য লাইব্রেরীর জন্য কোন বেতনভুক্ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হয় না; সাধারণতঃ স্কুলের শিক্ষক ও অন্যান্য উৎসাহী লোক এই লাইব্রেরীর ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। লাইব্রেরী বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ মহাশয় মাঝে মাঝে মফঃস্বলের লাইব্রেরীর পরিচালকদের একত্র আহ্বান করিয়া লাইব্রেরীর অভাব অভিযোগ ও সুপরিচালনা সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করিয়া থাকেন।

লাইব্রেরী আন্দোলন বিস্তারের জন্য বরোদার তালুক সমূহে লাইব্রেরী সমিতি

(Library Association) গঠিত হইয়াছে। সমগ্র বরোদা রাজ্য ব্যাপিয়া বরোদা লাইব্রেরী সমিতি গঠিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত লাইব্রেরীয়ান ও লাইব্রেরী কর্ম্মীদের লইয়া একটি লাইব্রেরী কো-অপারেটিভ সোসাইটী (পুস্তকালয় সহায়ক সহকারী মণ্ডল) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমিতি ইহার অন্তর্ভুক্ত লাইব্রেরী সমূহের জন্য পুস্তক, সাময়িক পত্রিকা, আসবাব ইত্যাদি ক্রয় করিয়া থাকে। এই সমিতি হইতে বরোদা লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র গুজরাটী পত্রিকা "পুস্তকালয়" প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই সমিতি হইতে গুজরাটী ভাষায় নানারকম পুস্তকও প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৩। ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরী (Travelling Library)

বরোদার রাজসরকার প্রজাদের ভিতর শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে ও লাইব্রেরী আন্দোলনের বহুল প্রচারের জন্য যে সব অভিনব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরী তাহাদের অন্যতম। আমেরিকার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া গাইকোয়ার বাহাদুর ১৯১১ খৃষ্টাব্দে নিজ রাজ্যে এই ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করেন। যে সব গ্রামে লাইব্রেরী নাই সেই সব স্থানের অধিবাসীদের মধ্যে জ্ঞানপ্রচারই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

কতগুলি মজবুত ছোট কাঠের বাক্সে কতগুলি বই বোঝাই করিয়া জনসাধারণের পাঠের জন্য গ্রামে গ্রামে পাঠান হইয়া থাকে। কোন গ্রামের লোকদের এক বাক্স বই পড়া হইলে আর এক বাক্স নূতন বই পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ইহাই ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরী নামে পরিচিত।

বই রাখিবার বাক্সগুলি আকারের তারতম্য অনুসারে তিন ভাগে বিভক্ত। আকার অনুসারে ঐ বাক্সগুলিতে ১৫, ২০ বা ৩০ খানি বই রাখা যাইতে পারে। এই বাক্সগুলিতে বইর সঙ্গে সঙ্গে ১ খানা গ্রাহক বহি, ১ খানা suggestion বহি ও কতগুলি বিজ্ঞাপন থাকে। এই বাক্সগুলি সাধারণতঃ রেলে ও চাবি ডাকে পাঠান হইয়া থাকে। বরোদা লাইব্রেরী বিভাগে এইরূপ সাড়ে চারিশত বাক্স আছে এবং এই বিভাগে প্রায় বিশহাজার বই আছে। ঐ সব বাক্সে দুই রকমে বই সাজান হইয়া থাকে। কতগুলি বাক্সে কেবল কোন এক বিষয়ের পুস্তক থাকে। কোন বাক্সে হয়ত কেবল জীবনী, অথবা কোন বাক্সে হয়ত কেবল ইতিহাসের বই রাখা হয়। আবার কোন বাক্সে কেবল মহিলাদের বা শিশুদের উপযোগী বই রাখা হয়। এই সব বই বরাবর নির্দ্দিষ্ট এক বাক্সে রাখা হয়। এইগুলি "fixed sets" নামে পরিচিত। দ্বিতীয় ব্যবস্থায় সাজান বই-

গুলিকে "elastic sets" বলা হয়। ইহার এক এক প্রস্থে নানা বিষয়ের বই থাকে এবং বইগুলি গ্রাম হইতে ফেরত আসিলে পুনরায় আলমারিতে তুলিয়া রাখা হয়। এই সব বাক্সে সময় সময় ঘরে বসিয়া খেলিবার সরঞ্জাম ও শিক্ষাপ্রদ ছবি গ্রামে গ্রামে পাঠান হইয়া থাকে। এই সব বাক্স ব্যবহার করিতে কোনরূপ চাঁদা দিতে হয় না। বাক্সগুলি গ্রামে পাঠাইবার ও পুনরায় গ্রাম হইতে সদরে ফেরত পাঠাইবার রেলমাশুল পর্য্যন্ত লাইব্রেরী বিভাগ বহন করিয়া থাকে।

এই বিভাগের জন্য বরোদা সরকার বৎসরে প্রায় ৩০০০্ ব্যয় করিয়া থাকে।

এই বিভাগের জন্য একজন স্বতন্ত্র সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ও কয়েকজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছে। সাধারণতঃ কোন স্থানীয় শিক্ষক অথবা এই কার্য্যে উৎসাহী অন্য কোন লোক এই সব লাইব্রেরীর ভার গ্রহণ করেন এবং লাইব্রেরী বিভাগের নিয়মানুসারে উহার কার্য্য পরিচালনা করেন। এক এক স্থানে এক একটি বাক্স তিনমাস অথবা প্রয়োজন হইলে তদপেক্ষা বেশী সময় রাখা যাইতে পারে।

৪। চিত্রের সাহায্যে শিক্ষা বিভাগ
(Visual Institution Branch)

গাইকোয়ার বাহাদুর কেবল সাক্ষর নরনারীর শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। বরোদায় শিক্ষার দ্রুত প্রসার হইলেও অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর ও জ্ঞানহীন। বরোদাসরকার তাহাদের শিক্ষার জন্য চিত্রের সাহায্যে নানারূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। দেশের অবস্থা, স্বাস্থ্য. কৃষি, শিল্প, প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাপ্রদ চিত্র দেখাইয়া তাহা সরল ভাষায় বুঝাইয়া দিলে অশিক্ষিত ও নিরক্ষর জনসাধারণও তাহা হইতে জ্ঞান লাভ করিতে পারে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে এই বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিভাগ বরোদারাজ্যের সর্ব্বত্র বিনামূল্যে নানারূপ ছবি দেখাইয়া থাকে এবং অগণিত স্ত্রীপুরুষ এই সব ছবি দেখিয়া শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করিয়া থাকে।

এই বিভাগে কতকগুলি বায়স্কোপের ছবি দেখাইবার যন্ত্র ও Radioptican (ইহার সাহায্যে পোষ্টকার্ডের আকারের ছবি বৃহদাকারে পর্দ্দার উপর দেখান হয়) আছে। Magic lantern ও Stereograph-এর সাহায্যে ছবি দেখাইবারও ব্যবস্থা আছে। এই বিভাগ ব্রিটিশ ভারতে ও দেশীয় রাজ্যসমূহে ছবি দেখাইবার জন্য মাঝে মাঝে নিমন্ত্রিত হইয়া থাকে। এই বিভাগের জন্য বরোদা সরকারের ন্যূনাধিক ৫০০০্ ব্যয় হইয়া থাকে।

বরোদার লাইব্রেরী বিভাগের ইহাই মোটামুটি বিবরণ। শেষে, বরোদায়

লাইব্রেরীয়ানদের শিক্ষার কি ব্যবস্থা আছে এবং বরোদা সরকার ভারতের অন্যত্র লাইব্রেরী আন্দোলন বিস্তারে কিরূপ সাহায্য করিয়া থাকেন তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

আমাদের দেশের লোকেরা সাধারণতঃ মনে করেন যে, লাইব্রেরীয়ানের কার্য্য করিতে কোনরূপ বিশেষ শিক্ষা বা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নাই; লাইব্রেরীয়ানের কার্য্য কেবল পুস্তক সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং যে কোন সাধারণ শিক্ষা প্রাপ্ত লোকই এই কাজ করিতে পারেন।

কিন্তু এই ধারণা অমূলক। লাইব্রেরীয়ানের কর্ত্তব্য অতি দায়িত্বপূর্ণ এবং তিনি একজন উচ্চ শ্রেণীর লোক-শিক্ষক।

কিন্তু পূর্ব্বে এদেশে লাইব্রেরীয়ানদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। এ অসুবিধা দূরীকরণের জন্য এবং লাইব্রেরী বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য বর্ডেন সাহেব বরোদাতে একটি লাইব্রেরী ক্লাস খুলিয়াছিলেন এবং দেশীয় লাইব্রেরীয়ানদিগকে ঐ ক্লাসে যোগ দিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় খুব কম লোকই তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়াছিল। বর্ত্তমান অধ্যক্ষও লাইব্রেরী পরিচালনা সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া থাকেন এবং ভারতের নানা স্থান হইতে লাইব্রেরীয়ানগণ তথায় শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন।

বরোদার লাইব্রেরী বিভাগ বরোদার বাহিরে ভারতের অন্যত্রও লাইব্রেরী আন্দোলন বিস্তারে সাহায্য করিয়া থাকে। কোন লাইব্রেরী কনফারেন্স ও লাইব্রেরী প্রদর্শনীতে যোগ দিবার আহ্বান আসিলে কিউরেটার মহোদয় ও তাঁহার কর্ম্মচারীগণ সানন্দে সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। এইরূপে তাঁহারা ভারতের নানা-স্থানে গমন করিয়াছেন। ১৯২৮ সনে কলিকাতাতে যে নিখিল ভারত লাইব্রেরী সম্মিলন সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরী প্রদর্শনী হইয়াছিল তাহাতে বরোদা বিভাগ সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। গত বৎসর কলিকাতাতে বঙ্গদেশীয় লাইব্রেরী সমূহের কন্‌ফারেন্স বসিয়াছিল। বরোদার কিউরেটার মহোদয় সেই কন্‌ফারেন্সে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন এবং এক্‌জিবিশনে প্রদর্শনের জন্য অনেক পুস্তক, ছবি, চার্ট প্রভৃতি নিয়া আসিয়াছিলেন এবং স্বয়ং যত্নসহকারে সেই সব বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার ঃ প্রাক্-পর্ব

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়

১৮৯০ সালের ২৬শে মে (১২৯৭ জ্যৈষ্ঠ ১১) রবীন্দ্রনাথ এসেছেন শান্তিনিকেতনে—এই তাঁর প্রথম গ্রীষ্মকালীন শান্তিনিকেতনের সঙ্গে পরিচয়। বোলপুরের কালবৈশাখী ঝড়ের রুদ্রখেলা এই প্রথম দেখছেন। উদীয়মান তরুণ লেখক প্রমথ চৌধুরীকে লিখছেন, "এখানে আজকাল খুব ঝড়বৃষ্টি বাদলের প্রাদুর্ভাব হয়েছে···সমস্ত আকাশময় মেঘ করে, অর্থাৎ সমস্ত আকাশটা দেখ্‌তে পাওয়া যায়,···মাঠের মাঝখানে আমাদের বাড়ী—সুতরাং চতুর্দ্দিকের ঝড় এরি উপরে এসে পড়ে ঘুরপাক খেতে থাকে··বহুকাল এ রকম রীতিমত ঝড় দেখিনি। এখানকার লাইব্রেরিতে একখানা মেঘদূত আছে, ঝড়বৃষ্টি দুর্য্যোগে রুদ্ধদ্বার গৃহপ্রান্তে তাকিয়া আশ্রয় করে দীর্ঘ অপরাহ্নে সেইটি সুর করে পড়া গেছে—কেবল পড়া নয়—সেটার উপরে ইনিয়ে বিনিয়ে বর্ষার উপযোগী একটা কবিতা লিখেও ফেলেছি।"

"আজি অন্ধকার দিবা, বৃষ্টি ঝর ঝর,
দুরন্ত পবন অতি, আক্রমণে তার
অরণ্য উদ্যতবাহু করে হাহাকার।
বিদ্যুৎ দিতেছে উঁকি ছিঁড়ি মেঘভার
খরতর বক্র হাসি শূন্যে বরষি।
অন্ধকার রুদ্ধ গৃহে একেলা বসিয়া
পড়িতেছি মেঘদূত ; "

এখন প্রশ্ন—কবির উল্লিখিত সে গ্রন্থাগার কোথায় ছিল ?

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে শান্তিনিকেতনে গৃহ নির্মাণ করে একটি আশ্রম স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। এই বাটিতে ব্রাহ্মধর্ম চর্যার নিমিত্ত বোলপুরের কয়েকটি ভদ্র ভক্ত সমবেত হতেন। মাঝের ঘরটিতে তাঁরা ধর্মালোচনা করতেন। সেই সময় সেখানে একটি গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। গ্রন্থাগারটি এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নাল, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে পূর্ণ ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ম্যাক্সমূলার সম্পাদিত ঋক্‌বেদ গ্রন্থাদিও ছিল। এশিয়াটিক সোসাইটি

জার্নাল ছাড়া ঐ পর্ষদ থেকে প্রকাশিত Bibliotheek India গ্রন্থমালার বহু গ্রন্থ ছিল। কালিদাসের গ্রন্থাবলীও যে ছিল তাতো পূর্বেই বলেছি।

এসব হচ্ছে প্রাক্ ব্রহ্মচর্যাশ্রম পর্বের কথা। আশ্রম বিদ্যালয় স্থাপিত হবার কয়েক বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯০৫ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ঠাকুর পরিবারের অনেক পরিবর্তন হয়। তার মধ্যে বিশেষভাবে দুটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য —একটি হচ্ছে দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর বা দ্বিপুবাবু মহর্ষির পৌত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র যিনি ছিলেন আশ্রমের অন্যতম ট্রাষ্টি, তিনি শান্তিনিকেতন গৃহের একতলায় বাস করতে এলেন। থাকতেন পূবের ঘরে। মাঝের ঘরে থাকতো তার জিনিষপত্র, মোসাহেব চাকর-বাকররা ; আর পশ্চিমের ঘর ছিল অতিথিদের জন্য। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতার মৃত্যুর পর শান্তিনিকেতনে আসা ঠিক করলেন, নিচু বাংলোয় থাকা স্থির। কিন্তু সে বাড়ি বরাদ্দ ছিল না বলে কিছুকাল রায়পুরে শ্রীকণ্ঠ সিংহের অতিথি রূপে বাস করেন। বোধহয় ১৯০৬ সালে তিনি নিচু বাংলোয় স্থায়ীরূপে বাস করতে আসেন।

তখন রবীন্দ্রনাথকেও নূতন স্থানে আসতে হলো। নূতন বাড়ির পাশে তাঁর নিজ জমিতে একটি ছোট দ্বিতল ঘর নির্মাণ করে উঠে গেছেন দেহলীতে। আর সেই জমির উত্তরে বড় রাস্তার পাশে একটি রাণীগঞ্জ টালির বাড়ী নির্মাণ করে শান্তিনিকেতন গৃহে অবস্থিত গ্রন্থাগার স্থানান্তরিত করে আনা হলো। কালে সেই বাড়িতে হাসপাতাল স্থাপিত হয়—পিয়ার্সন হাসপাতাল খোলার পূর্বে সেইটাই ছিল আরোগ্যশালা। সে বাড়ির চিহ্ন এখন নেই এবং কোথায় ছিল তা সনাক্ত করাও কঠিন।

ইতিমধ্যে ছাত্র-সংখ্যা বাড়ছে, গৃহের প্রয়োজন, আর প্রয়োজন গ্রন্থাগারের। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিকল্পিত ব্রহ্মবিদ্যালয়ের তিনকোঠার ঘরই ছিল আবাসিক বিদ্যালয়ের সূত্রপাত। ইতিপূর্বে একমাত্র বাড়ি যেটি নির্মিত হয়েছিল তা আজ 'প্রাক্-কুটির' নামে পরিচিত। শমীন্দ্র কুটিরের কাছে মাটি কেটে এনে এই মাটির বাড়ি নির্মিত হয়। উপরে দেওয়া হয় টালির ছাদ—বাড়ির দু'পাশে বারান্দা ছিল —এখন একপাশে। আমি ঐ বারান্দায় ক্লাস নিই বহু দশক।

সেই সময় নূতন বাড়ি নির্মিত হয়। আর একটি বাড়ি ছিল টালির ছাওয়া। শান্তিনিকেতনের ২০ বিঘা জমি। শালগাছ ছিল দক্ষিণ সীমা। এর বাইরে ছিল বোধহয় ৭ বিঘা জমি। রবীন্দ্রনাথ ক্রয় করেন নিজের জন্য এবং নূতন বাড়ি নির্মাণ করেন ও কিছু পরে 'দেহলী' এক কোঠার দোতলা বাড়ি তৈরী করেন। সেই সব বাড়ির পিছনে বড় রাস্তার ধারে একটি বাড়ি নির্মিত হয় রাণীগঞ্জ টালির

ছাওয়া। সেই ঘরে ছিল বিদ্যালয়ের প্রথম লাইব্রেরি। সেই বাড়িতে কবির জামাতা সত্যবাবু থাকতেন। হোমিওপ্যাথি ঔষধ দিতেন। কোনো স্থায়ী ডাক্তার ছিল না। প্রয়োজন হলে বোলপুরের ডাক্তার হরিচরণ মুখুজ্জেকে আহ্বান করে আনা হোত। কালে ছাত্র সংখ্যা বাড়লে এই বাড়িটি পুরাপুরি হাসপাতালে পরিণত হয়। তখন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে, তিন কুটরি বারান্দা ঘেরা ঘরে লাইব্রেরী আসে। মাঝের ঘরটি হয় ল্যাবরেটরি। পশ্চিমের ঘরে বিধু শেখরের লাইব্রেরী ও শোবার ঘর। পূবের ঘরে গান হতো।

মোহিতচন্দ্র সেন ব্রহ্ম বিদ্যালয়ে প্রথম একটি বিদ্যালয়ের রূপ দেন। তিনি নিজে পণ্ডিত ছিলেন এবং সেইজন্য বিদ্যালয়ের নিমিত্ত বহু গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। সেইসব বই থাকতো এই প্রথম গ্রন্থাগারে যা কালে হাসপাতাল হয়।

কিন্তু এবার স্থির হলো ব্রহ্মবিদ্যালয়ে তিনকোঠা ঘর ও বারান্দার উপর দোতলায় বিরাট ঘর নির্মাণ করা হবে। কলকাতার কংগ্রেস ও প্রদর্শনী শেষে বহু কাঠ কাঠরা কবি কিনে এনে দোতলা চালা ঘর তুললেন। পরে নাম হয় 'বল্লভী'। সেই সময়ে তিন কোঠার সামনে যে বারান্দা ছিল তাকে দরজা দিয়ে ঘরে পরিণত করা হলো—সেই ঘরে আধুনিক লাইব্রেরির পত্তন হলো ১৯০৬ সালে। সেই সময় বিধুশেখর ভট্টাচার্য এসেছেন পশ্চিমের ঘরে। পূর্বে সংস্কৃত গ্রন্থরাজি, এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নাল ও প্রকাশিত গ্রন্থরাজির মধ্যে বিধুশেখর তাঁর পিতৃহারা ভাইপোকে নিয়ে শুতেন একটি ঘরে। আর বারান্দায় সাধারণ পুস্তক থাকতো। মাঝের ঘরে ছিল ল্যাবরেটরী। স্কুলে ল্যাবরেটরী কোথাও ছিল না। এই সংগ্রহের একটা ইতিহাস আছে। ত্রিপুরার মহারাজ কলেজ খোলার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। স্থাপনে ব্যর্থ হয়ে যন্ত্রপাতি সমূহ মহারাজ তাঁর বন্ধু রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে দান করে দেন। অধ্যাপক জগদানন্দ রায় ছেলেদের এই সব যন্ত্রপাতির সাহায্যে বিজ্ঞান শেখাতেন। মনে আছে একটা টেলিস্কোপ ছিল। সেটার নির্মাতা ছিলেন হুগলীর এক ভদ্রলোক। অবশ্য লেন্স বিদেশ থেকে কেনা। এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে হেলির ধূমকেতুর আগমন ও সম্প্রসারণ লক্ষ্য করতাম। চন্দ্রকলা জুপিটারের কোমরবন্ধ প্রভৃতি দেখতাম।

তার পাশের ঘরে হোত গান। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর সস্ত্রীক থাকতেন দেহলীতে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের এক কুটুরীর দোতলার নীচে কয়েকটি ঘরে। দিনুবাবু এখানে বহু বৎসর ছিলেন।

সাধারণ লাইব্রেরি ছিল সংকীর্ণ বারান্দার ঘরে—তা আগেই বলেছি—ছিল কয়েকটি শেলফ্। তবুও আমি যখন ১৯০৯ সালের শেষে এলাম তখন যেসব বই

দেখছি তা সাধারণ স্কুল-লাইব্রেরির বই নয়। অবশ্য বালকদের জন্য বহু গ্রন্থ ছিল। যেমন Books for Bairns, Told to the Children Series এতে বিশ্বের নাম করা বইয়ের শিশু সংস্করণ। তাদের উপযোগী করে লেখা ও ছাপা। এবং উপরের শ্রেণীর পাঠকদের জন্য ছিল Children's Classics Series। বড়দের সুশিক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথ বহু গ্রন্থ কিনলেন। নিজে বড় রকমের পড়ুয়া ছিলেন। তা না হ'লে স্কুল গ্রন্থাগারে গ্রীক মহাকাব্য ইলিয়াড, ওডেসির অনুবাদ, ভার্জিলের তর্জমা প্রভৃতি কত বই। আর কোম্পানীর ক্যানভাসারদের প্রেরণায় কেনা Historians, History of the world, The World History, Encyclopedia of Literature বহু খণ্ডে। আমি এতো সব বই ও বিশেষভাবে ইতিহাসের বই পেয়ে গোগ্রাসে পড়তে লাগলাম। কত ঘণ্টা যে পড়তাম ঠিক ছিল না। প্রাচীন পৃথিবীর ইতিহাস আকর্ষণ করে বিশেষভাবে। বহু ধরনের বই পেলাম। এই সব পড়ে লিখলাম "প্রাচীন ইতিহাসের গল্প"। বই ছাপা হয় ঢাকায়। সেখান থেকে প্রকাশ করেন হেমেন্দ্রনাথ দত্ত। তা ছাড়া শিশুদের জন্য মাসিক পত্রিকায় আমার লেখার হাতে খড়ির সূত্রপাত। এই পাঠাগারের বই পেয়েছিলাম বলেই বই লেখা সম্ভব হয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে বলি এই বই-এর ভূমিকা লেখেন পাটনা কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক যদুনাথ সরকার। তখন তিনি ঐতিহাসিক রূপে পরিচিত হননি। আমার বয়স তখন বিশ বৎসর।

কালে ল্যাবরেটরীর নূতন ঘর নির্মিত হওয়ায় স্থানান্তরিত হলো। প্রেস ও বিজলী তৈরীর যন্ত্র ঘরের কাছে কয়েকটি টিনের বাড়ি তৈরী হলে সেখানে উঠে যায়। তখন মাঝের ঘরটি লাইব্রেরিভুক্ত হয়; গানের ঘর অন্যত্র উঠে যায়। ফলে সমস্ত নিচের তলাটা লাইব্রেরির বই-এ ভরে ফেলা হয়। ১৯১৮ সালে আমি যখন কলকাতা থেকে প্রায় দু' বৎসর পরে ফিরে এসে গ্রন্থাগারের ভার পেলাম মাঝের ঘরে Reading Room ও আমার অফিস হলো। ছোট ঘরে– যেটিতে গান হতো সেটি হলো Reference Room। লাইব্রেরি দানা বাঁধতে সুরু করেছে। এই সময় গ্রন্থ বর্গীকরণে দৃষ্টি যায় সে একটা পৃথক ব্যাপার। সে আলোচনা মুলতুবি থাক।

ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের তিন কুটরি বাড়ি এখন লাইব্রেরি। কিন্তু কবির বিদেশ যাত্রা বিশেষ করে প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিদেশ সফরের ফলে আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানী যে সব বই আসতে লাগলো –তা রাখার স্থান কোথায়? তখন উপরে দোতলার বিরাট খড়ের ঘর ভেঙে নূতন ঘর তৈরী হলো। তিন কোটার পিছনে Stack

Room-এর লম্বা ঘর নির্মাণের কাজ সুরু হলো। এই সময়ে অন্ধ্রপ্রদেশের জমিদার পিঠাপুরমের মহারাজ সস্ত্রীক আশ্রম পরিদর্শনে আসেন। তিনি বিশ্বভারতীকে ২০০০ টাকা দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন।

গাবতলায় কুয়া ছিল স্নানের জন্য। তার উত্তরে ছিল একটি খড়ের চালা ঘর। সেখানে থাকতেন রাজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল। সেখানে স্থানাভাব তাই চতুর্থ ব্রাহ্মণ বিধুশেখরকে শুতে হলো লাইব্রেরি ঘরের মাঝে ছোট জোড়া চৌকির উপর। সেই ঘরেই একটি ছোট টেবিলে ও একটা টুলে (চেয়ার নয়) বসে বিধুশেখর অনুবাদ করলেন শতপথ ব্রাহ্মণ ও পালি থেকে মিলিন্দপঞহো। এটা বিশেষভাবে বলছি তার কারণ আছে। আমি ১৯০৮ সালে কলিকাতায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কলেজের ছাত্র। পালি পড়ি, মিলিন্দ পঙ্হো প্রকাশিত হয়েছে শুনে তখনই কিনে আনি। যতদূর মনে পড়ছে সান্যাল কোং ছিল প্রকাশক। তারপর প্রথম যেবার শান্তিনিকেতনে বেড়াতে আসি ১৯০৯ সালে বিধুশেখরকে দেখতে পাই সেই ছোট লাইব্রেরি ঘরে। চারদিকে বইপত্রে ঠাসা। সারা দিন কেটে গেল সেই ঘরে। ১৯০৯ সালের এপ্রিল মাসে এই ঘরের পশ্চিমে একটি দরজা ছিল—স্থানটি খালিই ছিল। ১৯০৯ সালের নভেম্বরে যখন এখানে এলাম থাকবো বলে তখন সেখানে একটা নিচু পাকা ঘর দেখা যায়। সেখানে ফালতু লোকেরা থাকতেন। আমিও তখন ফালতু কারণ আমার চাকুরী হয় ১৯১০ সালের জুন মাস থেকে। প্রথম কয় মাস আমার এই লাইব্রেরিতেই বেশির ভাগ সময় কাটতো। তখন কি জানতাম এই গ্রন্থাগার হবে আমার জীবনের বিশ্ববিদ্যালয় ?

পূর্বে বলেছি সাধারণ গ্রন্থাগার ছিল ঘেরা বারান্দায়। কয়টাই বা শেলফ্। তবুও তার মধ্যে এমন সব বই দেখলাম যা বিদ্যালয়ের প্রয়োজনের জন্য নয়। কবি জানতেন শিক্ষকরা জ্ঞানবান না হলে ছাত্ররা জ্ঞানার্জন করতে পারে না। তাই বহুবিধ বই আনিয়েছিলেন। আর মোহিত চন্দ্র সেন অল্প কালের মধ্যে ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকে পাকাপোক্ত স্কুল করাতে মন দিয়েছিলেন। বড় বড় ছেলে ভর্তি হয়। তিনি বহু গ্রন্থ আনিয়ে ছিলেন আর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন খুব পড়ুয়া। একথা সব লোকেই জানে। লাইব্রেরিতে তাঁর পড়া বই বহু ছিল।

১৯১০ সাল থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত আমি এই সাত বৎসর শিক্ষকতা করে ছোট ছোট ছেলেদের পড়াই ও নিজে পড়ি, প্রবন্ধ লিখি। বলা বাহুল্য এই গ্রন্থাগারে প্রভূত বই ছিল তার উৎস। এই সময়ের মধ্যে বই বাড়তে থাকলে স্থানের প্রয়োজন হয়। তখন মাঝের ঘরে যে বিজ্ঞানাগার (ল্যাবরেটরি) ছিল,

তা চলে গেল অন্যত্র। তখন ঐ ঘরটি পাওয়া গেল লাইব্রেরির জন্য। কাঠের শেলফ তৈরী হলো, আর গানের ঘরটাও পাওয়া গেল।

এই সময় থেকে গ্রন্থ বর্গীকরণে আমি মন দিই। Dewey সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল। কালে Dewey কেনা হলো। Cutter Sanborn-Three Alphabet Name Index পেলাম। সব দেখি পড়ি কিন্তু মন ভরে না। Dewey আমেরিকান লাইব্রেরির জন্য বর্গীকরণ পদ্ধতি প্রবর্তন করেন—ভারতীয় ভাষা ভারতীয় সাহিত্যের স্থান অত্যন্ত নগণ্য। বাংলায় বর্গীকরণ নূতন রূপ দিতে সচেষ্ট হলাম। শান্তিনিকেতন পত্রিকায় বোধ হয় ৩য় কি ৪র্থ বৎসরে এই গ্রন্থ প্রথম সুরু হয়।

বন্দীশালার পাঠাগার

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যে বন্দীশালা সম্বন্ধে সভ্য জগতের সকল স্থানেই সাধারণের মনোভাবের আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বন্দীশালাকে এখন আর সমাজের বা রাষ্ট্রের প্রতিহিংসা গ্রহণের স্থান বলিয়া মনে করা হয় না। ইহা নৈতিক চরিত্রসংশোধনের চিকিৎসালয় মাত্র—এই ধারণা সভ্য জগতের সকল দেশেই অল্প বিস্তর স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। চরিত্র সংশোধনের চিকিৎসালয় বলিয়া কারাগারকে মনে করিলে চরিত্র যাহাতে আরও অবনত না হইয়া ভালো ভাবে গঠিত হয়—মন যাহাতে দৈহিক ক্লেশে ও আত্মীয়-স্বজনের সংসর্গের অভাবে ভাঙ্গিয়া না পড়ে তাহার জন্য ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। উন্নতিশীল জাতিরা কারাগারে ছায়াচিত্র, রেডিও প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছেন। কারাগারের পুস্তক ভাণ্ডারের বহু শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। আমাদের দেশেও বিভিন্ন প্রদেশের বন্দী-শালায় পাঠাগার স্থাপিত হইতেছে।

কারা-পাঠাগারের সমস্যা সাধারণ পাঠাগার অপেক্ষা অনেক জটিল। ইহার মধ্যে যেগুলির সহিত আমাদের সাধারণতঃ সম্মুখীন হইতে হয় তাহাদের মধ্যে কয়েকটীর উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(১) পুস্তক নির্ব্বাচন
(২) অর্থের অনটন
(৩) উপযুক্ত কর্ম্মীর অপ্রাচুর্য্য
(৪) মাতৃভাষার বাহুল্য
(৫) আলো ও সময়

সাধারণ পাঠাগারে যে সকল পুস্তক গ্রাহকদিগের ভিতর সমাদর লাভ করে কারাগারের পক্ষে সেগুলি সম্পূর্ণভাবে অনুপযুক্ত বিবেচিত হইতে পারে। ডিটেকটিভ গল্প বা যৌনবৃত্তিকে যে সকল বই সজাগ করিয়া তোলে, কারাগারের পাঠাগারে সেগুলি নিতান্ত অনুপযুক্ত। রাজনৈতিক মতবাদ সম্বন্ধীয় কোন পুস্তকের কারাগারে প্রবেশ নিষেধ। এইসব শ্রেণীর পুস্তক বাদ পড়িলে, পুস্তক নির্ব্বাচনের গণ্ডী খুবই সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে।

পুস্তক-ভাণ্ডারের জন্য সরকারী সাহায্যের পরিমাণ নিতান্ত অল্প। ইহার উপর নির্ভর করিয়া কোনও গ্রন্থাগার ভালো করিয়া গড়িয়া উঠিতে পারে না। সরকার প্রদত্ত তথ্য হইতে (১৯৩৯) বিভিন্ন কারা-পাঠাগারে পুস্তকের সংখ্যা, বন্দীদের

সংখ্যা, লিখনপঠনক্ষম বন্দীদের সংখ্যা ও আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ জানিতে পারা যায় : –

পাঞ্জাব প্রদেশে পুস্তকের সংখ্যা ১১,৭২১, বন্দীদের সংখ্যা ১৮,৬২৩, লিখন-পঠনক্ষম বন্দীদের সংখ্যা ৫,৯১৪, আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ ৪০০৫৲।

বিহারে—যথাক্রমে ৪,৪৫৬, ১৪,৩৪৭, ৫,৩৮৮, ৩৫০৲ হিঃ প্রত্যেক জেলা।

মাদ্রাজে—যথাক্রমে ১২,৪৫৭, ১১,৯৫৬, ৪,০৪ নিয়মিত সাহায্য বলিয়া কিছুর ব্যবস্থা নাই।

আসামে—কোনও পুস্তক নাই, ৪,২৪৫, ১০১, নিয়মিত সাহায্যের ব্যবস্থা নাই।

লিখনপঠনক্ষম বন্দীদের সংখ্যার অনুপাতে বহির সংখ্যা কত অল্প উপরের তালিকা হইতে জানা যায়। এই অল্প-সংখ্যক সংগ্রহও সকল বন্দীর নানা কারণে সমভাবে ব্যবহার করার উপযুক্ত হয়না; কারণ নানা ধর্ম্মাবলম্বী ও বিভিন্ন প্রদেশের বন্দী অনেক সময় এক কারাগারে একত্রিত করা হয়। ইহাদের জন্য নানান মাতৃভাষার বহির ব্যবস্থার ও পুস্তক নির্ব্বাচনে বিভিন্ন ধর্ম্মের পুস্তকের উপর জোর দিতে হয়। কার্য্যক্ষেত্রে, বন্দীদের পুস্তক নির্ব্বাচন কয়েকখানি মাত্র বহির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে ভাষার বিভিন্নতা নির্ব্বিরোধ পুস্তক প্রচলনের পক্ষে কতখানি প্রতিকূল তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় মাদ্রাজ কারাগারের পুস্তক সংগ্রহ হইতে (১৯৩৯) দেখা যায় :—

ইংরাজী ৩,৫০৮, তামিল ৫,০১৫, তেলেগু ২,২০৯, মলেয়ম ৫৭১, হিন্দুস্থানী ৪৬২, উর্দ্দু ৩৭৮, আরবী ২৯, ফারসী ১৪, ক্যানারিস ২৯১, সংস্কৃত ৬, গুজরাটী ৩, মারহাটী ১, মোট সংখ্যা ১২,৪০০।

ইহাদের এইভাবে শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে :—

ধর্ম্ম ১,৭০০, নাটক ৯৬, উপন্যাস ১,৫৫৪, গল্প ১,০৮৬, সাহিত্য ১,৫৩৮, পদ্য ১৩৭, ইতিহাস ১৪১, ভূগোল ১৭১, অঙ্ক ১৮৫, জীবনী ২১৭, শিল্প ৬৮, অপরাধ-বিজ্ঞান ২০, বিজ্ঞান ১৯১, শরীর চর্চ্চা ৩০, বিবিধ ১২৬১।

বহিগুলির উপযুক্ততা সম্বন্ধে কিছুই জানা যায়না। উপযুক্ত কর্ম্মীরও কারাগারে অভাব আছে। পাঠাগার পরিচালনা সুচারুভাবে করিতে হইলে শিক্ষিত ও পাঠাগার পরিচালনার্থ ব্যবহারিক জ্ঞান আছে এরূপ কর্মীর প্রয়োজন। কারাগারে সাধারণতঃ অল্প শিক্ষিত ও অল্প দায়িত্বশীল কর্ম্মচারীর উপর নির্ভর করিতে হয়। তাঁহাদের প্রভাব পুস্তক প্রচলনের পক্ষে অনুকূল হয়না। কর্ম্মচারীদের শৈথিল্যের জন্য একই প্রদেশের মধ্যে বিভিন্ন কারাগারের মধ্যে পুস্তক বণ্টনেও বহু পার্থক্য দেখা যায়! অবশ্য রাজনৈতিক কারণও ইহার জন্য আংশিক ভাবে দায়ী থাকিতে পারে :

প্রেসিডেন্সি জেলে দৈনিক গড়-পড়তা বন্দীর সংখ্যা ২০০০, পুস্তকের সংখ্যা ১০৯২, আলিপুর জেলে বন্দী ২০০০, পুস্তক ১৮৭০, ঢাকা জেলে বন্দী ২০৩৮, পুস্তক ১৩১৭, দমদম জেলে বন্দী ১৪৩৮, পুস্তক ৩১৭।

দমদম সেণ্ট্রাল জেলে লিখনপঠনক্ষম বন্দীর সংখ্যা অন্য কারাগারগুলির অপেক্ষা অনেক বেশী। লিখনপঠনক্ষমদের হার অনুযায়ী পুস্তক-বণ্টন নীতি সরকার গ্রহণ করিলেও সকল ক্ষেত্রে এই নীতি কার্য্যকরী হয় নাই।

এ সমস্যার সমাধান করিতে হইলে সরকারী প্রচেষ্টার সহিত বেসরকারী প্রচেষ্টা সংযুক্ত করিতে হইবে। কারাগারের পুস্তক-ভাণ্ডারের জন্য সাধারণের নিকট আবেদন উত্থাপিত হইয়াছিল। ইহাতে আংশিক ফল হইলেও স্থায়ী প্রতিকারের কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায় নাই। দেশের জনমত বন্দীদের প্রতি সাধারণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এখনও সজাগ হইয়া উঠে নাই। অনেকে সম্পূর্ণভাবে বহি দান করিতে প্রস্তুত না থাকিলেও সাময়িক ঋণ দিতে আপত্তি করিবে না। বাংলাদেশে কারাগারের নিয়মাবলী অনুযায়ী সরকার সাময়িক দান বা ঋণ গ্রহণ করেন না। এই নিয়ম সকল প্রদেশে নাই। বিহার-সরকার সাময়িক দান গ্রহণ করেন বলিয়া জানা যায়। এই নিয়ম প্রবর্তিত হইলে বাংলাদেশে কারাগার শৃঙ্খলার যে কোনও প্রতিবন্ধক হইবে তাহা মনে করিবার কারণ নাই—কর্ম্মচারীদের পরিশ্রম কিছু বাড়িতে পারে।

সাময়িক দান পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। কলিকাতা ও কলিকাতার সহরতলীতে ছোট বড় নানা ধরণের সরকারী ও বেসরকারী অনেকগুলি পাঠাগার আছে। ইহাদের মধ্যে অনেকে কারাগারে বহি ঋণ দিতে প্রস্তুত থাকিতে পারে। বিনা বিচারে কারারুদ্ধ বন্দীর ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর পুস্তকাগার হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে—সাধারণ বন্দীরাই বা অনুরূপ অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিবে কেন? বহির উপযুক্ততা, অনুপযুক্ততা বিচারের পূর্ণ অধিকার কারাগার কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভর করিবে। ইহাতে বিশেষ কোনও অসুবিধা হইবে না কেননা অনেক গ্রন্থাগারের পুস্তকের তালিকা মুদ্রিত আছে। এই মুদ্রিত তালিকা হইতে বন্দীরাও আপনাদের পছন্দমত পুস্তক নির্ব্বাচন করিতে পারিবে। বাংলা দেশে অনেক প্রতিষ্ঠান সরকারী অনুমতি পাইলে পুস্তক সংগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে।

লিখন-পঠন-ক্ষম বন্দীরাই শুধু কারা-পাঠাগারের সুবিধা উপভোগ করিতে পায়—নিরক্ষর বন্দীদের সমস্যার আলোচনাও প্রয়োজন।

লোকাচারবিদ্যা গ্রন্থাগারে তথ্য সংগঠন

পীযূষকান্তি মহাপাত্র

লোকাচারবিদ্যা সমাজবিজ্ঞানের একটি অংশ হিসেবে মানুষের অতীতকে চিহ্নিত করে এবং ব্যাখ্যা করে সভ্যতার ইতিহাস। মানবজাতির অদ্যাপি প্রচলিত প্রাচীন ইতিহাসের স্রোতধারা হলো লোকাচারবিদ্যা, মানব ইতিহাসে প্রচলিত ব্যক্তি ও সমাজের রূপককাহিনীগুলো লোকাচারবিদ্যার বিষয়বস্তু। এটি চিহ্নিত করে ব্যক্তি ও পরিবার এবং ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যের সম্পর্ককে। মানুষের প্রাচীন মনের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস ও রীতিনীতির আকারে লোকাচারগুলি টিকে থাকে। লোকাচার-গুলির কিছু কিছু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য থাকলেও এগুলো মর্মবস্তুর দিক থেকে সর্বজনীন। লোকাচারবিদ্যা অঙ্গীভূত করে জাতির জীবনের সমস্ত দিক। সংস্কৃতির ধরন, সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, শিল্পকলা, কারিগরি শিল্প, গল্প-কাহিনী, গাথাসঙ্গীত, প্রবাদবাক্য, রূপকথা, ধাঁধা, পৌরাণিক কাহিনী এবং মানুষের স্বভাব-গত বৈশিষ্ট্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ, তাদের কৃষি, শিকার, মৎস্যশিকার, গৃহনির্মাণ সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এর অন্তর্ভুক্ত, তাছাড়া মানুষের প্রচলিত জীবন পদ্ধতি, ধর্মীয় উৎসব, আচার, শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান, পূজাপদ্ধতি, রীতিনীতি, বিশ্বাস, কুসংস্কার, ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকলাপ, রোগ চিকিৎসা পদ্ধতি সহ সমস্ত কিছু যা মানুষের জীবনচক্র সম্পর্কিত তার সবই লোকাচারবিদ্যা এলাকাভূক্ত।

সমাজবিজ্ঞান ও মানববিজ্ঞানের এক বহু বিস্তৃত বিষয়গোত্রকে লোকাচারবিদ্যা সংযুক্ত করেছে। আঙ্গিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য এটি সংযুক্ত নৃতত্ত্বের সঙ্গে; ঐতিহাসিক বিবর্তনের জন্য প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্বের সঙ্গে; সাহিত্যগুণ সমীক্ষার জন্য সাহিত্যের সঙ্গে; অর্থনৈতিক কাঠামো ও পরিসংখ্যান সংক্রান্ত চিত্রের সমীক্ষার জন্য অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান বিদ্যার সঙ্গে; ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, পূজাপদ্ধতি, শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানাদি চর্চার জন্য ধর্মের সঙ্গে; ভাষাবিদ্যা অনুষ্ঠানের জন্য ভাষাবিদ্যার সঙ্গে। এছাড়া ও অসংখ্য বিষয়গোত্র রয়েছে যেগুলির সঙ্গে লোকগাথার নিকট বা দূরবর্তী সম্পর্কে আবদ্ধ।

বর্তমান লোকাচারবিদ্যা একটি দ্রুত পরিবর্তনশীল বিষয়। বহু মানুষ বিষয়টির অনুশীলনে যুক্ত। বিশ্বের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে বিষয়টি পাঠাংশের অন্তর্ভুক্ত। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এটি সাহিত্য, ভাষাবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, মনোবিদ্যা, প্রত্নতত্ত্ব,

তুলনামূলক ধর্ম, প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি, সমাজবিজ্ঞানের মতো বিভিন্ন বিভাগের পাঠ্যতালিকাভুক্ত। লোকাচারবিদ্যার বহুদিক নিয়ে বর্তমানে বহু গবেষক গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন।

লোকাচারবিদ্যা বিজ্ঞান হিসেবেও বিবেচিত। মানুষের অতীত জীবনের সমস্ত দিক ও বর্তমান স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে সমাজের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে এটি চিহ্নিত করে, এর প্রচেষ্টার কেন্দ্রমুখ হলো মানব সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে আরোহী পদ্ধতিতে নথিবদ্ধ করা। লোকাচারবিদ্যা জানতে ও উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে অদ্যাপি প্রচলিত মানব-সংস্কৃতির ধরন। মানুষের জীবনচক্র ও সমাজের সমগ্র ইতিহাসের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল বিষয় ও নীতিগুলিকে ব্যাখ্যা করা এর কাজ। বিভিন্ন উপাদানের সাহায্যে লোকাচারবিদ্যা ব্যক্তি, সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাসকে বর্ণনা করে। বৈজ্ঞানিক লোকাচারবিদ্যা হলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণিত উৎস-সামগ্রী ও তথ্য সংগ্রহ; এবং মৌলিক নীতিগুলি আবিষ্কারের জন্য উপাদানগুলির অনুশীলন; এর পশ্চাৎপট ও সামাজিক কারণ নির্ধারণ, উপাদানগুলির বিভিন্ন মৌলিক কাঠামোতে বর্গীকরণ; এবং উপাদান-গুলোর যথানুপাতিক সমীক্ষা।

মানুষের এই লোকাচারবিদ্যার চর্চা ও তার বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহে সচেতনতা একশত বৎসর বা তার কিছু কম সময়ের। গোড়ার দিকে এই কাজগুলি প্রণালীবদ্ধ ভাবে হতো না। কিন্তু বিগত দশকগুলিতে এই বিষয় সমীক্ষা প্রণালীবদ্ধ ও বিষয়মুখীন হয়েছে। প্রত্যহ এই বিষয়ে বিভিন্ন উপাদান সংগৃহীত হচ্ছে। আবিষ্কৃত হচ্ছে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির নূতন নূতন দিগন্ত। মানুষের অতীত ইতিহাসের পটভূমিতে লোকাচারবিদ্যা প্রচেষ্টা চালায় মানুষের অসামাজিক সম্পর্ক নির্ধারণের। তথ্য উপাদানগুলি নির্ভরযোগ্য এবং এর সংগৃহ প্রণালীবদ্ধ হওয়া উচিত, সর্বাধিক তথ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার সামাগ্রীগুলি বিজ্ঞান সম্মত ও প্রণালীবদ্ধভাবে সংগঠিত হওয়া দরকার, লোকাচারবিদ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার সামগ্রী রয়েছে এবং শ্রেণী ও চরিত্র অনুসারে এগুলির বিভিন্নতা দেখা যায়।

গ্রন্থাগার সামগ্রী

লোকাচারবিদ্যা গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য হলো লোকাচারবিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থাগার সামগ্রীর সংগ্রহ, বিন্যাস, সংরক্ষণ এবং পরিবেশন। এটি একটি বিশেষ গ্রন্থাগার, তাই গ্রন্থাগার সামগ্রীও সীমাবদ্ধ থাকে লোকাচারবিদ্যা ও সম্বন্ধ যুক্ত

বিষয়ের অনুশীলনের জন্য। সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি হলো, প্রাগৈতিহাসিক বিষয়, প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব, জীববিদ্যা, শারীরতত্ত্ব, প্রাচীন ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সভ্যতা, প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, উপজাতিক ভাষা, মনোবিজ্ঞান, তুলনামূলক দর্শন, তুলনামূলক ধর্ম, ভাষা, মায়াবিদ্যা, প্রাগৈতিহাসিক ধর্ম, সমাজ-তত্ত্ব, রাশিবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমষ্টি উন্নয়ন প্রভৃতি।

গ্রন্থ হলো গ্রন্থাগারের মুখ্য উপাদান এবং জ্ঞানের উৎস। কিন্তু বিশেষ গ্রন্থাগারে খুব স্বাভাবিক কারণে গ্রন্থেতর সামগ্রী প্রধান উপাদান রূপে বিবেচিত হয়। লোকাচারবিদ্যা গ্রন্থাগারে গ্রন্থেতর সামগ্রী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এলাকা সমীক্ষা ও নিরীক্ষণ লোকাচারবিদ্যা গবেষণার ক্ষেত্রে জরুরী। তথ্য সংগ্রহ করতে হবে নতুন পর্যবেক্ষণ ও বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের জন্য। গ্রন্থেতর সামগ্রী থেকে সাম্প্রতিক ও সঠিক তথ্য পাওয়া যায়, লোকজীবনের বিভিন্ন দিককে বর্ণনা করে এমন বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থেতর সামগ্রী দেখা যায়।

লোকাচারবিদ্যা গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার সামগ্রীগুলিকে তিনটি মূল শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে গ্রন্থ, সাময়িক পত্রিকা, গ্রন্থেতর সামগ্রী। গ্রন্থাগারটিতে লোকাচারবিদ্যা সংক্রান্ত ও সম্বন্ধযুক্ত অন্যান্য গ্রন্থও রাখা যেতে পারে। কিন্তু গ্রন্থ হলো উৎস-উপাদান। যেমন, লোকগণনা প্রতিবেদন, পরিসংখ্যানিক বিবরণ, ভৌগলিক অভিধান ইত্যাদি। কিছু গ্রন্থ হলো আকর গ্রন্থ। যেমন, অভিধান, কোষ গ্রন্থ ইত্যাদি। অন্যান্যগুলি বিভিন্ন লেখকের সমীক্ষা ও পর্যবেক্ষণকে ভিত্তি করে লোকাচারবিদ্যা ও সম্বন্ধযুক্ত বিষয়ের সাধারন গ্রন্থসমূহ।

সাম্প্রতিক ও অতিরিক্ত তথ্য যেগুলি বিভিন্ন কারণে এখনও গ্রন্থ বা কোন-গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়নি সেগুলি সাময়িক ভাবে পাওয়া যায়। লোকাচারবিদ্যা ও সম্বন্ধযুক্ত বিষয়েরও সাময়িক পত্র রয়েছে। সাহিত্য ও সমাজ বিজ্ঞানের সাময়িক পত্রগুলি, যে গুলিতে লোকাচার বিদ্যা সংক্রান্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় সেগুলিকে গ্রন্থাগারে রাখতে হবে। বিভিন্ন বিদ্বান্ সমিতি, সংঘ এবং প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত পত্রিকা ও বুলেটিনগুলিও রাখা উচিত। তাছাড়া বিভিন্ন সভা-সম্মেলনের প্রতিবেদন অধিবেশনের বিবরণী এবং বিখ্যাত ব্যক্তিদের ভাষণগুলিও গ্রন্থাগারটিতে থাকা উচিত।

লোকাচারবিদ্যা গ্রন্থাগারে গ্রন্থেতর সামগ্রীর বিস্তৃতি ব্যাপক। উপযোগিতা ও চরিত্র অনুসারে এগুলির মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। ব্যবহারকারীদের অধিক, পরিষ্কার ও বিষয়মুখী তথ্য সরবরাহ করাই হল এগুলির মূল বস্তু। গ্রন্থাগার সামগ্রীগুলিকে তাদের প্রকৃতি ও শ্রেণী অনুসারে শ্রেণীবিন্যাস করা উচিত।

এগুলি লিখিত বা মুদ্রিত টীকা এবং প্রতিবেদন, ঘটনাস্থলের বিবরণ, ফিল্ড কর্মীদের সংগৃহীত তথ্য এবং লোকসঙ্গীতের সঙ্কালন, রূপকথা, গাথা কাহিনী, অতিকথা, ধাঁধা ইত্যাদি। গ্রন্থাগার সামগ্রীর সংগ্রহের লক্ষ্য লোকজীবনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত হওয়া উচিত। উদাহরণ স্বরূপ, লোকসঙ্গীতের বাদ্যযন্ত্র, লোকনৃত্যের পোশাক-পরিচ্ছদ, মুখোশ. শিল্পকলাদির নমুনা, প্রাচীন দেব-দেবীর মূর্তি, অলঙ্কার ও গৃহস্থালীর দ্রব্যাদি। শ্রবণ-বীক্ষণ সামগ্রীগুলি যেমন টেপ রেকর্ড, গ্রামোফোন রেকর্ড, মাইক, মাইক্রোফিল্ম, মাইক্রো কার্ড এবং এই দ্রব্যগুলি প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলিও গ্রন্থাগারে রাখা হয়। এছাড়াও অন্যান্য বিশেষ কিছু সামগ্রী যেমন—মানচিত্র, চার্ট, ফটোগ্রাফ. পাণ্ডুলিপি এবং মিউজিয়াম সামগ্রীও থাকে।

লোকাচারবিদ্যা গ্রন্থাগারে সাময়িক পত্র-পত্রিকা, ক্ষণস্থায়ী প্রকাশনা, শ্রবণ-বীক্ষণ সামগ্রী এবং অন্যান্য বিশেষ ধরনের সামগ্রী একটি বৃহত্তম স্থান অধিকার করে থাকে এবং লোকাচারবিদ্যা গ্রন্থাগারে এগুলি গুরুত্বে প্রথম। গ্রন্থাগার সামগ্রীগুলি, যেগুলি পুস্তক হিসেবে নেই, সেগুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংগঠন ও বিন্যাসের সমস্যা দেখা দেয়। ক্ষণস্থায়ী প্রকাশনাগুলি সাধারণতঃ পামফ্লেট, বুকলেট, লিফলেট, স্মারকপত্রিকা, বুলেটিন. রিপোর্ট ইত্যাদি আকারে প্রকাশিত হয়। এগুলির কোনো দীর্ঘস্থায়ী মূল্য নেই। কিন্তু কোনো বিশেষ বিষয়ের বিভিন্ন দিকের সাম্প্রতিক পরিবর্তন অনুশীলনের জন্য নির্দিষ্ট তথ্য ও নির্দেশ হিসেবে এগুলি গুরুত্বপূর্ণ। এগুলির বিন্যাস ও সজ্জা সুসম্বদ্ধ ক্রমে হওয়া উচিত। প্রকাশিত সামগ্রীগুলি নির্ঘণ্টীকৃত হওয়া প্রয়োজন এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি বর্গানুগ তালিকা প্রস্তুত করা দরকার। অপ্রকাশিত সামগ্রীগুলির জন্য প্রতিবেদন এবং নিয়ন্ত্রিত প্রকাশনা রূপে সারাংশ প্রস্তুত করা উচিত।

শ্রবণ-বীক্ষণ ও লেখনী সামগ্রী,—লোকসঙ্গীতের গ্রামোফোন রেকর্ড, উপজাতির ভাষা ও স্থানীয় কথ্য ভাষার রেকর্ড, লোকসঙ্গীতের টেপ রেকর্ড, ফিল্ড কর্মীদের প্রতিবেদন এবং পণ্ডিত ব্যক্তিদের ভাষণ ও অভিভাষণ, চলচ্চিত্রের ফিল্ম ও লোকনৃত্যের ফিল্মষ্ট্রীপ, মানচিত্র, চার্চ, জরিপের নক্শা, গ্লোব, লোকজীবনের বিভিন্ন দিকের ফটোগ্রাফ প্রভৃতি সামগ্রীগুলি তাদের প্রস্তুতি ও চরিত্র অনুসারে বিন্যস্ত হওয়া উচিত। এ ছাড়াও গ্রন্থাগারের অন্যান্য সম্পদোৎস হলো লোকজীবনের প্রত্যক্ষ সংযুক্ত দ্রব্য সামগ্রী, পাণ্ডুলিপি এবং মিউজিয়াম সামগ্রী।

গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র ব্যবহারকারীর প্রয়োজনে গ্রন্থাগার সামগ্রীর সঞ্চারন ও প্রদর্শন নয়। বরং পাঠককে প্রয়োজনমত তথ্য নির্দেশ মারফত

সাহায্য করাও এর কাজ। গ্রন্থাগারে তথ্য সঞ্চয় ও উদ্ধারের আকরসামগ্রীর প্রস্তুতকরণ, সারকরণ ও প্রলেখন প্রভৃতি ব্যবস্থা থাকা উচিত। গ্রন্থাগার সামগ্রীগুলি সঠিকভাবে বর্গীকৃত, নির্ঘণ্টীকৃত ও বিন্যস্ত থাকা উচিত যাতে সেগুলি সর্বশ্রেষ্ঠরূপে ব্যবহার করা যায়।

গ্রন্থাগার বিন্যাস সামগ্রী

লোকাচারবিদ্যা গ্রন্থাগারে নির্দিষ্ট বর্গীকরণ তালিকা অনুসরণের ব্যাপারে গ্রন্থাগারিকের বিশেষভাবে যত্নবান হওয়া উচিত। গ্রন্থাগারে লোকাচারবিদ্যা ও তার সম্বন্ধযুক্ত বিষয়েও বই থাকবে। তাছাড়া প্রত্যক্ষভাবে সম্বন্ধযুক্ত নয় এমন বইও থাকতে পারে। বিষয়সীমার ব্যাপ্তি হতে পারে দর্শন, ধর্ম, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, ভূগোল, সঙ্গীত, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাশিবিজ্ঞান, জীবনী, আধুনিক কলাবিদ্যা ও প্রত্নতত্ত্ব, আইন ইত্যাদি পর্যন্ত যা লোকাচারবিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নাও হতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত বিষয়েরও এর সম্বন্ধযুক্ত বিষয়ের বই রাখা হয় বিভিন্ন বিষয়ের তুলনামূলক চর্চা ও গবেষণার জন্য। লোকাচারবিদ্যা গ্রন্থাগারে একটি সাধারণ বর্গীকরণ তালিকা প্রচলন করা উচিত। Dr. Ralph Steele Boggs, John Macy অন্যান্যরা লোকাচারবিদ্যার ওপর নির্দিষ্ট কিছু বর্গীকরণ তালিকা প্রণয়ন করেছেন। তালিকাগুলি কিছুটা পরীক্ষামূলক। এগুলির যথার্থ মূল্যায়ন প্রয়োজন ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য। তালিকাগুলি কেবলমাত্র লোকাচারবিদ্যা সংক্রান্ত সামগ্রীর জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ক্ষেত্রগুলি এতে যথাযোগ্য সুযোগ নাও পেতে পারে।

গ্রন্থাগারিক যখন কোনো একটি বর্গীকরণ তালিকা লোকাচারবিদ্যা গ্রন্থাগারে ব্যবহার করবেন তখন তার বিষয়গুলি স্মরণে রাখা উচিত। প্রথমত, লোকাচারবিদ্যা গ্রন্থাগার কঠোরভাবে লোকাচারবিদ্যা সংক্রান্ত বিষয়ের বই এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সহযোগী ও সম্পর্কিত বিষয়ের বইও রাখা যাবে। তাছাড়া থাকতে পারে লোকাচার বিদ্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই এমন গ্রন্থও। দ্বিতীয়ত, বর্তমান সময়ে এমন গ্রন্থ দেখা যায় না যা অন্য বিষয় থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন স্তর, সম্পর্কিত বিষয় এবং বিভিন্ন বিষয়ের পরস্পর অধিক্রমণ এক্ষেত্রে আলোচিত হতে দেখা যায়। বিষয় সীমানা কঠোরভাবে লোকাচার বিদ্যার মধ্যে সীমায়িত হয়না। তৃতীয়ত, লোকাচার বিদ্যার ওপর

বর্গীকরণ তালিকাগুলি সময়ের সঙ্গে তাল রেখে নতুন বিষয়ক্ষেত্র ও বিষয়স্তরের সমন্বয় সাধনের জন্য পরিবর্তিত করা হয়না। কিন্তু সাধারণ বর্গীকরণ তালিকাগুলি প্রয়োজনে পরিবর্ধিত করে নতুন সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। চতুর্থত, গ্রন্থাগার-গুলির প্রয়োজন ও সুবিধার কথা স্মরণে রেখে সাধারণ বর্গীকরণ তালিকাগুলিতে প্রসারণের ব্যবস্থা থাকে। লোকাচারবিদ্যা গ্রন্থাগারে লোকাচারবিদ্যার পরিসরে সীমাবদ্ধতার সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে এমন একটি সাধারণ বর্গীকরণ তালিকা নির্বাচন করতে হবে যার প্রয়োজনীয় প্রসারণশীলতা আছে। তাহলে এটি সমস্ত বিষয়-ক্ষেত্রকে যেমন অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে তেমনি ব্যবহারিক প্রয়োজনকেও সিদ্ধ করবে।

লোকাচারবিদ্যা গ্রন্থাগার জ্ঞানজগতের একটি নির্দিষ্ট এলাকা বা ক্ষেত্রকে নিয়ে আলোচনা করে। বিষয়টি বর্গীকরণ তালিকায় একটি নির্দিষ্ট অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং এই সঙ্গে বর্গীকরণ তালিকার নির্দিষ্ট বিষয়-ক্ষেত্রে অনুরূপ কিছু বর্গীকরণ সংখ্যার মধ্যে এর চৌহদ্দি। যদি বর্গীকরণ তালিকা প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণশীল না হয় এবং প্রসারণাশীলতার সুযোগ সীমাবদ্ধ হয় তাহলে একটি একটি নির্দিষ্ট গ্রন্থকে স্বতন্ত্রীকৃত করা কঠিন হয়ে পড়ে। লোকাচারবিদ্যা গ্রন্থাগারে এই বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি। একটি গ্রন্থ একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারে, একটি সাধারণ গ্রন্থ লোকাচারবিদ্যার যে কেনো একটি দিক নিয়ে আলোচনা করতে পারে। অথবা এমনও হতে পারে যে একটি গ্রন্থ সম্বন্ধযুক্ত বিষয়গুলিও তুলনামূলক আলোচনা করছে। গ্রন্থটিতে আলোচিত বিষয়ের সকল দিক বা কোনো বিষয়ের একটি নির্দিষ্ট দিককে সনাক্ত করতে হবে এবং বর্গীকরণ সংখ্যায় একে স্বাতন্ত্র্য দিতে হবে। গ্রন্থাগার সামগ্রীগুলি বিশ্লেষিত আকারে বর্গীকৃত হওয়া উচিত এবং গ্রন্থটিতে আলোচিত প্রতিটি দিক বিবৃত এবং চিহ্নে রূপান্তরিত করা দরকার।

গ্রন্থ বর্গীকরণে গ্রন্থের গতি প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য বা লেখকের লক্ষ্যকে বিবেচনা করে বিষয় নির্ধারিত হওয়া উচিত। গ্রন্থে আলোচিত বিষয় বা বিষয়ের কোনো একটি নির্দিষ্ট দিক যদি বর্গীকরণ তালিকাতে উপস্থিত না থাকে তাহলে বিষয়টিকে নিকটতম বিষয় বা সম্বন্ধযুক্ত বিষয়ের মধ্যে বর্গীকৃত করতে হয়। লোকাচারবিদ্যার ব্যাপ্তি হল সমাজ বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যার এক বিস্তৃত এলাকা জুড়ে। বর্গীকরণে বিষয় নির্দিষ্ট ও বিশ্লেষিত হওয়া উচিত। বিভিন্ন বিষয় ক্ষেত্রের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও প্রভাব গ্রন্থ বর্গীকরণে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন।

স্চী এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে যাতে বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠক এবং তাদের বহুমুখী চাহিদা যথাযথভাবে সিদ্ধ হয়। কোনো গ্রন্থে যদি একাধিক বিষয় বা কোনো বিষয়ের বিভিন্ন দিক আলোচিত হয় তাহলে গ্রন্থটি আলোচিত বিষয়গুলির অন্যান্য দিকের অধীন ও স্চীকৃত হতে হবে। স্চীতে নির্দিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন বিভাগগুলি প্রতিফলিত হওয়া উচিত। একজন পাঠক একটি বিষয়ের নির্দিষ্ট দিক বা বিষয়টির আলোচনা প্রণালী বিষয়ে আগ্রহী হতে পারেন। সাময়িক পত্রিকাগুলির সাম্প্রতিক বা পশ্চাৎ খণ্ডে অথবা ক্ষণস্থায়ী প্রকাশনাগুলিতে প্রকাশিত নিবন্ধ ও প্রবন্ধকে ঘিরে তার আগ্রহ থাকতে পারে। প্রকাশনের বিষয়বস্তু তার সমস্ত প্রভাগসহ যথাযথভাবে নথিতে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

লোকাচারবিদ্যা গ্রন্থাগারে বর্গীকৃত স্চী বেশী উপযোগী। বিষয়, লেখক আখ্যা স্চীতে পূর্ণ গ্রন্থিক বিবরণ এবং অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করতে হবে। অতিরিক্ত সংলেখগুলি যতখানি সম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রস্তুত করতে হবে। মুখ্য সংলেখটি যত্ন সহকারে তৈরী করতে হবে। পূর্ণ আখ্যা এবং যদি উপ-আখ্যা বা বিকল্প আখ্যা থাকে তাহলে তাও উল্লেখ করতে হবে। লেখকের যোগ্যতাবলী এবং সামাজিক মর্যাদার উল্লেখ সংলেখে থাকবে! পৃষ্ঠাদি বিবরণ এবং মুদ্রণাঙ্ক বিস্তৃত আকারে পরিষ্কার ভাবে বিবৃত হওয়া উচিত। বিষয়বস্তু ও তার প্রভাগগুলি যথাসাধ্য কার্যকরীভাবে কার্ডে প্রদর্শন করতে হবে। সংলেখে ব্যবহৃত টীকাগুলি গুরুত্বপূর্ণ। টীকাগুলি গ্রন্থিক বা বিষয়কেন্দ্রিক হতে পারে। সংলেখ উল্লিখিত বিবরণগুলির সম্পূরক অতিরিক্ত তথ্যের জন্য এগুলি প্রয়োজন। যদি কোনো গ্রন্থ একাধিক খণ্ডে সম্পূর্ণ হয়, সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট খণ্ডটির এবং অন্যান্য খণ্ডগুলির বিষয়বস্তু উল্লেখ করতে হবে প্রত্যেক খণ্ডের মুখ্য সংলেখে। কোনো বিষয়ের প্রতিটি প্রভাগ স্চীতে উল্লেখ করতে হবে। স্চীতে বিষয় সংলেখগুলি প্রদর্শিত হতে হবে। বিষয় সংলেখগুলি এমনভাবে তৈরী করতে হবে যাতে বিষয়ের সমস্ত দিকগুলি দেখানো যায়। সংলেখ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে টীকা জরুরী ভূমিকা পালন করে।

প্রত্যেক লেখকের পুস্তিকা, ভাষা, বক্তৃতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি একই খণ্ডে বাঁধানো থাকা উচিত। যদি প্রয়োজন হয়, তবে বিভিন্ন লেখকের রচনাগুলি বিষয় অনুসারে বাঁধানো যেতে পারে। খণ্ডগুলি পৃথক ভাবে স্চীকৃত করতে হবে বিষয়বস্তুর সারণী এবং রচনার প্রকৃতি উল্লেখ সহযোগে। সমবেত লেখকদের ক্ষণস্থায়ী প্রকাশনাগুলি বিষয় অনুসারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে স্চীকরণ করতে হবে। সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলিকে সমূহ গ্রন্থিক বিবরণ সহকারে স্চীকরণ করতে হবে।

সাময়িক পত্র-পত্রিকার স্বচীসংলেখে প্রকাশন সংস্থাগুলির প্রকৃতি—যেমন বাণিজ্যিক বা কোনো সমিতি বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রকাশিত তা উল্লেখ করতে হবে। বিষয়-স্বচীও সংলেখে উল্লেখ করা যেতে পারে।

লোকাচারবিদ্যা গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার সামগ্রীর বর্ণনা ও সনাক্তকরণের জন্য বিবরণমূলক স্বচীকরণ জরুরি। স্বচীকরণে গ্রন্থেতর সামগ্রীর স্বচীকরণ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রকৃতি, বিষয়বস্তু, উপাদান, ভাব প্রকাশের ধরন এবং, কার্যকারিতা স্পষ্টতই স্বতন্ত্র হয় এবং সামগ্রীগুলি থেকে সর্বাধিক পরিবেশ পেতে হলে যথাযথ সনাক্তকরণ প্রয়োজন।

গ্রন্থেতর সামগ্রীর মূল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হলো বিষয় এবং উপাদানগুলির প্রকৃতি। মূল সামগ্রীগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা এবং শ্রবণ-বীক্ষণ সামগ্রীগুলির প্রতিলিপিকরণের বিশুদ্ধতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ফিল্মের স্বচীকরণে নিম্নোক্ত তথ্য সংযোজন করতে হবে ঃ আখ্যা, উৎপাদনের পুংখানুপুংখ, সংগঠন বা ব্যক্তির নাম, উৎপত্তির দেশ, প্রকাশনার তারিখ, বহিরাঙ্গিক তথ্য, যেমন, ৮ মিমি, ১৬ মিমি, বা ৩৫ মিমি। রিলের দৈর্ঘ্য ও সংখ্যা, প্রদর্শনের সময়, পজিটিভ বা নেগেটিভ সাদা-কালো বা বহুবর্ণের, নির্বাক বা সবাক, উৎস এবং আহরণের তারিখ, পরিলিখন সংখ্যা এবং টীকা ও ব্যাখ্যা সহযোগে অন্যান্য তথ্য যা বিষয়বস্তুকে বর্ণনা করে, বিশেষ বৈশিষ্ট্য, কলাকৌশল, লিপি, ভাষা, ফিল্মের টীকা এবং উদ্দেশ্য। স্লাইড ও ফটোগ্রাফের স্বচীকরণ ফিল্মের মতন করা যেতে পারে। অবশ্য যে সমস্ত তথ্য প্রাসঙ্গিক নয় সেগুলিকে বাদ দিয়ে, স্লাইড ও ফটোগ্রাফের একটি গ্রন্থমালার জন্য একটি মুখ্য সংলেখ প্রস্তুত করা যেতে পারে, কিন্তু গ্রন্থমালার স্বতন্ত্র স্লাইড ও ফটোগ্রাফের জন্য পৃথকভাবে বিস্তৃত বিবরণ সংযোজন করতে হবে। মাইক্রোফিল্ম, মাইক্রোকার্ড, মাইক্রোকপিগুলির স্বচীকরণ নিম্নোক্তভাবে করতে হবে ঃ আখ্যা, মাইক্রোকপির ধরন, আকৃতি, পজিটিভ বা নেগেটিভ, ব্যক্তি বা সংগঠনের নাম, প্রস্তুতের তারিখ, বিষয়, মূল নথির বিষয়বস্তু ও তথ্যাবলী। মানচিত্র, ভূচিত্রাবলী, পরিকল্পনা, রেখাচিত্র, নকশা, সমীক্ষা মানচিত্রের ক্ষেত্রে স্বচীকরণের সময় নিম্নোক্ত তথ্যের সংযোজন করতে হবে ঃ আখ্যা, সংগঠন বা ব্যক্তির নাম মানচিত্রকার বা প্রস্তুতকারীর নাম, প্রকাশকের নাম, স্কেলের বিস্তৃত তথ্য, সংস্করণ, আকৃতি, প্রকাশনের স্থান, প্রকাশনের তারিখ, সমীক্ষার তারিখ, পরিমার্জনের তারিখ, যদি থাকে, সাদা বা রঙীন, শীটের সংখ্যা, যদি থাকে, বিশেষত গ্রন্থমালার ক্ষেত্রে, উপাদানের উপস্থাপনা, যেমন—বহিরাঙ্গিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, কৃষিবিষয়ক ইত্যাদি, বিষয় ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য; যদি থাকে, টীকা এবং অন্যান্য তথ্য। সাময়িক-

পত্র, সংবাদপত্র, পুস্তিকা, বুকলেট এবং ক্ষণস্থায়ী প্রকাশনগুলিতে প্রকাশিত সর্বশেষ এবং আধুনিক তথ্যকে নিউজ-ক্লিপিংস এর আকারে সূচীকরণ করতে হবে। তথ্যের প্রাসঙ্গিক অংশকে সাপোর্টিং পেপারে আলম্বিত (Mounted) করতে হবে। উপাদানগুলিকে সেইভাবে কেটে নিতে হবে ও নমনীয়তার ব্যবস্থা রেখে বিন্যাস করতে হবে। ক্লিপিংগুলিকে নির্দিষ্ট বিষয় শিরোনামের অধীনে বিন্যাস করতে হবে। এই বিন্যাস বর্ণানুক্রমিকও হতে পারে। এগুলিকে উল্লম্ব ফাইলে বা পামফ্লেট বাক্সে সাজানো যায়। উপাদানগুলির জন্য নির্ঘণ্টের ব্যবস্থা করতে হবে।

লোকাচারবিদ্যা গ্রন্থাগারে গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা এবং গ্রন্থেত্তর সামগ্রীর জন্য পৃথক ক্যাটালগ ক্যাবিনেট্ থাকা উচিত, সূচীর বিন্যাসেরও পার্থক্য হতে পারে। গ্রন্থের জন্য বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস অনুসরণ করা যেতে পারে। যদি বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস অনুসরণ করা হয় তাহলে যতখানি সম্ভব বিস্তৃতভাবে অতিরিক্ত সংলেখ এবং বিষয়গত মিথোনির্দেশ (Cross reference) প্রস্তুত করতে হবে। পত্র-পত্রিকা এবং গ্রন্থেতর সামগ্রীর সূচী তাদের প্রকৃতি, চরিত্র, প্রত্যেক সামগ্রীর স্বতন্ত্র মৌল উপাদান অনুসারে বর্ণানুক্রমে বিন্যাসিত করা যেতে পারে, যদি প্রয়োজন হয় তাহলে বিভাজিত সূচীও প্রস্তুত করা যায়। লোকাচারবিদ্যা গ্রন্থাগারে লেখকসূচী বা নাম সূচী রাখা যেতে পারে। যদি তা করা যায় তাহলে এটি পণ্ডিত এবং গবেষণা কর্মীদের কাছে মহামূল্যবান হবে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ এবং অন্যান্য ক্ষণস্থায়ী প্রকাশনাগুলির জন্য সংলেখগুলি এই সমস্ত ফাইলগুলিতে বিন্যাসিত থাকবে।

যত্ন ও পর্যবেক্ষণ, যথাযথ এবং সাম্প্রতিক, বিস্তৃত তথ্য এবং বর্ণনামূলক বিবরণ সফল সূচীকরণের রাস্তা দেখায়। গ্রন্থাগারের প্রত্যেক সামগ্রী ব্যবহারকারীদের কাছে মহামূল্যবান। গ্রন্থাগারসামগ্রী যখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ তখন তা যতখানি সম্ভব কম সময়ে সরবরাহ করতে হবে, প্রত্যেক সংলেখকে আবশ্যিকভাবে সঠিক বিষয় সামগ্রীটির বিষয়বস্তু এবং প্রাসঙ্গিক সমূহ তথ্য বিবৃত করতে হবে। ব্যবহার-কারী যে নির্দিষ্ট তথ্যের অনুসন্ধান করছে তা যাতে সে পায় তার জন্য সূচীকরণের সমন্বয়সাধন করতে হবে।

গ্রন্থাগার সামগ্রীর পরিবেশন

ব্যবহারকারীদের পঠনের জন্য উৎস-সামগ্রী এবং তথ্য গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রস্তুত করতে হবে। পাঠক তথ্যোদ্ধার এবং আকরসামগ্রীর জন্য গ্রন্থাগার কর্মীর উপর নির্ভর করে। এছাড়াও পাঠকগণ বিভিন্নভাবে সাহায্য চাইতে পারে।

গ্রন্থাগার কর্মীদের সাহায্য ছাড়া শ্রবণ-বীক্ষণ সামগ্রী ব্যবহার করা উচিত হবে না।

কিছু কিছু বিষয় সমীক্ষার ক্ষেত্রে মুদ্রিত এবং প্রস্তুত গ্রন্থপঞ্জী উৎস-সামগ্রীর ভূমিকা পালন করে। প্রকাশিত গ্রন্থপঞ্জীগুলি সাম্প্রতিক নাও হতে পারে। সুতরাং তা অসম্পূর্ণ। এগুলি উদ্দেশ্যের মধ্যে সীমায়িত হয়। সীমায়িত হয় গ্রন্থাগার সামগ্রীর প্রাপ্যতা এবং সেগুলির সংকলক ও প্রকাশকের প্রকাশের উদ্দেশ্যকে ভিত্তি করে। লোকাচারবিদ্যা গ্রন্থাগার প্রাপ্তিসাধ্য সমস্ত আকর সামগ্রীতে সুসজ্জিত থাকা উচিত যাতে বিষয় পরিধির বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুত করা যায়। নির্দিষ্ট বিষয় এলাকার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন গ্রন্থের বিশ্লেষক সংলেখের তালিকা, পত্র-পত্রিকা এবং গ্রন্থাগারের অন্যান্য ক্ষণস্থায়ী প্রকাশনা গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুত করণে সাহায্য করতে পারে। প্রয়োজনীয় গ্রন্থিক তথ্য সহ প্রবন্ধ-নিবন্ধের নির্ঘণ্টও গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুতকরণে সাহায্য করে। গবেষণা কর্মের ক্ষেত্রগুলি পৃথক তাই পাঠকের চাহিদারও পার্থক্য থাকবে। কিন্তু লোকাচারবিদ্যা গ্রন্থাগার গবেষণা কর্মী ও পণ্ডিত এবং অন্যান্য ব্যক্তি যারা প্রয়োজনীয় সাহায্য চায় তাদের সাহায্য করার জন্য সমস্ত ধরনের গ্রন্থের দ্বারা সুসজ্জিত থাকবে, গ্রন্থপঞ্জীগুলিকে ব্যাপক, সাম্প্রতিক এবং পূর্ণ গ্রন্থিক বিবরণ সমৃদ্ধ হতে হবে। গ্রন্থীপঞ্জীগুলির সঙ্গে নির্ঘণ্ট সংযোজিত থাকবে এবং একটি প্রণালীবদ্ধ পদ্ধতিতে বিন্যস্ত থাকতে হবে।

লোকচারবিদ্যা চর্চা হয় এমন গ্রন্থাগারে, অনুলয় সেবার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পাঠক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রন্থাগারে আসে এবং তারা গ্রন্থাগার কর্মীদের থেকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য আশা করে। আকর সামগ্রীর নির্বাচন এবং সংগ্রহ অত্যন্ত যত্ন সহকারে হওয়া উচিত, এবং এর বিন্যাস প্রণালীবদ্ধ হওয়া উচিত। বিভিন্ন আকর সামগ্রীর রকম ভেদ, প্রকৃতি এবং বিষয়কে লক্ষ্য করে বর্গীকরণ করতে হবে। প্রচলিত আকর গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে লোকশিল্প, কলা কৌশল, উৎসব-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় জীবন এবং প্রাত্যহিক লোকজীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে বিজড়িত অন্যান্য সামগ্রীর সচিত্র প্রকাশনা বেশী সংখ্যায় গ্রন্থাগারে থাকা উচিত। লোকগীতির সংগ্রহ, লোকসংগীতের চিহ্ন উৎসব অনুষ্ঠান, ধর্মীয় আচার, সামাজিক রীতি, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতির ওপর সচিত্র গ্রন্থ গ্রন্থাগারে থাকা উচিত। অনুলয় সেবা বিভাগে আকর সামগ্রীর স্হচি একাধিক ভাবে প্রস্তুত করা দরকার। তথ্যমূলক প্রশ্নের অনুসন্ধানে বর্ণানুক্রমিক স্হচী সুবিধাজনক। অন্যদিকে গবেষণামূলক প্রশ্নের অনুসন্ধানে বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্টসহ বর্গীকৃত স্হচী সুবিধাজনক। অনুলয়

সেবা বিভাগে যতখানি সম্ভব বিশ্লেষক সংলেখ প্রস্তুত করতে হবে। নির্ঘণ্ট তৈরী করতে হবে সব ধরণের সামগ্রীর জন্য।

লোকাচারবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণায় ডকুমেন্টেশানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। গ্রন্থাগারের অপরিহার্য কাজ হলো গ্রন্থাগার সামগ্রী সংগ্রহ, তথ্যোদ্ধার এবং তথ্যান্বেষণ। নথি সংগ্রহের পর সেগুলিকে বিশ্লেষণ করতে হয়। এই প্রক্রিয়াটি তিনটি ভাগে সম্পূর্ণ হয়; তথ্য সংগ্রহ, বিন্যাস এবং পরিবেশণ। নথিগুলি নির্বাচন করতে হবে এবং ডকুমেন্টেশন প্রক্রিয়া এমনভাবে সমাধান করতে হবে যাতে গ্রন্থাগার সামগ্রী যত দ্রুত সম্ভব প্রাপ্তিসাধ্য করা যায়। প্রত্যেক সামগ্রীর স্বতন্ত্র প্রচ্ছদ এবং বিষয় শিরোনাম থাকে। পরিসংখ্যান, তথ্য সারণী, রেখাচিত্র, লেখচিত্র, নকশা ইত্যাদির আকারে খুব যত্ন সহকারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। নথিগুলি গ্রন্থাগারে দীর্ঘকাল সংরক্ষিত হবে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে। বিন্যাসের জন্য একটি প্রণালীবদ্ধ ক্রম অনুসরণ করা উচিত যাতে নথিগুলি যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয়। স্বতন্ত্রভাবে সামগ্রীগুলি প্রস্তুত করার সময় এগুলিকে বিশ্লেষণাত্মকভাবে বর্গীকৃত করতে হবে। গ্রন্থাগারে প্রযোজ্য হবে এমনভাবে গ্রন্থাগারিকের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রন্থের বর্গীকরণ করা ভালো।

সূচী প্রস্তুত করতে হবে সমূহ গ্রন্থিক বিবরণী সহযোগে। সংলেখ হবে প্রত্যেক সামগ্রীর শ্রেণী ও চরিত্রের দর্পণ। গ্রন্থাগার সামগ্রীর পরিবেশনে সময় একটি মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষত লোকাচারবিদ্যার মত দ্রুত পরিবর্তন-শীল বিষয়ের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। বিভিন্ন ধরনের তত্ত্ব, উপাত্ত, এবং ঘটনা প্রত্যহ প্রকাশিত হচ্ছে। বিষয়ের নানান ক্ষেপে প্রকাশনের দ্রুত সংখ্যা-বৃদ্ধি এবং পাঠক ও গবেষকদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ গ্রন্থাগারিকদের সামনে সমস্যার সৃষ্টি করছে। তাই ডকুমেন্টেশান ও সারকরণে গ্রন্থাগার সামগ্রীর সযত্ন সংগ্রহ দ্রুত পরিবেশন এবং প্রণালীবদ্ধ বিন্যাসের জন্য সামগ্রী প্রস্তুতকরণ প্রয়োজন। দ্রুত নির্দেশদানের জন্য নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করতে হবে।

লোকাচারবিদ্যা গ্রন্থাগার একটি বিশেষ এবং প্রযুক্তিক গ্রন্থাগার। তাই গ্রন্থাগার সামগ্রীর নির্বাচন ও সংগ্রহে গ্রন্থাগারিকের উচিত স্ব স্ব বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করা। গ্রন্থাগার সামগ্রীর সংগঠন ও বিন্যাসে আধুনিক ও বিশেষ প্রযুক্তির প্রচলন করতে হবে। ব্যক্তিক সংস্পর্শ সহযোগে পাঠক পরিষেবা লোকাচারবিদ্যা গ্রন্থাগারের লভ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

লাইব্রেরী আন্দোলন

লীলাবতী নাগ

এই কেন্দ্রীয় অধ্যয়নাগারের বার্ষিক উৎসবানুষ্ঠানে সভানেতৃত্ব করতে অনুরোধ করে আমাকে যে সম্মান আপনারা দিয়েছেন তার জন্য আমার সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জানাছি। বিশ্বাস করি গ্রামে গ্রামে এইরূপ প্রতিষ্ঠানের নীরব কল্যাণ সাধনার মধ্যেই জাতির ভবিষৎজড়িত, সাক্ষাৎ ভাবে তার কিছু পরিচয় লাভ করিবার সুযোগ ঘটবে এই মনে করে আপনাদের অনুরোধ সানন্দে গ্রহণ করে ছিলাম। দীর্ঘকাল কারাবাসের পর জাতীয় জীবনের দিকে দিকে নানা পরিবর্ত্তন চোখে পড়ছে—এ যুগের চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই জাতীয় সাধনার ভারকেন্দ্র সহর থেকে গ্রামে স্থানান্তরিত করবার প্রয়োজন বোধ করছেন—যাদের নিয়ে জাতি ও দেশ, তাদের সম্পর্কে এই সচেতনতা শুভলক্ষণ সন্দেহ নেই। বর্ত্তমানে গ্রাম্য গ্রন্থাগারগুলির কাজেই এক বিশেষ উপযোগীতা ও মূল্য রয়েছে।

প্রাচীন ভারতে লাইব্রেরী

আধুনিক লাইব্রেরী আন্দোলন সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত—গণশিক্ষা প্রচারে এর একটি বিশেষ স্থান আছে, কারণ জ্ঞানকে সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সহজ সুগম করাই একমাত্র এর উদ্দেশ্য নয়—অজ্ঞতা দূর করবার উপায় হিসাবেও এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রাচীন ভারতে জ্ঞান ছিল মুষ্টিমেয় পণ্ডিতদের ব্যক্তিগত সম্পদের মত। সেকালে পণ্ডিতেরা এক একটি বিষয় এমন ভাবে আয়ত্ত করতেন যে তারা নিজেরাই বইএর অভাব পূর্ণ করতেন। সেকালে শ্রুতির সাহায্যে বিস্তৃত ভাবে জ্ঞান প্রচার চলত; শ্রুতির সাহায্যে কতকটা উৎকৃষ্ট জ্ঞানলাভ সম্ভব ছিল তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, আকবর, শিবাজী, হায়দর আলী এরা। প্রত্যেকে নিরক্ষর থাকা সত্ত্বেও দেশের জন্য বিস্তৃত ভাবে নানা জটিল কর্ম্মানুষ্ঠান করেছেন। এতে প্রমাণ হয় যে শিক্ষা মুষ্টিমেয় কয়েক জনের মধ্যে বংশপরম্পরাগত ভাবে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও জ্ঞানের বহুল প্রচার ছিল। তবে জ্ঞান ব্রাহ্মণের গণ্ডিসীমা অতিক্রম করে যতই সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত লাভ করলো এবং যতই কেবলমাত্র ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয়ে আবদ্ধ না হয়ে নানা শিল্পকলাকে কেন্দ্র করেও আত্মপ্রকাশ করলো ততই বইর প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত

হল। বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও লাইব্রেরী সৃষ্টি করতে সহায়তা করেছে— তক্ষশিলাতে লাইব্রেরী ছিল কিনা সে সম্বন্ধে যদিও আমরা নিঃসন্দেহ নই তবে সপ্তম শতাব্দীর নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে একটি বিশাল পুস্তাকাগার ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এছাড়া বহু প্রমাণ রয়েছে যাতে বোঝা যায় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে যথেষ্ট পুস্তকাগার ছিল যা থেকে বহুসংখ্যক পুস্তক ভারতের বাইরে নেওয়া সম্ভব হোত। ফাহিএন প্রভৃতি চৈনিক ভ্রমণার্থীদের এদেশে তীর্থযাত্রায় আসবার একটি প্রধান আকর্ষণ ছিল—ধর্ম্ম-সংক্রান্ত পুস্তক সংগ্রহ করা। ভারত ইতিহাসের এই মধ্যযুগে বিশ্ববিদ্যালয় ও মন্দিরগুলিতে বই সংগ্রহ করা প্রায় রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমন কি রাজা মহারাজাদের প্রসাদেও বই সঞ্চয় করা হোত এবং এই সঞ্চয় গৃহগুলিকে সাধারণতঃ "সরস্বতী-ভাণ্ডার" বলা হোত। গ্রন্থাগারগুলি যখন কোন কারণে ধ্বংস পেত বা আক্রান্ত হোত তখন পণ্ডিতগণ বইসহ ভারতের বাইরেও পলায়ন করেছেন। প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলার বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন এখানকার যে সব পণ্ডিত আত্মরক্ষার জন্য পলায়ন করেছিলেন তাঁরা বহুসংখ্যক পুস্তক নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি স্থানে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন—যার ফলে নেপাল ও তিব্বতের বিখ্যাত গ্রন্থাগারগুলি জন্মলাভ করে।

মুসলমান রাজত্বকালে লাইব্রেরী আন্দোলন মুসলমান পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হোল। এ সময় থেকে বড় বড় রাজ্য ও রাজসভাগুলির সঙ্গে লাইব্রেরী সংযুক্ত হোল এমন কি শিক্ষিত পরিবারেও গ্রন্থাগার দেখা দিল। কোন বিশেষ গ্রন্থের সাহায্য নেবার উদ্দেশ্যে সুদীর্ঘ যাত্রার ক্লেশ বরণের অনেক উদাহরণ এ যুগে পাওয়া যায়। যদিও এই গ্রন্থাগারগুলি বর্ত্তমান যুগের "ফ্রি লাইব্রেরী" বলতে যা বোঝা যায় সেরূপে ছিল না তবুও এইগুলি বহু পরিমাণে সর্বসাধারণ দ্বারা ব্যবহৃত হোত।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের সম্ভাবনা

কিছুটা রাষ্ট্রিক অধিকারলাভ ও রাজনৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে শিক্ষার অভাব এক বিশেষ সমস্যা রূপে দেখা দিয়েছে। নিরক্ষর প্রাপ্ত বয়স্কদের রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন করবার উপর নির্ভর করছে আমাদের মুক্তি লাভের সম্ভাবনা। এই চেতনা আনবার কাজে লাইব্রেরীগুলির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। লাইব্রেরী-গুলির কাজ তিন ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। (১) নিরক্ষর প্রাপ্তবয়স্কদের

মধ্যে শিক্ষা প্রচার (২) যারা লিখতে পড়তে জানে কিন্তু যাদের শিক্ষিত আখ্যা দেওয়া যায় না তাদের জ্ঞানস্পৃহা বাড়ান ও অন্ততঃপক্ষে তারা যাতে নিরক্ষরতাতে আবার ফিরে না যায় তার হাত থেকে তাদের রক্ষা করা, এবং (৩) শিক্ষিতদের পাঠের সুযোগ দান করা।

প্রথমোক্ত দলের মধ্যে শিক্ষা প্রচার সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কিন্তু আবশ্যক এদের শিক্ষাদানের প্রণালী হবে মৌখিক। নানা বিষয়ে চিত্তাকর্ষক ভাবে বক্তৃতা, আলোচনা দৈনিক ও সাপ্তাহিক খবর পাঠ, নানা বিষয় গল্প বলা, ম্যাজিক লণ্ঠন ও বায়োস্কোপের সাহায্যে ও নাইট স্কুলের ব্যবস্থা দ্বারা এদের মধ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রচার ও সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রিক চেতনা জাগান সম্ভব করতে হবে। দ্বিতীয় দল অর্থাৎ যারা সামান্য লিখন পঠনক্ষম কিন্তু যাদের শিক্ষিত বলা চলে না তাদের উপযুক্ত নির্দেশ দেওয়া ও যথার্থ প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির দিকে তাদের আকৃষ্ট করাও লাইব্রেরীর কাজ। তৃতীয় দলের জন্য প্রয়োজন দেশের ও জগতের নিত্য নূতন ভাবধারায় বাহনগুলি সংগ্রহ ও যথোপযুক্ত পরিবেশনের ব্যবস্থা।

পশ্চিমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জাতীয় জীবনের অঙ্গস্বরূপ জাতীয় ইতিহাস, তার ভাব ও চিন্তাধারা, তার আশা আকাঙ্ক্ষা মূর্ত্ত হয়ে উঠে এদের মধ্য দিয়ে। কিন্তু ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উদ্দেশ্য ঠিক এর বিপরীত—এদের উদ্দেশ্য ভারতীয় জীবনধারার উপর পাশ্চাত্য প্রভাব বিস্তার করা। এদের শেকড় ভারতের মাটির নয়—ইউরোপের। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য জ্ঞানের অভিমুখীনতা দুই বিভিন্ন দিকে, এ জন্যই দুয়েরই সমান প্রয়োজন রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও সর্ব্বসাধারণের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হবে এই লাইব্রেরীগুলিকে আশ্রয় করে, গ্রামে গ্রামে এই লাইব্রেরীগুলিকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলে মেয়েরা যদি ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী ভারতের জন-সাধারণের গৃহদ্বারে পৌঁছে দেয়, তবে অর্জ্জিত শিক্ষাকে কাজে লাগাতে না পারার ব্যর্থতা থেকে ও উদ্দেশ্যহীনতা থেকেই যে শুধু তারা মুক্তি পাবে তা নয়—দেশেরও প্রভূত কল্যাণ হবে। সঙ্গে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা, গ্রামবাসীদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে যথার্থ তথ্য সংগ্রহ করা, জাতির মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত করা ও এর সহিত তাদের মঙ্গল কিভাবে জড়িত তা বুঝিয়ে দেওয়া চলতে পারে। এই ভাবে লাইব্রেরীগুলি কেবল নীরব বাণীর বাহন না হয়ে এক একটি প্রাণবাণ শক্তি কেন্দ্র হয়ে উঠবে; মস্তিষ্কের খাদ্য ও কর্ম্মের প্রেরণা দিয়ে সমস্ত জাতিকে পুষ্ট ও উদ্বুদ্ধ করবে।

লাইব্রেরিয়ানদের কর্ত্তব্য

লাইব্রেরিয়ানের কর্তব্য পুস্তক ও পাঠকের মধ্যে মৈত্রী ও ঐক্য স্থাপন করা। পুস্তকের ভার গ্রহণ করা মাত্রই তাঁর কাজ নয়—পাঠকের দায়িত্ব গ্রহণ করাও তাঁর কাজ. লাইব্রেরীর সার্থকতা নির্ভর করে লাইব্রেরীর পুস্তকের পাঠ হওয়ার উপর। কাজেই অধ্যক্ষকে সর্ব্বদা সচেষ্ট হতে হবে তাঁর মণিমুক্তাগুলির সৌন্দর্য্য দ্বারা পাঠককে আকৃষ্ট করা। এই জন্য তাঁর উচিত একদিকে দেশবিদেশে প্রতি দিন যে নিত্যনূতন বই প্রকাশিত হচ্ছে তার তালিকা রাখা এবং যেগুলি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সেগুলি সংগ্রহ করা এবং এই নূতন প্রকাশিত ও সংগৃহীত পুস্তকের তালিকা লাইব্রেরী গৃহের কোন প্রকাশ্য স্থানে ঝুলিয়ে রাখা। সম্ভব হোলে তাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়াতে পাঠকদের আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ার অধিক সম্ভাবনা। এ ছাড়া সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাগুলির বিশেষ বিশেষ নিবন্ধের ধারাবাহিক তালিকা প্রকাশ্য স্থানে ঝুলিয়ে রাখলে পঠিত হবার সম্ভাবনা বেশী।

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের স্বরূপ

পশ্চিমে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীগুলিতে সাধারণতঃ ৬টী বিভাগ থাকে। (১) পুস্তক ধার দেওয়ার বিভাগ, (২) Reference বা তথ্য বিভাগ, (৩) মাসিক পত্রিকা বিভাগ, (৪) সংবাদ পত্রিকা বিভাগ, (৫) শিশু বিভাগ, ৬) ব্যবসাবাণিজ্য ও বিশেষ কোন শিল্প সম্বন্ধে তথ্য বিভাগ।

পুস্তক ধার দেওয়া বিভাগে সাধারণতঃ ৩০ থেকে ৫০ হাজার পুস্তক থাকে, এর মধ্যে শতকরা ২০টী থাকে গল্প বা উপন্যাস। স্থানীয় বাসিন্দারা বিনা আয়াসে এই বিভাগ থেকে কোন অর্থ জমা না দিয়েই বই পড়তে ও বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারে। প্রতি শনিবার রাত্রিতে দেখা যায় ৫।৬ শত পাঠক এই বিভাগ থেকে বই ধার নেয়।

তথ্য বিভাগের পাঠকদের জিজ্ঞাসানুযায়ী তথ্য যথাসম্ভব শীঘ্র ও শিষ্টতার সহিত সরবরাহ করা হয়। এই বিভাগের কর্ম্মচারী সাধারণতঃ খুব অভিজ্ঞ ও যোগ্য লোক হয়। মৌখিক ভাবে ও ফোনে ব্যস্ত পাঠনিয়তদের সকল প্রকার প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য তিনি সদাসর্ব্বদা প্রস্তুত থাকেন।

কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীগুলির এক একটীতে প্রায় ২০০ মাসিক আসে। প্রধান

প্রধান মাসিক ছাড়া স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের উপযোগী পত্রিকাও রাখা হয়। যথা— কৃষি প্রধান স্থানে কৃষি সম্বন্ধীয় পত্রিকা রাখা হয়।

সংবাদপত্র বিভাগ আর একটী জনপ্রিয় বিভাগ। কোন কঠিন বই পড়বার যাদের শিক্ষা নেই তারা এই বিভাগে অনেকটা সময় কাটায়। তবে লাইব্রেরিয়ান সাধারণতঃ এই বিভাগ দ্বারা তাদের আকৃষ্ট করে ক্রমে শিশু বিভাগ ও বয়স্কদের বিভাগের পুস্তক পাঠের দিকেও তাদের শক্তি ও আগ্রহকে নিযুক্ত করে।

শিশু বিভাগ প্রতি সাধারন লাইব্রেরীর একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় বিভাগ। এই বিভাগে শিশুর সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বই নাড়াচাড়া করে ও তাদের পছন্দানুযায়ী বই বাছাই করে। এই বিভাগের অধ্যক্ষ সাধারণতঃ কোন মহিলা হন। তিনি অতি দক্ষতার সহিত শিশুদের আগ্রহ স্বষ্টি ও পাঠ নির্দ্দিষ্ট করেন। এ ছাড়া প্রতি মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরীর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, স্থানীয় যাবতীয় সাহিত্য, বই, মানচিত্র, ছবি, ইত্যাদি এতে নিয়মিত সংগৃহীত হয়। সেই বিশেষ স্থান সম্বন্ধীয় ভৌগলিক, ভূতাত্ত্বিক ও স্থাপত্যশিল্পের সমস্ত তথ্য ও লাইব্রেরীতে সমাবেশিত হয়।

আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারগুলিও অনুরূপ আদর্শে পরিচালিত হতে পারে। এতে অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা দুইই বৃদ্ধি পায়। এই সকল কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে গ্রামের ছোট ছোট গ্রন্থাগারগুলি, পাক্ষিক ও সাপ্তাহিকভাবে বই, পত্রিকা ইত্যাদি ধার নিতে পারে। এভাবে কম সংখ্যক বইয়েও স্বল্প ব্যয়ে ভাল একটি লাই,ব্রী চলা সম্ভব। কারন সংখ্যা বাহুল্যই গ্রন্থাগারের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয়। সর্ব্বদা ব্যবহার হয় এইরূপ বইএর আধিক্যেই লাইব্রেরীর যথার্থ মূল্য। বড় বড় লাইব্রেরী ভাণ্ডারের কাজ করবে, আর গ্রামের লাইব্রেরীগুলি যোগাবে নিত্য ভোজনের বস্তু। এভাবে সহর ও গ্রামের লাইব্রেরীর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হবে।

অর্থ সমস্যা

প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া সত্ত্বেও গ্রামে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা কঠিন কারণ অর্থ সমস্যা। গ্রামের জমিদার ও ধনী ব্যবসায়ী ও যাঁরা বিদেশে বড় চাকুরী করেন তাঁদের অর্থ সাহায্যের উপরেই এই প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠবার

সম্ভাবনা। এ দিকে তাদের আগ্রহান্বিত করা প্রথমে কঠিন হবে, কালে মন্দির বা পুষ্করিণী দেবার মতই লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা রীতি হয়ে দাঁড়াবে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের পীঠস্থান এই বিক্রমপুর। জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ দীপাঙ্করের জন্ম এইখানেই—তিনি ভারতের জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে রত্ন আহরণ করে তিব্বতের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করেছিলেন। দেশবন্ধু ও জগদীশচন্দ্রের পূত জন্মভূমি এই বিক্রমপুর। এখানে আজ আপনাদের এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। জাতি গঠনের যে পথ আপনারা বেছে নিয়েছেন তার চাইতে শ্রেষ্ঠতর পথ আর নেই। এদিক দিয়ে আপনাদের সিদ্ধি বাঙ্গালার শত শত গ্রামকে এ পথে উদ্বুদ্ধ করবে এ বিশ্বাস ও আশা নিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার

মুনীন্দ্র দেব রায়

এগার বৎসর পূর্ব্বে আমরা যখন প্রথম হুগলী জেলা পাঠাগার সম্মেলন আহ্বান করি তখন ভাবিতে পারি নাই যে মাঝে মাঝে আমরা এই ভাবে সম্মিলিত হইতে পারিব। আমাদের দেশের জলবায়ুর দোষেই হউক, বা আর কোন কারণেই হউক, প্রথম উদ্যম ও উৎসাহ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসে। এ ক্ষেত্রে যে তাহা ঘটে নাই—ইহা নিঃসন্দেহে আশার ও আনন্দের কথা।

১৯২৫ সনের ৮ই ও ৯ই মে বাঁশবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগারের উদ্যোগে বাঁশবেড়িয়ায় বাংলা দেশের মধ্যে প্রথম গ্রন্থাগার-আন্দোলন আরম্ভ হয়। সেই সময় হুগলী জেলা গ্রন্থাগার সমিতি স্থাপিত হয়। হুগলী জেলাকে কেন্দ্র করিয়া কার্য্যের প্রথম সূত্রপাত হয়; ক্রমশঃ কার্য্যক্ষেত্র সম্প্রসারিত হইয়া সমগ্র বঙ্গদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। হুগলী জেলার অধিকাংশ গ্রন্থাগার এই সমিতির সহিত সংযুক্ত হয়। আমাদের দ্বিতীয় সম্মেলন ও প্রদর্শনী হয় উত্তরপাড়ায়—সারস্বত-সম্মেলনের আহ্বানে। তৃতীয় সম্মেলন ও প্রদর্শনী হয় চন্দননগরে নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে। তৎপরবর্ত্তী অধিবেশন হয় আবার বাঁশবেড়িয়ায়; তাহার পরের সম্মেলন ও প্রদর্শনী হয় শ্রীরামপুর রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী হলে। এই সকল সম্মেলন ও প্রদর্শনী গ্রন্থাগার-সমিতির কার্য্যকারিতা বৃদ্ধির সহায়ক হয়।

দেশে অর্থনৈতিক দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। এই দারুণ অর্থ-কৃচ্ছ্রতার দিনে আন্দোলনের প্রসার আশানুরূপ হওয়া সম্ভবপর নহে। সরকার গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বহুদিন উদাসীন ছিলেন। আন্দোলনের ফলে সে ভাব কিছু কিছু কাটিতেছে। জেলাবোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড পূর্ব্বে গ্রন্থাগারে অর্থসাহায্য করিতে পারিতেন না, আইনগত বাধা ছিল। সংশোধিত আইন দ্বারা সে সব বাধা দূর করা হইয়াছে। এখন জেলাবোর্ড বা ইউনিয়ান বোর্ড তাঁহাদের এলাকাস্থিত গ্রন্থাগারে যথাশক্তি সাহায্য করিতে পারিতেছেন। বাংলা দেশে হুগলী জেলাবোর্ডই এ বিষয়ে প্রথম পথপ্রদর্শক। আর এই জেলার গোঘাট ইউনিয়ান বোর্ড সর্ব্বপ্রথম তাঁহাদের এলাকাস্থিত গ্রন্থাগারে সাহায্য দান প্রথার প্রবর্ত্তন করেন।

বাংলা দেশে বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হইত। মাদ্রাজ, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে গ্রন্থাগারিকের কার্য্য শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে, বাংলা

দেশে তাহার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। সরকারও একেবারে উদাসীন ছিলেন। এই ঔদাসীন্য ঘুচাইবার প্রস্তাব করিলে তাঁহারা বলেন যে এখানে বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের চাহিদা নাই। চাহিদা আছে কি না পরীক্ষা করিবার জন্য ১৯৩৪ সনে আমরা বাঁশবেড়িয়ায় নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক গ্রন্থাগারের কর্ম্মীদের লইয়া একটি শিক্ষাকেন্দ্র খুলি। তাহাতে দেখা যায় শিক্ষার্থীর অভাব নাই। সে কেন্দ্রে শিক্ষার ভার লন শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু। তিনি সেই সময় বড়োদা ও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গ্রন্থাগারিকের কার্য্য শিক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসেন। তখনও তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন নাই। যদিও অন্যান্য অধ্যাপক ও শিক্ষাব্রতী এই কেন্দ্রে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন ও ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক খাঁ-বাহাদুর আসাদুল্লা এই কেন্দ্রের ডিরেক্টর ছিলেন, তথাপি প্রমীলবাবুর সাহায্য না পাইলে আমরা এই শিক্ষাকেন্দ্র খুলিতে পারিতাম না। এই শিক্ষাকেন্দ্রের সাফল্যে বেশ একটা সাড়া পড়িয়া যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি শিক্ষাকেন্দ্র খুলিবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ইতিমধ্যে গ্রন্থাগারিক খাঁ-বাহাদুর আসাদুল্লার চেষ্টায় ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীতে একটি শিক্ষাকেন্দ্র ছয় মাসের জন্য খোলা হয়। তাহার ফলও বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে।

আমরা প্রমীলবাবুকে দিয়া আরও একটা দরকারী কাজ করাইয়া লইয়াছি। আমাদের জেলার সদর, শ্রীরামপুর ও আরামবাগ মহকুমার যত গ্রন্থাগার আছে—সাধারণ গ্রন্থাগার হউক আর স্কুল-কলেজ-সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারই হউক—তিনি স্বয়ং সেগুলি পরিদর্শন করিয়া তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা ও তাহার উন্নতি সাধনের সহজ উপায় তাহার বিবরণে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর তিনি যেখানে যেখানে গিয়াছেন, সেসব স্থানের কর্ম্মীদিগকে গ্রন্থাগার পরিচালন সম্বন্ধে পরামর্শ ও উপদেশ দিয়াছেন। গ্রন্থাগারগুলিকে জনপ্রিয় করিতে হইলে পুস্তকের অবাধ ব্যবহারের ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। অন্ততপক্ষে দরকারী বই যাহাতে বিনা-চাঁদায় পাঠককে ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলিকে চিত্তাকর্ষক করিতে হইবে। যাহাতে ছাত্রেরা গ্রন্থাগারে আকৃষ্ট হয় ও তাহাদের পাঠের আগ্রহ বাড়ে তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

বিলাতের কাউণ্টি লাইব্রেরী সার্ভিসের মত জেলাবোর্ডের মধ্যবর্ত্তিতায় গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে পরস্পর পুস্তক লেন-দেনের ব্যবস্থা হওয়া দরকার। এই লেন-দেনের ফলে একই পুস্তক দোকর-তেকর খরিদ বন্ধ হইয়া সেই টাকায় নূতন নূতন পুস্তক কেনা চলিতে পারিবে। ইহাতে অন্য অনেক রকম সুবিধা আছে।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় হইতে এদেশে শিক্ষিত কারাবন্দীর সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যায়। তাঁহারা কারাগারে পুস্তকের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিতে থাকেন। কেবল হুগলীতে নয়, অন্য কারাগারেও পুস্তকের চাহিদা পূরণ করিবার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। এ সম্বন্ধে কয়েক বৎসর ধরিয়া আন্দোলন করা গিয়াছিল —এবার তাহার কিছু ফল ফলিয়াছে। সরকার জেলখানায় গ্রন্থাগার স্থাপন করার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া সেজন্য কিছু টাকার ব্যবস্থা করিয়াছেন ও আমাদের কাছেও পুস্তকের সাহায্য চাহিয়াছিলেন। আশা করি যাঁহার যেরূপ সাধ্য পুরাতন পুস্তক বা পত্রিকা সংগ্রহ দ্বারা বন্দীদের পুস্তকপাঠে সাহায্য করিয়া তাহাদের কারাক্লেশ অনেকটা লাঘব করিতে চেষ্টা করিবেন।

আর এক কথা। আমাদের দেশে শিশু-পাঠাগারের বিশেষ অভাব দেখা যায়। স্কুলসংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারগুলি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ; আদৌ চিত্তাকর্ষক নয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমরা বাঁশবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগারে একটি শিশু-বিভাগ খুলিয়াছি—তাহার পরিচালনার ভার শিশুদের হাতে অনেকটা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার ফল অনেকটা সন্তোষজনক বলিয়া মনে হইতেছে। এই বিভাগ খুলিবার পর শিশুদের পুস্তকপাঠে অনুরাগ বাড়িয়া গিয়াছে। স্কুলে ধরাবাঁধা নিয়মে পাঠ্য পুস্তক পড়িতে হয়। পড়াশোনা কতকটা বাধ্য হইয়া করিতে হয় বলিয়া প্রকৃত পাঠানুরাগ জন্মে না।

ইউরোপ ও আমেরিকার গ্রন্থাগারের প্রত্যেক বিভাগের জন্য পৃথক ভাবে গ্রন্থাগারিক শিক্ষিত করা হয়। যে-সকল গ্রন্থাগারে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ বা ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত গ্রন্থ রক্ষিত হয় সেগুলির জন্যও বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগারিক নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। এমন কি হাসপাতালের গ্রন্থাগারের জন্য পৃথক ভাবে বিশেষজ্ঞ প্রস্তুত ও নিয়োগ করা হয়। হাসপাতালের গ্রন্থাগারিক চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রত্যেক রোগীর উপযোগী পুস্তক সরবরাহ করিয়া থাকেন। সব পুস্তক সকল রোগীর পক্ষে উপযোগী নহে। রোগীর মনের উপর পুস্তকের প্রভাব বিস্তৃত হয়। সেজন্য মানসিক অবস্থা বুঝিয়া পুস্তক নির্ব্বাচন করিতে হয়। কোন পুস্তকে সাময়িক উত্তেজনা বর্দ্ধন করে, আবার কোন পুস্তক রোগীকে শক্তি দান করে, কোন পুস্তকপাঠে অবসাদ আনিয়া দেয়, কোনটি আবার মোহিনী শক্তিতে অভিভূত করিয়া ফেলে। কাজেই গ্রন্থাগারিককে পুস্তক-নির্ব্বাচনে অতিরিক্ত পরিমাণে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়।

আজকাল অনেক শিক্ষিত লোক চিকিৎসা শুশ্রূষার জন্য হাসপাতালে গিয়া

থাকেন। তাঁহাদের চিত্তবিনোদনের জন্য পুস্তক বা সাময়িক পত্রের অভাব পরিলক্ষিত হয়। রোগীদের দীর্ঘ অবসর কাটাইবার জন্য হাসপাতালে চিত্ত-বিনোদন সৎসাহিত্যের আমদানী করার আবশ্যক হইয়াছে। তাহাতে রোগীর শরীর ও মন দুইটি ভাল থাকিবে এবং ভাল আরোগ্যের পথও সুগম হইতে পারে। আমরা সেই উদ্দেশ্যে হাসপাতালে রাখিবার জন্য পুস্তক ও সাময়িক পত্র সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছি। আশাকরি হৃদয়বান লোকের সাহায্যে আমাদের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

তিনকড়ি দত্ত ও গ্রন্থাগার আন্দোলন

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস লেখা হইয়াছে বা হইতেছে। এক সময়ে এই ইতিহাস ইংরেজিতে লেখার জন্য আমার উপরে ভার দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ দীর্ঘসূত্রতার জন্য সে ভার আমি গ্রহণ করিতে পারি নাই। যাহা হউক এখন যে যোগ্যতর ব্যক্তি ভার লইয়াছেন তাহাতে আমি আনন্দিত। তিনি পুরাতন কাগজপত্র নথি ইত্যাদি ঘাঁটিয়া নানা স্থানে খোঁজ খবর করিয়া অধ্যবসায় সহকারে এই কাজ করিয়া যাইতেছেন। এই আন্দোলনের গোড়ার দিকে ইহার সহিত আমি ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত ছিলাম এবং এক সময়ে ইহার সম্পাদকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। সেই সূত্রে কয়েকটা ব্যাপার আমি জানি যাহার উল্লেখ কোনও কাগজপত্রে নাই। তাহারই দুই একটা যদি এখানে বিবৃত করি—তাহাতে হয়ত অনেক পাঠক তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন।

এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তিনকড়ি দত্ত মহাশয়ের বাঁশবেড়িয়ার বাড়ীতে স্তিমিতপ্রায় লণ্ঠনের আলোকে দেড়তলার ছোট একটি ঘরে। সেইখানে ছুটির দিনে বাঁশবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগারের দৈনিক কাজ শেষ হওয়ার পর সন্ধ্যাকালে জমায়েৎ হইতাম আমরা তিনজন—"The three musketeers" of Bansberia—তিনকড়ি দত্ত, মনীন্দ্রনাথ রুদ্র ও এই লেখক। আরও কেহ কেহ মাঝে মাঝে যে থাকিতেন না এমন নয়। তখন আমরা সকলেই তরুণ যুবক। সামাজিক প্রতিষ্ঠায় রুদ্র মহাশয় ছিলেন আমাদের মধ্যে অগ্রগণ্য, তখন তিনি Scottish Churches College-এ Physics-র অন্যতম উপাধ্যায়। তিনকড়ি বাবু ছিলেন E. I. R-র P. W. D. বিভাগের Works Sub-inspector আর আমি ছিলাম রকমারি—কিছুকাল ছাত্র, কিছুকাল বেকার এবং কিছুকাল A. G. B-র আফিসে auditor. জীবিকার জন্য প্রত্যেককেই যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইত। সেই পরিশ্রমের অবকাশে আমাদের বিনোদন ছিল বাঁশবেড়িয়া পাঠাগার পরিচালনের নেশা এবং বৃহত্তর পাঠাগার আন্দোলনের স্বপ্ন দেখা। কিন্তু সেই স্বপ্নই সত্যে পরিণত হইয়াছে; তখন আমার বন্ধুরা (বর্তমানে তাঁহারা শিক্ষাজগতে খ্যাতনামা) library movement-র কল্পনাকে উপহাস্য মনে করিতেন, বলিতেন 'ওরে, ওদের library আবার move করে।' কিন্তু সেই হাসির দিন আর নাই।

কিছুদিন আগে আমি এক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গ্রন্থাগারিক-কে বলিয়াছিলাম, 'আজ যে আপনি University Professor-এর সমান মর্য্যাদা ও বেতন পাইতেছেন, মনে রাখিবেন যে ইহার মূলে আছে সেই পঞ্চাশ বছর আগে আমাদের এ পথে প্রথম প্রয়াস ও সাধনা। কবির ভাষায়, তখন আমাদের সম্বল ছিল :

"A wondrous thing of our dreaming,
Unearthly impossible seeming –

... ...

Till our dream shall become there present
And their work in the world be done."

আমাদের এই সান্ধ্য—বৈঠকে সব রকম আলোচনাই হইত, 'cabbages" হইতে "Kings" কিছুই বাদ যাইত না। আলোচনার মধ্যে চ্যাংড়ামি না থাকিলেও যথেষ্ট তীক্ষ্ণ wit-এর পরিচয় থাকিত, এবং সেইটাই ছিল উপভোগ্য। আমরা কোনও উগ্র মত বা ধর্ম প্রচারের জন্য সমবেত হই নাই ; আমরা আড্ডা দিতাম, তবে সব বিষয়েই একটা commn sense view আমাদের থাকিত, যদিও মাঝে মাঝে একটা উৎকট কল্পনা—"যদি ··· হয়, তবে কী হয়" গোছের কল্পনা করিয়া বেশ মজা পাইতাম। তবে শুধু মজা নয়, আমাদের আলাপ আলোচনার মধ্যে একটা অন্তর্লীণ high seriousness ছিল ; ঐখানে বসিয়াই আমি 'সবুজপত্রের' পুরাতন সংখ্যা হইতে অতুল গুপ্তের সাহিত্য প্রবন্ধ পড়ি। তাহা ছাড়া আমাদের গল্পগুজবের মধ্যে একটা dynamic ভাবও ছিল। এই dynamism-র মূলে ছিল—তিনকড়ি দত্ত।

তিনকড়ি দত্ত মহাশয়কে এ কালের গ্রন্থাগার কর্মীরা অনেকে বোধ হয় ব্যক্তিগত ভাবেও জানেন। আমার জীবনে আমি বাংলাদেশের খ্যাতনামা অনেককে দেখিয়াছি ; কিন্তু যে মাত্র কয়েকটিকে আমি "great" বলিয়া মনে করি, তাহার মধ্যে অন্যতম হইল তিনকড়ি দত্ত। শুনিয়া হয়ত অনেকে চমকিত হইবেন। তিনকড়ি ছিল E. I. R.-র একজন সাধারণ কর্মী, তাহার লেখাপড়া I. Sc. পর্যন্ত, গ্রন্থ রচনায় কোনও ক্ষমতা তাহার ছিল না, বক্তা হিসাবে ছিল খুবই সাধারণ। তাহার ধনসম্পদ্ কিছুই ছিল না। কিন্তু তাহার মধ্যে একটা আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। জ্বলন্ত শিখা যেখানেই স্পর্শ করে সেখানেই আগুনের পরশমণির ছোঁওয়া লাগে ; তাহার উৎসাহ সকলকেই স্পর্শ করিত,

সকলকেই সে এই গ্রন্থাগার আন্দোলনের মধ্যে টানিয়া আনিতে পারিত। সে ছিল দলাদলির একেবারে উর্দ্ধে। এই সদাচার, নির্বিরোধ, নিঃস্বার্থ, উৎসাহী যুবককে সকলেই ভালবাসিত ; তাহার অমায়িক ব্যবহার এবং একনিষ্ঠতায় সকলেই আকৃষ্ট হইত। বয়সে বড় ও বয়সে ছোট, সমাজের উর্দ্ধস্তরের ও নিম্নস্তরের সব রকম লোকের সহিতই সে সমান ব্যবহার করিতে পারিত। সে আমাকে টানিয়াছিল, পরে আমার পুত্রকেও সে দলে টানিয়া নেয়। তিনকড়ির জন্যই অধ্যাপক রুদ্র এবং আমাদের প্রথম সভাপতি কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় এই আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছিলেন এবং পরে আরও বহু ব্যক্তি প্রায় নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনকড়ির আন্দোলনে ভিড়িয়া যান, এবং গ্রন্থাগার আন্দোলন বাঁশবেড়িয়া হইতে সমগ্র বাংলা দেশে ছড়াইয়া পড়ে। এই আন্দোলনের প্রথম দিকে অধ্যাপক রুদ্র ছিলেন প্রধান সম্পাদক ; কাগজপত্র রাখা, নানাবিধ ব্যবস্থাপনা করা ইত্যাদি সচিবোচিত কাজ তিনি ভালই করিতেন। আমার উপর ভার ছিল-এই আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া প্রবন্ধ, প্রচারপত্র ইত্যাদি লেখা ও মাঝে মাঝে এখানে ওখানে এই বিষয়ে বক্তৃতা করা। কিন্তু যাহাই আমারা কেহ করিয়া থাকি না কেন, আমরা ছিলাম তিনকড়ির হাতে যন্ত্র মাত্র, সেই ছিল যন্ত্রী —আসল পরিচালক ও সর্বাধিনায়ক।

তিনকড়ি শুধু মামুলি ভাবে বাঁশবেড়িয়া গ্রন্থাগার পরিচালন করিয়া তৃপ্ত ছিল না। সে এখান ওখান হইতে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে কাগজপত্র ও বই সংগ্রহ করিত। খবরের কাগজে একদিন একটা সংবাদ আমরা পড়ি, বরোদায় একটা বড় গ্রন্থাগার আছে এবং গায়কোয়াড়ের পৃষ্ঠপোষকতায় সেই গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্পর্কে একটা সভা হইয়াছে ; গ্রন্থাগারিকের নাম Newton Mohon Dutta। খবরটা পড়িয়া আমাদের বেশ ভাল লাগিল ; কিন্তু তিনকড়ি তখনই N. M. Dutta-র সহিত পত্রালাপ আরম্ভ করিল। এইখানেই তিনকড়ি ছিল আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাহার নিষ্ঠা ও উৎসাহের অবধি ছিল না, কোনও বাধা বা নৈরাশ্য তাহাকে দমাইতে পারিত না। তাহার সহপাঠী অধ্যাপক রুদ্রের সহিত প্রায়ই তাহার তর্ক হইত, তাহার পরিকল্পনাকে অনেক সময় রুদ্র মহাশয় অসম্ভব বা অবাস্তব বলিতেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনকড়ির পরিকল্পনাই গ্রহণ করিয়া তাহাকে বাস্তব রূপ দিতেন।

যাহা হউক বরোদা হইতে গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্পর্কে অনেক কিছু বই ও পত্রিকা আসে। তিনকড়ি নিজে যতটা পড়ুক বা না পড়ুক, আমাদের পড়িতে বাধ্য করিত। কৌতূহল বশে সে সমস্ত বই পড়িতে পড়িতে আমার নিজেরও

ঐ বিষয়ে অনেক ধারণা পরিষ্কার হইয়া উঠে এবং এক সময়ে আমিই ছিলাম আন্দোলনের "theoretician".

তখন আমি Dewey System-র বদলে আমাদের ছোট ছোট গ্রন্থাগারের উপযোগী এক নূতন classificationর খসড়া করি, এবং Modern Review পত্রিকায় 'Book Selection for Public Libraries' বলিয়া একটা প্রবন্ধ প্রকাশ করি। এইবার তিনকড়ি আমাদের লইয়া গ্রন্থাগার "gospel" প্রচারে বাহির হইল। তাহার সঙ্গে আমি নানা জায়গায় গিয়াছি শুধু ত্রিবেণী, হুগলী নয়—বৈদ্যবাটী, শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া, এমন কি হরিপাল পর্যন্ত। সর্বত্রই আমরা সাদর অভ্যর্থনা পাইয়াছি, স্থানে স্থানে ভুরিভোজনও হইত। প্রচারক হিসাবে তিনকড়ির বৈশিষ্ট্য ছিল। সে মাতব্বর গোছের লোক ও ছেলে ছোকরার দল—সকলের সঙ্গেই সহজভাবে মিশিত, কোনও রকম preaching-র প্রয়াস ছিল না, দু'চার কথায়—(রুদ্র মহাশয় বলিতেন, 'হেঁ হেঁ' করিয়া) সকলের মধ্যে "faith" ও "hope" আনিয়া দিত। "Faith can work wonders." তাহাই ঘটিল। তিনকড়ি প্রথমে বাঁশবেড়িয়াতেই হুগলী জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলনের আয়োজন করিল। সকলেই এই অসমসাহসিকতায় বিস্মিত হইল, কিন্তু কি করা যায়? শেষ পর্যন্ত দেশের তরুণ প্রবীণ সকলেই সহায়তা করিল, এবং সেই সম্মেলনও হইল। Delegate-দের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হইল অতি সাদামাঠা ধরনের, কিন্তু সকলেই সন্তোষ ও তৃপ্তির সহিত সারাদিন থাকিয়া সম্মেলনের কাজে যোগ দিল, এবং আশা ও নিষ্ঠা লইয়া দেশে ফিরিয়া গেল।

এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন তুলসীচরণ গোস্বামী মহাশয়। সে যুগে তিনি ছিলেন স্বরাজ পার্টির অন্যতম নায়ক, বাংলার Big five-র একজন, কেন্দ্রীয় বিধানসভার প্রখ্যাত বক্তা ও তার্কিক, রাজা কিশোরী গোস্বামীর পুত্র Cambridge-র M. A. ও বিলাসিতায় একান্ত অভ্যস্ত। তিনকড়ি কি করিয়া তাঁহাকে রাজি করাইল জানি না, আমরা ত তাঁহার সন্নিকটে যাবার সাহসও করিতাম না। কিন্তু তিনি নিজের মোটরে করিয়া সকালেই আসিলেন, অতি যোগ্যতা সহকারে সভাপতিত্ব করিলেন, সকলের সঙ্গে মাটিতে পাতা পাড়িয়া ডালভাত খাইলেন তাঁহার ভাষণ শুনিয়া বুঝিলাম যে বক্তা হিসাবে তাঁহার এত খ্যাতি কেন। বক্তৃতা অনতিদীর্ঘ, দেশকালের উপযুক্ত এবং আলোচ্য বিষয় ও সমস্যার সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। পরে তিনকড়ির সহিত তাঁহার Ballygunje'-এর প্রাসাদে বার দুই গিয়াছি, প্রতি বারই তাঁহার সহৃদয়তা ও তীক্ষ্ণ বিচারশক্তির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছি। বহুকাল পরে তাঁহার দুই

কন্যা হইয়াছিল আমার ছাত্রী। দুঃখের বিষয় সে সময়ে তুলসী গোস্বামী মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছিলেন।

তিনকড়ির সাহস ছিল অদম্য। সেই অধিবেশনে সে Imperial Library-র Librarian—Mr. J. A. Chapman মহাশয়কেও আনিয়া হাজির করিয়াছিল। তিনিও প্রায় সারাদিন ছিলেন, তবে "observer" হিসাবে। এই প্রসঙ্গে একটা ব্যাপার উল্লেখ করিলে বোধ হয় পাঠকদের মন্দ লাগবে না। আমাদের সেই সম্মেলন শেষ হওয়ার পরে Englishman কাগজে Chapman সাহেব আমাদের সম্মেলন সম্পর্কে কটাক্ষ করিয়া একটা চিঠি প্রকাশ করেন। সমস্ত ব্যাপারটাই তিনি অকিঞ্চিৎকর মনে করেন এবং বলেন পাড়াগাঁয়ের গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট গ্রন্থাগার করার কোনও মানে হয় না; স্থানে স্থানে যথেষ্ট বই ইত্যাদি রাখিয়া বড় বড় গ্রন্থাগার রাখাই সঙ্গত, যে জিজ্ঞাসু সে সেখান হইতে বই লইয়া পড়িবে।

অর্থাৎ তাঁহার মতে library একটা Static institution, অনেক হিসাবে museum-র সগোত্র। এই চিঠি দেখিয়া আমরা শুধু বিমর্ষ নয়, অপমানিত বোধ করিলাম। তিনকড়ি আমাকে একটা উপযুক্ত জবাব দিবার জন্য প্ররোচিত করে। আমি একটা সুদীর্ঘ প্রতিবাদ পত্র লিখি ও তিনকড়িকে দেখাই। তিনকড়ি পত্র পড়িয়া একটু আশঙ্কিত হয়, পাছে সাহেব চটিয়া যান। যাহা হউক আমার প্রতিবাদপত্রটিও Englishman-এ ছাপা হয়। দু' এক দিন পরে Chapman সাহেব আমার পত্রের উত্তরে আর একটি পত্র Englishman-এ ছাপেন। সে পত্রটি ক্ষুদ্রায়তন; সাহেব আমার পত্রের উল্লেখ করিয়া বলেন যে লেখক তাঁহাকে ভুল বুঝিয়াছেন, তিনি যদি সাক্ষাৎ করেন তবে সাহেব নিজের বক্তব্য পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে পারেন। তিনকড়ির কথায় শঙ্কিতচিত্তে আমি Imperial Library-তে গিয়া সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করি। আমাকে দেখিয়া সাহেব আশ্চর্য্য হইয়া যান; এই খর্ব, শীর্ণ, মলিনবেশ তরুণ-ই ঐ দারুণ তীক্ষ্ণ প্রতিবাদের লেখক। তাঁহার প্রথম প্রশ্ন—Are you an M.A. or a B.A.? আমি মাত্র B.A. (তখনও আমি M.A. পাশ করি নাই)। দুই চারিটি সাধারণ কথাবার্তার পর আমাদের প্রচেষ্টা সম্পর্কে তাঁহার হিতৈষণা প্রকাশ করিয়া তিনি নিজস্ব পুস্তকাবলী হইতে দুইটি বড় বড় Volume আমাকে উপহার দেন; সে দুইটি হইল Sacred Books of the East (edited by Max Muller) series-এর দুইটি গ্রন্থ। বই দুইটি এখনও বাঁশবেড়িয়া পাঠাগারে আছে! যাহা হউক এই কাহিনী হইতে ইংরেজ চরিত্রের দোষগুণ উভয়েরই পরিচয় পাঠকেরা পাইবেন।

যে দিন Albert Hall-এ সভা করিয়া Bengal Library Association-এর প্রতিষ্ঠা হয়, সে দিনও Chapman সাহেব উপস্থিত হন। সভার শেষে তিনি জিজ্ঞাসা করেন তবে কি আজ হইতে Bengal Library Association প্রতিষ্ঠিত হইল? আমরা বলি, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। সাহেবের মনে বোধহয় তখনও সন্দেহ ছিল, তবে সে সন্দেহ যে অমূলক তাহা প্রমাণ করিয়া গিয়াছে তিনকড়ি দত্ত। এর পরেই সে বাঁশবেড়িয়ায় Library Training Centre খোলে, বাংলা দেশে এটাই প্রথম। পরিচালনা করেন শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু; আমিও কিছু পরিমাণে অংশগ্রহণ করিয়াছিলাম। এর পরে জীবিকা অর্জনের জন্য আমি অন্যত্র যাই, সাংসারিক নানা কারণে আন্দোলনের কেন্দ্র হইতে সরিয়া পড়ি কিন্তু তিনকড়ি দত্ত ছিল 'true to his first and only love.'

দেশবন্ধু ও গ্রন্থাগার আন্দোলন

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ একাধারে ছিলেন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ, রাজনৈতিক নেতা, সাহিত্যিক এবং সর্বত্যাগী সাধক। তাঁহার জীবনের রাজনৈতিক দিকটাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। তিনি ভুঁইফোড় রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না। প্রৌঢ় বয়স হইতেই তিনি বাঙ্গলা দেশের বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং উহার গুপ্তচক্রের একজন বিশিষ্ট পরামর্শদাতা হিসাবেও তাঁহার একটা ভূমিকা ছিল।

মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক অহিংস—অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তিত হইলে তিনি এই আন্দোলনে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া বেপরোয়াভাবে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের কার্যক্রম গৃহীত হইলে তিনি ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জিলার অন্তর্গত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বাহেরক সত্যাশ্রমের আহ্বানে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিভাবে জাতীয় শিক্ষা পরিচালিত হইবে তাহাই এই সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল। তখন তিনি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছিলেন, শিক্ষাকে স্থগিত রাখা যাইতে পারে কিন্তু স্বরাজকে স্থগিত রাখা যায় না। সাময়িক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি শিক্ষাবিরোধী ছিলেন না। তিনি বলিতেন, "মরণের পথে স্বাধীনতার মন্দিরে যাইতে হয়। কাজেই জনগণকে মরণের শিক্ষাই দিতে হইবে। কিন্তু জনগণকে সাক্ষর করিয়া তোলা; দেশের সর্বপ্রকার সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখা ও নিজের ন্যায্য দাবীদাওয়া আদায়ের জন্য শক্তিসঞ্চয় করার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবদ্ধ ছিল। আর রাজনৈতিক ভাবাদর্শের দিক দিয়াও তিনি বলিতেন, জনগণের স্বার্থই সর্বপ্রধান স্বার্থ"। তাঁহার মতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন ছিল একটা উপায়, উদ্দেশ্য হইল সর্বদিক দিয়া জাতিকে গড়িয়া তোলা। কাজেই দেশের সামনে রহিয়াছে বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। জনগণের সর্বপ্রকার দৈন্য ঘুচানই দেশসেবকদের মুখ্য সাধনা। যাঁহারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনকেই প্রাধান্য দিতেন তাঁহাদিগের সহিত তিনি একমত ছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে চলিবে দেশবাসীর চেষ্টায় জনগণের অবস্থার উন্নয়ন।

জনগণের অবস্থার উন্নয়ন করিতে হইলে সার্বজনীন গ্রন্থাগারের মাধ্যমেই তাহাদিগকে রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন, আত্মনির্ভর ও সক্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে। দেশের সার্বজনীন গ্রন্থাগারের স্বল্পতা, ইহার ব্যবহারে জনগণের অনাগ্রহ এবং দেশের প্রয়োজনে গ্রন্থাগার ব্যবহারের উপযোগিতা সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টার অভাব তাঁহার মনকে বিশেষ পীড়া দিত। অতীতের গৌরব ভাঙ্গাইয়া খাইবার প্রবৃত্তিকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। নির্বিচারে পাশ্চাত্যভাব গ্রহণ করিয়া দেশের মধ্যে তাহা প্রবর্তিত করিবার মনোভাবকে প্রশ্রয় দিতেন না। প্রবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া দেশের পক্ষে উপযোগী কর্মপন্থা গ্রহণের জন্যই তিনি আকুল আবেদন জানাইয়াছিলেন।

গ্রন্থাগারসমূহকে তিনি পুস্তকের সংগ্রহশালা মনে করিতেন না। এইগুলি যাহাতে পাঠক ও জনগণের সেবায় নিয়োজিত হয় তাহার দিকে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাঁহার এই চিন্তা কাহারও নিকট হইতে ধার করেন নাই। ইহা তাঁহার মৌলিক চিন্তাই ছিল।

অনেকে তাঁহার তৃতীয় নিখিল ভারত সার্বজনীন গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতির আসন গ্রহণ করাকে একটা আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তাঁহাদের উক্ত মত সমর্থনযোগ্য নয়। তাঁহার এই দিকে কিছু চিন্তা ছিল বলিয়াই গ্রন্থাগার সম্মেলনের উদ্যোক্তারা কংগ্রেসের অধিবেশন মণ্ডপে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে তাঁহাকে সভাপতি পদে বরণ করিয়াছিলেন। অনেকে বলিয়া থাকেন তিনি সম্মেলনের অধিবেশনে নিয়মিতভাবে যোগ দিতে পারেন নাই। ইহা সত্য যে, দেশের বৃহত্তম কার্যে ব্যাপৃত থাকার দরুণ তাঁহার সর্বক্ষণ এই সম্মেলনের কাজের সহিত নিয়মিতভাবে যুক্ত থাকিবার সুযোগ ঘটে নাই। কিন্তু ইহাতে ইহাই কি প্রমাণিত হয় যে তিনি শুধু দায়সারা ভাবে এই দায়িত্ব পালন করিয়াছেন?

পরন্তু তিনি এমন একটি বিচক্ষণ লোককে তাঁহার স্থানাভিষিক্ত করিয়া যান যিনি বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট পথপ্রদর্শক। তাঁহার নাম তুলসীচরণ গোস্বামী। তাঁহারও এই বিষয়ে মৌলিকচিন্তা ছিল এবং স্বদেশের ও বিদেশের গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা, অবস্থা ও পরিচালন সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন।

দেশবন্ধু ইহা সবিশেষ জানিতেন দেশের শিক্ষার প্রসারের ব্যাপারে সার্বজনীন গ্রন্থাগারের একটা বিশেষ দান রহিয়াছে। এবং উহা সেই দায় পালন করিলে বা উহা দ্বারা সেই দায় পালন করাইলে দেশের ও জনগণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হইবে। জাতীয় শিক্ষার প্রসারের কাজে ব্যাঘাত উপস্থিত হইলে এবং

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তির সম্ভাবনা দেখা দিলে কাকিনাদা কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় সাশ্রুনেত্রে যে ভাষণ দিয়াছিলেন তাহা জনমণ্ডলীর চিত্তকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি জনশিক্ষাকে স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি অপরিহার্য অঙ্গরূপেই মনে করিতেন। এছাড়া কলিকাতা পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত সার্বজনীন গ্রন্থাগারসমূহকে তিনি জনশিক্ষার বাহনরূপে যাহাতে ব্যবহার করা যায় সেই সম্বন্ধে চিন্তা করা ও অর্থ সাহায্য করার প্রেরণাও তিনিই দিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় অকালেই মৃত্যু তাঁহাকে আমাদের মধ্য হইতে ছিনাইয়া লইয়া গেল।

দেশবন্ধু যে বাংলার ও ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রবর্ত্তক ও পরিপোষকদের মধ্যে অন্যতম তাহাতে সন্দেহ নাই।

অনারেবল কোম্পানি'জ প্রেস

শ্রীপান্থ

অষ্টাদশ শতকের কলকাতায় ছাপা অনেক বইয়ের নামমাত্র মুদ্রিত রয়েছে শব্দ কয়টি –'অনারেবল কোম্পানি'জ প্রেস'। কার ছাপাখানা সেটি ? 'কোম্পানি', সবাই জানেন, সেদিন সওদাগরি সংস্থা মাত্র নয়, এদেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সেখানে রাজসরকার বলতে তাঁরাই। 'অনারেবল কোম্পানি'জ প্রেস' তবে কি সরকারী ছাপাখানা ?

এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের আগে আর একটা কথা স্পষ্ট হয়ে যাওয়া দরকার। অষ্টাদশ শতকের কলকাতা এবং মুদ্রিত বই শুনে অনেকে হয়তো চোখ মুদ্রিত ক'রে ভাবতে বসতে পারেন—তবে কি অষ্টাদশ শতকের কলকাতায় হ্যালহেড-এর বাংলা ব্যাকরণই একমাত্র ছাপা বই নয় ? নিশ্চয়ই নয়। 'এ গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ' (১৭৭৮) বা যে বইটিকে উপলক্ষ ক'রে সম্প্রতি ঘটা করে বাংলা বইয়ের দুশ বছর পুর্তি উৎসব উদ্‌যাপিত হয়ে গেল কলকাতায় সেটি বাংলা মুলুকে প্রথম মুদ্রিত বই হ'লেও অষ্টাদশ শতকের কলকাতায় একমাত্র মুদ্রিত বই নয়। (সম্প্রতি বিলাতে এমন একটি মুদ্রিত বস্তুর সন্ধান পাওয়া গেছে যা দেখে গবেষকরা অনুমান করছেন হয়তো হ্যালহেড-এর ব্যাকরণ ছাপা হওয়ার ক'মাস আগেই কলকাতায় ছাপা হয়েছিল এটি। বস্তুটি ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দের একটি ক্যালেণ্ডার।) বস্তুত ১৭৭৮ থেকে ১৭৯৯—এই একুশ বছরে কমপক্ষে নানা মাপের ৩০০ বই ছাপা হয়েছে আমাদের এই শহরে। তার মধ্যে বাংলা, ফারসী তো বটেই, এমনকি আর্মেনিয়ান, পর্তুগীজ বই পর্যন্ত রয়েছে। কলকাতায় তখন চালু ছিল সতেরটি ছাপাখানা। মাথা গুনলে শহরে পেশাদার মুদ্রাকর পঁয়ত্রিশ জন। এই একুশ বছরের মধ্যে সাপ্তাহিক কাগজ ছাপা হয়েছে আঠারোটি। অবশ্য সবই ইংরেজীতে। আর বাংলা বই ছাপা হয়েছে মাত্র ষোলটি। তবে যত বইপত্রই ছাপা হোক না কেন, পাতা ওলটালে দেখা যাবে মুদ্রিত প্রতিটি বইয়ের একটিতে রয়েছে সেই বাক্য—'অনারেবল কোম্পানি'জ প্রেস'।

একটি দুটি নয়, শতেক বইয়ে যখন লেখা রয়েছে কথা কয়টি তখন একে নিশ্চয়ই ভুতুড়ে কাণ্ড বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। 'অনারেবল কোম্পানি'জ প্রেস' নামে নিশ্চয়ই ছাপাখানা ছিল অষ্টাদশ শতকের কলকাতায়। আমাদের

জিজ্ঞাসা একটাই,– সে ছাপাখানার মালিক কি সরকার ? জিজ্ঞাসাটা জরুরী। কারণ, জিজ্ঞাসার উত্তর যদি 'না' হয় তবে প্রচলিত ধারণার সংশোধন করা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। আর যদি 'হ্যাঁ' হয়, তবে নতুন ক'রে লিখতে হয় সরকারী ছাপাখানার ইতিহাস।

হ্যালহেড-এর ব্যাকরণ ছাপা হয়েছিল হুগলির একটি ছাপাখানায়। বি জি প্রেসের এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেখছিলাম (এ পীপ ইনটু দি বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস, ১৯৩৬)। সে ছাপাখানাটিকে লেখক আদি সরকারী ছাপাখানা হিসাবে গ্রহণ করতে পারলেই যেন খুশি। শ্রীরামপুরের মিশনারিরা আবার ওই ছাপাখানার মালিকানা সমর্পণ করেছেন অ্যানড্রুজ নামে এক বইওয়ালাকে। কিন্তু আমাদের ধারণা তার মালিক ছিলেন চার্লস 'উইলকিন্‌স কিংবা উইলকিন্‌স-হ্যালহেড জুটি। ব্যাকরণ লেখা এবং ছাপার জন্য সরকার টাকাকড়ি তাঁদেরই দিয়েছেন, কোনও স্বতন্ত্র মুদ্রাকরকে নয়। যাহোক, ওই বইটি ছাপা হওয়ার পরে পরেই উইলকিন্‌স সরকারের কাছে এক পরিকল্পনা পেশ করেন সরকারী ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার জন্য। এসব ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বরের কথা। উইলকিন্‌স-এর প্রস্তাব ছিল তিনি নির্দিষ্ট হারে ওই ছাপাখানায় সরকারী কাগজপত্র ছাপবেন। তবে সরকারকে শুধু ছাপার খরচ দিলেই চলবে না। ছাপাখানার কর্মীদের মাইনেপত্র এবং অন্যান্য খরচও যোগাতে হবে তা ছাড়া পরিচালক হিসাবে তাঁকে দিতে হবে মাসে সাড়ে তিনশ টাকা ভাতা এবং সাড়ে তিনশ টাকা বাড়ি ভাড়া। ডিসেম্বরে (১৭৭৮) কাউন্সিলে এই নিয়ে আলোচনা চলে। কোনও কোনও সদস্যের ইচ্ছা ছিল উইলকিন্‌সকে নির্দিষ্ট হারে ছাপার অনুমতি দেওয়া, কিন্তু ছাপাখানা পরিচালনার দায়িত্ব না নেওয়া। কিন্তু হেস্টিংস-এর চেষ্টায় প্রস্তাবটা শেষ পর্যন্ত এক বছরের জন্য অনুমোদিত হয়। এমনকি আমরা দেখতে পাই ১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সরকারের তরফ থেকে সেক্রেটারি হডসন সাহেব সংশ্লিষ্ট সব সরকারী বিভাগকে জানিয়ে দিচ্ছেন নতুন বন্দোবস্তের কথা।

এই সরকারী প্রস্তাব এবং নির্দেশ কার্যকর হয়ে থাকলে ১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসেই কলকাতায় 'অনারেবল কোম্পানি'জ প্রেস' চালু থাকার কথা। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সে ছাপাখানায় নয়, দেশের সেনাপতি সে বছরই ছাপার কাজ দিচ্ছেন অন্য আর একজন মুদ্রাকরকে। তিনি ভারতের প্রথম সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেট'-এর সম্পাদক, প্রকাশক এবং মুদ্রাকর জেমস্ অগস্টাস হিকি। তাঁর দাবি তিনিই অনারেবল কোম্পানির 'প্রথম মুদ্রাকর' বস্তুত 'বেঙ্গল গেজেট'-এর প্রতি সংখ্যায় মুদ্রাকরের নামের পাশে পরিচয়লিপি হিসাবে লেখা

থাকত সে কথা,—'ফার্স্ট অ্যাণ্ড লেট প্রিণ্টার টু দি অনারেবল কোম্পানি'। 'ফার্স্ট' শব্দটি জোর দিয়ে বলার জন্য বাঁকা হরফে। কোথায় তখন চার্লস উইলকিন্স? পরের বছর কিন্তু দেখি উইলকিন্স শহর থেকে দূরে, তিনি মালদহে বসে নাস্তালিক হরফ তৈরীর চেষ্টা করছেন। ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে সেখান থেকেই ছাপা হয়েছিল ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন-এর 'এ কমপেনডিয়াস ভোকাবুলারি ইংলিশ অ্যাণ্ড পার্শিয়ান'। কলকাতায় উইলকিন্সকে মুদ্রাকর হিসাবে আমরা দেখতে পাই পরের বছর ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে। ১১৪নং কসাইটোলায় তাঁর ছাপাখানা। মুদ্রাকর সেখানে স্বয়ং চার্লস উইলকিন্স। ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি দেশে চলে গেলে বছরখানেক সেখানেই ঝুলত বটে সেই সাইনবোর্ডটি—'অনারেবল কোম্পানি'জ প্রেস'।

উইলকিন্স-এর ছাপাখানার ললাটে এই পরিচয়লিপি অঙ্কিত ছিল কি না আমরা সঠিক জানি না, তবে দেখতে পাচ্ছি অষ্টাদশ শতকের কলকাতায় অনেক বাড়ির দুয়ারেই এই নিশানা,—'অনারেবল কোম্পানি'জ প্রেস'। কসাইটোলার পরে নতুন ঠিকানা তার ৩৭ নম্বর লারকিনস লেন। বলা হয় সরকারী ছাপাখানার দ্বিতীয় সুপরিনটেনডেন্ট ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন, তিনি নাকি দায়িত্ব গ্রহণ করেন ১৭৮৪ খ্রীব্দাব্দে। কিন্তু সে দায়িত্ব কি সরকারী ছাপাখানা চালাবার? নাকি সরকারের অনুমতি নিয়ে 'ক্যালকাটা গেজেট' প্রকাশ করবার? কাগজপত্র দেখলে দ্বিতীয় অনুমানটিই সত্য বলে মনে হয়। লারকিনস লেন ছাড়াও আমরা সরকারী ছাপাখানার ঠিকানা পাচ্ছি ৪ এবং ৮ নম্বর লালবাজার, ৪ এবং ৫ নম্বর এসপ্ল্যানেড রো, ৪ এবং ৬ নম্বর পোস্ট অফিস স্ট্রীট। অষ্টাদশ শতকে এই কয়টি ঠিকানার মধ্যেই ঘোরাফেরা করেছে 'অনারেবল কোম্পানি'জ প্রেস'।

লক্ষ্য করলে দেখা যায় এসব ঠিকানার সঙ্গে 'ক্যালকাটা গেজেট' অফিসের ঠিকানাও কখনও কখনও মিলে যায়। আমরা দেখেছি ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে 'অনারেবল কোম্পানি'জ প্রেস'-এর ঠিকানা ছিল ৩৭ নম্বর লারকিন্স লেন। ওই বছর সেখান থেকেই কিন্তু প্রকাশিত হয় গ্ল্যাডউইন-এর 'ক্যালকাটা গেজেট'। অর্থাৎ গেজেট যেখানে ছাপা হয় সে ছাপাখানা যেমন 'অনারেবল কোম্পানি'জ প্রেস'-এর গৌরবে গৌরবান্বিত, তেমনই গেজেট ছাড়া অন্যান্য ছাপাখানা যেখানে সরকারী কাগজপত্র ছাপা হয় তারাও বুক ফুলিয়ে পরিচয় দেয় 'অনারেবল কোম্পানি'জ প্রেস'। সব দেখে শুনে আমাদের সিদ্ধান্ত এইসব ছাপাখানা সরকারী ছাপাখানা নয়, সরকারের মুদ্রাকরদের

ছাপাখানা মাত্র। মালিক বা পরিচালক তাদের সরকার বাহাদুর নন, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী। তাঁরা কেউ কেউ হয়তো একই সঙ্গে সরকারী কর্মচারী, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। বেনামী ব্যবসা একালে একেবারে অজ্ঞাত নয়। সেকালে, বলতে গেলে, তা ছিল সরকারী কর্মচারীদের আর এক লীলাক্ষেত্র। 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী', সুতরাং স্বয়ং গভর্ণর জেনারেল পর্যন্ত নির্দ্বিধায় তখন মেতে ওঠেন ব্যবসায়ে!

অষ্টাদশ শতকের কোনও 'অনারেবল কোম্পানি'জ প্রেস'-ই যে ষোল আনা সরকারী ছাপখানা ছিল না এই সিদ্ধান্তের পক্ষে সবচেয়ে বড় প্রমাণ লর্ড ওয়েলেসলির একটি প্রস্তাব। তাঁর নির্দেশে তখনকার সরকার ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে একটি স্মারকপত্র রচনা করেন। আলোচ্য বিষয়—সরকারের নিজস্ব ছাপাখানার প্রয়োজনীয়তা। দলিলটিতে দেখানো হয়েছে যেভাবে বাইরে ব্যক্তিগত পরিচালনাধীন ছাপাখানায় সরকারী কাজকর্ম চলছে তাতে সরকারের বেশ লোকসান হচ্ছে। সরকার যদি নিজস্ব ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন তবে নানা বিষয়ে সুবিধা ছাড়াও বছরে কমপক্ষে ১,৪২,৭২৬ টাকা বেঁচে যাবে। তখনকার 'অনারেবল কোম্পানি'জ প্রেস'-গুলো যদি সরকারী ছাপাখানাই হবে তাহ'লে নিশ্চয়ই এসব প্রশ্ন উঠত না। ওয়েলেসলি জানাচ্ছেন অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে সরকার ছাপার কাজে বছরে গড়ে খরচ করছেন ১,৫৬,১১৮ টাকা এবং সে অর্থ যাচ্ছে বেসরকারী মুদ্রাকরদের পকেটে।

ওয়েলেসলির প্রস্তাব মতো সরকার তৎক্ষণাৎ নিজের ছাপাখানা বসাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। বেসরকারী স্বার্থের প্রহরী তখন অনেক। আগেই বলা হয়েছে—একই মানুষ তখন যুগপৎ সরকারী এবং বেসরকারী। সুতরাং, মনে হয় দীর্ঘকাল স্থিতাবস্থাই বজায় ছিল। অর্থাৎ, বিশেষ বিশেষ মুদ্রাকর সরকারের সঙ্গে চুক্তি ক'রে সরকারী মুদ্রাকর হিসাবে নিযুক্ত হতেন। চুক্তির শর্ত মেনে তাঁরা নির্দিষ্টকাল 'অনারেবল কোম্পানি'জ প্রেস'-এর মর্যাদা ভোগ করতেন। তারপর হয়তো সে গৌরব পতাকা চলে যেত অন্য কারও হাতে। সত্যকারের প্রথম সরকারী ছাপাখানা, অতএব, অনেক পরবর্তীকালের ঘটনা।

বি জি প্রেসের ইতিহাস লেখকরা দূর অষ্টাদশ শতকের দিকে ইঙ্গিত করলেও মেনে নেওয়া যায় না—গোপালনগরের এই ছাপাখানার জন্ম আদি হুগলিতে। পুরানো বইপত্রের মুদ্রাকর-পরিচিতিগুলো বরং এই সত্যের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে, বাংলা সরকারের নিজস্ব ছাপাখানা উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি

সময়কার ব্যাপার। অন্তত 'ক্যালকাটা গেজেট' ব'লে বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস চালু হয়েছিল ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে। তার আগে, ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে, অবশ্য আরও একটি সরকারী ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেটি আলিপুরের জেলখানার প্রেস। বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস একসময় ছিল ২৮নং চৌরঙ্গীতে, দীর্ঘকাল ছিল খাস রাইটার্স বিল্ডিংসে। আলিপুরে গোপালনগর রোডে তার নতুন ঠিকানা, সবাই জানেন, ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের ঘটনা।

সুতরাং, এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সত্যকারের সরকারী ছাপাখানা যখন প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতায় তখন অনারেবল কোম্পানির রাজত্ব যায় যায়। আলিপুর জেলের ছাপাখানায় বসতে না বসতে ১৮৫৭'র মহাবিদ্রোহ। তারপর কোম্পানির রাজত্বের অবসান সূচিত ক'রে ভিক্টোরিয়ার ঐতিহাসিক ঘোষণা।

'অনারেবল কোম্পানি'জ প্রেস' লুপ্ত হয়ে গেছে অনেকদিন। কিন্তু মালিকানা সম্পর্কে অস্পষ্টতা থাকলেও ছাপাখানার আদিযুগের ইতিবৃত্তে রয়ে গেছে তাদের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। ওইসব ছাপাখানা যে সেদিন সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বই ছেপেছে তাই নয়, অষ্টাদশ শতকের কলকাতায় মুদ্রণের শ্রেষ্ঠ নমুনাগুলোও ওই মুদ্রাকর-দেরই অবদান। এমনকি বাংলা বই ছাপার ব্যাপারেও সবচেয়ে কৃতী ওঁরাই।

উপসংহারে সেদিনের ছাপার খরচপত্র সম্পর্কে কিছু খুচরো খবর। অষ্টাদশ শতকের কলকাতায় কেমন ছিল ছাপার খরচ? এ সম্পর্কে আমাদের হাতে খুব বেশি তথ্য নেই। যতটুকু আছে তাও বোধহয় শোনার মতো। ১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানির 'প্রথম মুদ্রাকর' জেমস অগস্টাস হিকি সামরিক বাহিনীর যেসব কাগজপত্র ছেপেছিলেন তার জন্য তিনি দাবি করেছিলেন প্রতি পৃষ্ঠা দুটাকা। কাগজের মাপের কোনও উল্লেখ নেই। একই বছরে, চার্লস উইলকিন্‌স-এর ছাপাখানায় ছাপার খরচ ধরা হয়েছে—প্রতি "Quire of Folio Post" ইংরেজী হ'লে প্রতি পৃষ্ঠা ৩ টাকা এবং প্রতি দুই পৃষ্ঠা ৫ টাকা। বাংলা বা ফার্সি হ'লে দর যথাক্রমে ৫ টাকা এবং ৭ টাকা।

মাইনেপত্র কেমন ছিল? বলছি। চার্লস উইলকিন্‌স ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে যে খসড়া পরিকল্পা পেশ করেন তাতে বাংলা এবং ফার্সি কম্পোজিটারদের মাসিক মাইনে ধরা হয়েছিল ৭৫ টাকা, ইংরেজী কম্পোজিটারদের মাইনে ১০০ টাকা। তাছাড়া একজন সর্টার-এর মাইনে ধার্য করা হয়েছিল ২০ টাকা। কর্মীর তালিকায় একজন পণ্ডিত এবং একজন মুনশি (মাইনে মাসে ৩০ টাকা) ছাড়াও ছিলেন ৮ জন 'প্রেসম্যান' এবং একজন 'হ্যাণ্ড প্রেসম্যান'। প্রথম দলের মাস মাহিনা

মাথাপিছু ৭ টাকা এবং দ্বিতীয় জনের ১২ টাকা। বাইণ্ডার চাই একজন। তাঁর মাইনে ১৫ টাকা।

১৮০০ খ্রীস্টাব্দে ওয়েলেসলির পরিকল্পনায় দেখি মাইনের বিন্যাস অন্যরকম। কম্পোজিটারদের মাইনে ২৫ টাকা থেকে ১৫০ টাকার মধ্যে। যোগ্যতা অনুযায়ী মাইনে। নক্শা থেকে ইংরেজী এবং বাংলা ফার্সি কম্পোজিটারের মাইনের তারতম্য বোঝা ভার। তবে দেখতে পাচ্ছি 'হেডপ্রিন্টার'-এর আরও একটি নাম হয়েছে তখন। তিনি একই সঙ্গে 'কারেকটার'। তাঁর মাইনে মাসে ৫০০ টাকা। এক একজন সুপারভাইজারের মাসিক বেতন ধরা হচ্ছে তখন ১৬৭ টাকার মতো।

ছাপাখানায় তখন সুদিন না দুর্দিন সে বিচার করতে পারেন আজকের পরিচালক এবং কর্মীরাই।

বাঙ্গালা ভাষার প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

পাদ্রি মানোএল্-দা-আস্‌সুম্প্‌সাম্‌ বিরচিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' বইখানি কতকগুলি কারণে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এক অতি লক্ষণীয় পুস্তক। (১) ইহা বাঙ্গালা ভাষার প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ; (২) কিঞ্চিদধিক দুই শত বৎসর পূর্বে রচিত বাঙ্গালা গদ্যের প্রাচীন নিদর্শন ইহাতে রক্ষিত হইয়া আছে—বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ইহা অন্যতম আদি পুস্তক; (৩) ইউরোপীয়দের মধ্যে বঙ্গভাষা চর্চার প্রথম যুগে ইহা রচিত—বিদেশীর হাতে বাঙ্গালা রচনার সম্ভবতঃ ইহা প্রাচীনতম নিদর্শন; (৪) বঙ্গভাষায় খ্রীষ্টান ধর্ম বিষয়ক সাহিত্যের ইহা এক আদি গ্রন্থ; (৫) দুই শত বৎসর পূর্বেকার পূর্ববঙ্গের (ঢাকা ভাওয়াল অঞ্চলের) প্রাদেশিক ভাষার সহিত অল্পাধিক মিশ্রিত বাঙ্গালা সাধু ভাষার ইহা সুন্দর নিদর্শন; এবং (৬) রোমান বর্ণমালায় পোর্তুগীস ভাষার উচ্চারণ ধরিয়া লেখা বলিয়া, বাঙ্গালা ভাষার প্রাদেশিক রূপভেদের (তথা পোর্তুগীস ভাষার) উচ্চারণ-তত্ত্বের আলোচনায় এই বই অমূল্য।

পাদ্রি মানোএল্-দা-আস্‌সুম্পসাম্‌ দুই শত বৎসর পূর্বেকার লোক। এখন বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য লইয়া আলোচনা করেন এমন শিক্ষিত বাঙ্গালীকে পাদ্রি মানোএল্‌ ও বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার কৃতিত্ব সম্বন্ধে খবর রাখিতে হয়; এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের সহিত বাঙ্গালী জন-সাধারণের পরিচয় বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে, পাদ্রী মানোএল্-এর নামও সাধারণ্যে প্রচারিত হইবে। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে বাঙ্গালী খ্রীষ্টান-সমাজে পাদ্রি মানোএল্-এর বইয়ের কিছু প্রচার ছিল, এবং তাঁহার নাম অন্ততঃ খ্রীষ্টান-সমাজে অনেকে জানিত, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। উনবিংশ শতাব্দের চতুর্থ দশক পর্যন্ত পাদ্রি মানোএল্-এর নাম কতকটা সুপরিজ্ঞাত ছিল, তাহা ১৮৩৬ সালে 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এর দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ হইতে বুঝা যায়। তার পরে এই লেখক ও তাঁহার পুস্তকের কথা বাঙ্গালী পাঠক-সমাজে ধীরে ধীরে চাপা পড়িয়া গেল। পাদ্রি মানোএল্‌ দুইখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, একখানি হইতেছে খ্রীষ্টান ধর্মের ব্যাখ্যান বিষয়ক 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ', ও অন্যখানি হইতেছে বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ সমেত বাঙ্গালা ও পোর্তুগীস এবং পোর্তুগীস ও বাঙ্গালা শব্দ-সংগ্রহ। বই দুইখানিই এখন দুষ্প্রাপ্য

বা অপ্রাপ্য হইয়া গিয়াছে বলিতে পারা যায়। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এর দুইখানি মাত্র প্রতির অস্তিত্বের কথা জানা গিয়াছে—একখানি খণ্ডিত প্রতি কলিকাতায় রয়াল-এশিয়াটিক-সোসাইটি-অভ্-বেঙ্গল-এর পুস্তকাগারে আছে, আর একখানি আছে, পোর্তুগালে লিসবন শহরের জাতীয় গ্রন্থাগারে। পাদ্রি মানোএল্-এর অভিধান বা শব্দ-সংগ্রহের একখানি প্রতি লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মের পুস্তকাগারে আছে, অন্যখানি আছে লিস্‌বনের জাতীয় গ্রন্থশালায়। এতদ্ভিন্ন, পোর্তুগালের এভোরা-নগরীর প্রাচীন গ্রন্থ-সংগ্রহে পাদ্রি মানোএল্-এর দুইখানি বইয়ের কিয়দংশ করিয়া হস্ত-লিখিত পুথির আকারে মিলিতেছে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন আমাদের জানাইয়াছেন যে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে "গোয়ার সন্নিহিত মারগাঁও সহরে "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" তৃতীয় বার মুদ্রিত হয়" (পৃ. ১৷৵০, প্রস্তাবনা, 'ব্রাহ্মণ রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৭)। এই তৃতীয় সংস্করণ তিনি দেখেন নাই—ইহা রোমান অক্ষরে কি বাঙ্গালা অক্ষরে তাহা আমরা জানি না ; এই তৃতীয় সংস্করণের একখানি মাত্র প্রতি লিস্‌বনের জাতীয় গ্রন্থাগারে আছে। গোয়ায় ছাপা—অতএব রোমান অক্ষরে হইবার সম্ভাবনা ; এবং এই কারণে এই তৃতীয় সংস্করণ বঙ্গদেশে সম্ভবতঃ প্রচারলাভ করে নাই।

ধীরে ধীরে বাঙ্গালী পাঠক পাদ্রি মানোএল্-এর এই দুইখানি বইয়ের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। ১৯০৩ সালে স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন তাঁহার নব-আরব্ধ *Linguistic Survey of India*-র বাঙ্গালা-ভাষা-বিষয়ক খণ্ডে পাদ্রি মানোএল্-এর অভিধান সম্বন্ধে উল্লেখ করেন (পৃ. ২৩, *Linguistic Survey of India*, Vol. V. Part I)। তৎপরে জেসুইট-সম্প্রদায়ের পণ্ডিত, কলিকাতার সেণ্ট-জেভিয়ার্স্ কলেজের অধ্যাপক Father Hosten পাদ্রি হস্টেন, বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে (১৯১১—১৯১৪ সালে) পাদ্রি মানোএল্-এর বই সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া, বাঙ্গালা দেশের ইতিহাসানুসন্ধিৎসু পাঠক-সমাজের সমক্ষে বই দুখানিকে পুনঃপরিচিত করিয়া দেন। কলিকাতার এশিয়াটিক-সোসাইটির পুস্তকাগারে 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' গ্রন্থখানির খণ্ডিত প্রতিটীর অবস্থানের কথা পাদ্রি হস্টেন সাহেব আমাদের প্রথম জানাইয়া দেন। তদনন্তর দুই একজন বাঙালী সাহিত্যালোচকের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয় - ঢাকার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এবং বর্তমান লেখক কর্তৃক ১৩২৩ সালের (১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের) 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় এই বই সম্বন্ধে দুইটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—এশিয়াটিক-সোসাইটির প্রতিখানি অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এই বইয়ের একটী সাহিত্যিক পরিচয়

দেন, এবং আমি এই বইয়ের ভাষা ও ইহার রোমান বর্ণবিন্যাস ধরিয়া এই ভাষার উচ্চারণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করি। ১৯১৯ সালে লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পাদ্রি মানোএল্-এর বাঙ্গালা-পোর্তুগীস শব্দকোষ ও ব্যাকরণ দেখি, এবং .৯২২ সালে বইয়ের ব্যাকরণ-অংশের একটা পুরা অনুলিখন শব্দ-সংগ্রহের আংশিক অনুলিখন ও শব্দ-সংগ্রহের আংশিক অনুলিখন করিয়া আনি। এই অনুলিখন, শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়-কৃত বঙ্গানুবাদের সহিত এবং আমার লিখিত প্রবেশকের সহিত ১৯৩১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আমরা প্রকাশিত করি। ১৯১৯ সালে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে তাঁহার *Bengali Literature in the Nineteenth Century* বইয়ে পাদ্রি মানোএল্এর সাহিত্য-চেষ্টা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার ১৯১৭ সালে প্রকাশিত তাহার 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' গ্রন্থে পাদ্রি মানোএল্-এর শব্দ-সংগ্রহের নামপত্রের একটী চিত্র দেন (প্রথম ভাগ, পৃ. ১৭)। ১৯২৬ সালে প্রকাশিত মৎপ্রণীত *Origin and Development of the Bengali Language* গ্রন্থে আমি বাঙ্গালা ধ্বনি তত্ত্ব ও ব্যাকরণের আলোচনা সম্পর্কে আবশ্যক মত পাদ্রি মানোএল্-এর বই দুইখানির উল্লেখ করি। এই ভাবে বলিতে পারা যায় যে, কুড়ির শতকের প্রথম পাদে পাদ্রি মানোএল্ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন।

পাদ্রি মানোএল্-এর আগমন ঘটিয়াছিল, বাঙ্গালা দেশে পোর্তুগীস বণিক্ এবং সঙ্গে সঙ্গে পোর্তুগীস-জাতীয় রোমান-কাথলিক খ্রীষ্টান ধর্ম-প্রচারকদের প্রতিষ্ঠার ফলে। ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-দা-গামার নেতৃত্বে পোর্তুগীসেরা প্রথম ভারতে পদার্পণ করে—আফ্রিকার দক্ষিণে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া, মালাবার বা কেরল দেশে কালিকট নগরে তাহারা জাহাজে করিয়া উপস্থিত হয়। ১৫১০ সালে তাহারা গোয়া দখল করিয়া সেই স্থানে ভারতে নিজেদের প্রধান কেন্দ্র গঠন করে। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে বাণিজ্য-ব্যপদেশে তাহারা প্রথম দক্ষিণ-ভারত হইতে বাঙ্গালায় আগমন করে। ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশের আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ-বিগ্রহে তাহারা লিপ্ত হইয়া পড়ে। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ হইতে সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত পোর্তুগীসেরা বঙ্গদেশে ও বঙ্গোপসাগরে বিশেষ দুর্ধর্ষতার সঙ্গে অবস্থান করিত —এবং ষোড়শ শতকের শেষ পাদ হইতেই পোর্তুগীস ক্ষমতার বৃদ্ধি হইলে পরে, পোর্তুগীস পাদ্রিরা ধর্মপ্রচারের চেষ্টায় এদেশে আসিতে আরম্ভ করেন। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই পোর্তুগীস পাদ্রিরা বাঙ্গালা শিখিয়া পোর্তুগীস হইতে বাঙ্গালা ভাষায় রোমান কাথলিক ধর্ম সংক্রান্ত বই অনুবাদ করিতে লাগিয়া যান। এই

অনুবাদ গ্রন্থগুলিকে বাঙ্গালা ভাষায় খ্রীষ্টান সাহিত্যের ভিত্তি-স্বরূপ বলা যায় — কিন্তু এগুলি এখন অপ্রাপ্য, বোধ হয় চিরতরে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সপ্তদশ শতক পোর্তুগীস ধর্মপ্রচারকদের বিশেষ প্রতিষ্ঠার যুগ ছিল। সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভে হুগলী ও ঢাকায় পোর্তুগীস পাদ্রিদের বড় বড় কেন্দ্র গঠিত হয়। ঢাকায় ভাওয়ালে বহু দেশীয় ও মিশ্র খ্রীষ্টানে বসতি হয়। যেখানে যেখানে সম্ভব হইয়াছে, পাদ্রিরা বড় বড় গির্জা তুলিয়া গিয়াছেন। ষোড়শ শতকে এই পাদ্রীদের দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার মাধ্যমে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের যে বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায়।

উপস্থিত ক্ষেত্রে বাঙ্গালা দেশে পোর্তুগীস বণিক্ সৈনিক ও পাদ্রিদের ক্রিয়া-কলাপ লইয়া আলোচনার আবশ্যকতা নাই। পাদ্রি হস্টেন সাহেবের প্রবন্ধে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রবন্ধে. অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন ও আমার সম্পাদিত পাদ্রি মানোএল্-এর বাঙ্গালা ব্যাকরণের প্রবেশকে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ'-এর প্রস্তাবনায়, এবং J. J. A. A. Campos কর্তৃক লিখিত *History of the Portuguese in Bengal* (Calcutta 1919) গ্রন্থে ও এতদ্বিষয়-সম্পৃক্ত প্রবন্ধে ও গ্রন্থে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

দোমিনিক-দে-সুজা Dominic de Souza নামে একজন পোর্তুগীস পাদ্রি ১৫৯৯ সালের পূর্বে এই একখানি খ্রীষ্টানী বই বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন। ইহার পূর্বে অন্য কোনও অনুবাদক বা পাদ্রি লেখকের কথা আমরা জানি না। তাহার পরের খবর যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতেছে যে, দোম্ আন্তোনিও Dom Antonio নামে একজন দেশী (বাঙ্গালী) খ্রীষ্টান, হিন্দুদের মধ্যে খ্রীষ্ট-ধর্ম প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে, 'ব্রাহ্মণ-রোমান-কাথলিক-সংবাদ' নামে একখানি বই রচনা করেন। এই দোম্ আন্তোনিও ভূষণার রাজকুমার ছিলেন, ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মগেরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া আরাকানে লইয়া যায়, কিন্তু জনৈক পোর্তুগীস পাদ্রি তাঁহাকে খালাস করিয়া আনেন ও পরে তিনি খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষা নেন। তিনি সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতকের শেষ পাদে খ্রীষ্টান ধর্মগুরুদের নির্দেশ অনুসারে বইখানি লিখিয়া থাকিবেন। দোম্ আন্তোনিও-র সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য জানা যায় তাহা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেনের প্রস্তাবনায় পাওয়া যাইবে। দোম্ আন্তোনিও-র বই বাঙ্গালা দেশে পোর্তুগীস পাদ্রিদের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ১৬৯৫ সালের ভূষণার অন্তঃপাতী কোষাভাঙ্গা হইতে ঢাকার ভাওয়াল পরগণার নাগরী গ্রামে পোর্তুগীস পাদ্রিদের কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়। ঐ সময়ে দোম্ আন্তোনিও-র বইও

ভাওয়ালে নীত হইয়া থাকিবে। সম্ভবতঃ ১৭২৬ সালের পরে, দোম্ আন্তেনিও-র বই মুদ্রণ ও প্রকাশনের জন্য পোর্তুগালে পাঠানো হইয়াছিল, মুদ্রণের উদ্দেশ্যে রোমান লিপিতে ঐ বইয়ের অক্ষরান্তর করা হইয়াছিল, পাদ্রি মানোএল্ তাহার আদেশে পোর্তুগীস ভাষায় লিখেন, কিন্তু কোনও কারণে ঐ বই এতাবৎ মুদ্রিত হয় নাই, বইয়ের পাণ্ডুলিপি পোর্তুগালের এভোরা-নগরীর পুস্তকাগারে পড়িয়া ছিল,—অবশেষে ১৯৩৭ সালে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় এই বইয়ের মূল বাঙ্গালা অংশ রোমান অক্ষরে বাঙ্গালা অক্ষরান্তরীকরণ সমেত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

পোর্তুগীস রোমান-কাথলিক পাদ্রিদের দৃষ্টান্তে ও অনুপ্রেরণায় সৃষ্ট সাহিত্য পরম্পরা মধ্যে দোম্ আন্তেনিও-র এই বইয়ের পরে আমরা পাই পাদ্রি মানোএল্-দা আস্‌সুম্প্‌সাম্-এর পুস্তকদ্বয়। তাঁহার ব্যাকরণ ও শব্দ-সংগ্রহ, প্রথম সংস্করণ ধরিয়া ইতিপূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে (ব্যাকরণখানি সম্পূর্ণ, শব্দ-সংগ্রহ আংশিক ভাবে)। এক্ষণে তাঁহার 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' পুস্তক, মূল প্রথম সংস্করণ অবলম্বন করিয়া, রোমান লিপিতে ও বাঙ্গালা প্রতিবর্ণীতকরণে, এবং টীকা টিপ্পনী সমেত, "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা"য় পুনঃপ্রকাশিত হইল।

পাদ্রি মানোএল্ সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই কথা বলিয়া, বইখানির অল্প স্বল্প আলোচনা করিব। ইঁহার জীবনের কথা বিশেষ কিছুই জানা যায় না। কোথায়, কবে, কোন্ বংশে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, কবে, কি ভাবে তিনি ভারতে আসেন, এ-সব খবর কোথাও উল্লিখিত পাওয়া যায় নাই। ১৭৩৪ সালে তিনি ভাওয়ালে বসিয়া তাঁহার 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন; তখন তিনি (পূর্ব-ভারতের মণ্ডলীভুক্ত) অগস্তীনীয় সম্প্রদায়ের সাধু ছিলেন (Religioso Eremita de Santo Agostinho da Congregagno [da India Oriental]), এবং বাঙ্গালা দেশে সিদ্ধ নিকোলাস-দে-তোলেন্তিনোর নামের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রচার-কেন্দ্রের পরিচালক ছিলেন। (Reitor da Missao de S. Nicolao de Tolentino em Bengolla)। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলায় ব্যাণ্ডেল নগরে অবস্থিত অগস্তীনীয় মঠের অধ্যক্ষ হিসাবে তাঁহার নাম পাওয়া যায়। ১৭৩৪—১৭৫৭ এই দুই তারিখের পূর্বের কোনও সংবাদ তাঁহার সম্বন্ধে পাওয়া যায় নাই। তাঁহার জীবনের এইটুকু মাত্র আমরা জানিতে পারিয়াছি। তাঁহার 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এর বাঙ্গালা দেখিয়া, ও তাঁহার শব্দ-সংগ্রহের ভূমিকা পাঠ করিয়া মনে হয় যে, তিনি বিদেশ হইতে—পোর্তুগাল হইতেই—বাঙ্গালা দেশে আসিয়া থাকিবেন।

রয়াল-এশিয়াটিক-সোসাইটি-অভ্-বেঙ্গল-এ রক্ষিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' পুস্তকখানি খণ্ডিত ; সোসাইটির এই পুস্তকে নিম্ন-লিখিত পত্রগুলি নাই : পৃ. ৩৩—৩৪, ৩৫—৩৬, ৩৭—৩৮, ৩৯—৪০, ৪১—৪২, ৪৩—৪৪, ৪৫—৪৬, ৪৭—৪৮ ; পৃ. ১৫৫—১৫৬, ১৫৭—১৫৮ ; পৃ. ৩২১—৩২২, ৩২৩—৩২৪, ৩২৫—৩২৬, ৩২৭—৩২৮, ৩২৯—৩৩০, ৩৩১—৩৩২, ৩৩৩—৩৩৪, ৩৩৫—৩৩৬ ; পৃ. ৩৭১—৩৭২, ৩৭৩—৩৭৪ ; ৩৮০ পৃষ্ঠায় সোসাইটির অসম্পূর্ণ পুস্তক সমাপ্ত। ইহার অতিরিক্ত মূল পুস্তকে আছে, পৃ. ৩৮১—৩৮২, পৃ. ৩৮৩ (এই পৃষ্ঠাগুলির মধ্যে বিজোড় সংখ্যার পৃষ্ঠায় আছে পোর্তুগীস, জোড়-সংখ্যার পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা) ; ৩৮৩ পৃষ্ঠায় বইখানির সমাপ্তি। তদনন্তর পৃ. ৩৮৪টী খালি পৃষ্ঠা, ও পৃ. ৩৮৫---৩৯১-এ কেবল পোর্তুগীস ভাষায় বইয়ের মধ্যে যে ৬১টী উপাখ্যান আছে, সেই উপাখ্যানগুলির সূচীপত্র মুদ্রিত হইয়াছে, সূচীতে এই উপাখ্যানগুলির পোর্তুগীস মূলের পৃষ্ঠসংখ্যার উল্লেখ আছে। সোসাইটির পুস্তকে যে পত্রগুলির অভাব আছে, শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় বিশেষ অর্থব্যয় করিয়া এভোরার পুস্তকাগারে রক্ষিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এর পূর্ণাঙ্গ প্রতিটী হইতে সেগুলিকে নকল করাইয়া আনান ; এই নকল হইতে পূরণ করিয়া, সম্পূর্ণ 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' (কেবল বাঙ্গালা অংশ) "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা"য় মুদ্রিত হইয়াছে।

মূল বইখানি ছোট আকারের—পৃষ্ঠাগুলির মুদ্রিত অংশের পরিমাপ ৫ ইঞ্চি × ৩ ইঞ্চি। ৩৮৩ বা ৩৮৪ পৃষ্ঠায় মূল বইখানি সমাপ্ত ; ইহার অর্ধেক লইয়া বাঙ্গালা—১৯২ পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা অংশ। বইখানি দুই 'পুথি' বা দুই খণ্ডে বিভক্ত : 'পুথি' ১—পৃ ৩১২ পর্যন্ত ; 'পুথি' ২—বাকী অংশ লইয়া। প্রত্যেক 'পুথি' আবার কতকগুলি 'তাজেল' বা অধ্যায়ে বিভক্ত। 'পুথি' ও 'তাজেল'-এর বিষয়-বস্তু নিম্নে নির্দিষ্ট হইল—

পুথি ১—সকল (পড়)নের অর্থ, এবং পৃথক্ পৃথক্ বুঝান।

তাজেল ১—সিদ্ধি ক্রুশের অর্থভেদ।

তাজেল ২—'পিতার পড়ন'; এবং তাহার অর্থ।

তাজেল ৩—'প্রণাম মরিয়া' আর তাহার অর্থ, আর 'নিস্তার বাণী'।

তাজেল ৪—'মানি সত্য নিরঞ্জন', আস্থার চৌদ্দ ভেদ, এবং তাহাদিগের অর্থ।

তাজের ৫—দশ আজ্ঞা, এবং তাহাদিগের অর্থ।

তাজেল ৬—পাঁচ আজ্ঞা, এবং তাহাদিগের অর্থ।

তাজেল ৭—সাত সাক্রামেন্তোস্, এবং তাহাদিগের অর্থ।

পুথি ২—পড়ন শাস্ত্র সকল আর যে উচিত জানিতে, স্বর্গে যাইবার।

তাজেল ১—আত্মার ভেদ বিচার, সত্য করিয়া শিখিবার, শিখাইবার, উপায় তরিবার।

তাজেল ২—পড়ন-শাস্ত্র নিরালা।

এই বইয়ে মোটামুটি রোমান-কাথলিক ধর্মের ধর্মবীজ, মূল বিশ্বাস সমূহ এবং অনুষ্ঠান-সমূহের ব্যাখ্যা আছে। ব্যাখ্যাকে বিশদ করিয়া দিবার জন্য কতকগুলি (৬১টী) ধর্মমূলক উপাখ্যানও বইয়ে দেওয়া হইয়াছে।

মূল পোর্তুগীস বইখানি পাদ্রি মানোএল্-এর লিখিত কি না তাহা জানা যায় না। আমাদের মনে হয়, এই বই পোর্তুগালে বহুল প্রচারিত খ্রীষ্টান ধর্মবিষয়ক কোনও পুরাতন বই হইবে। বইটীর প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলা এক্ষেত্রে অবান্তর। তবে এইটুকু বলা যায় যে, ধর্মমত বা অনুষ্ঠানের সত্যতা বা ঔচিত্য সংস্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে যে উপাখ্যানগুলি দেওয়া হইয়াছে, বহু স্থলে সেগুলিতে বিশ্বাস করা শিশুজনোচিত সরল মনোভাব না হইলে সম্ভব হয় না। বিশ্বাসী জনের উচিত জোর ভাষায় নিজ বিশ্বাস প্রকট করা ছাড়া, বিচার বা যুক্তির বিশেষ কিছু এইরূপ বইয়ে আশা করা যায় না। যাহারা খ্রীষ্টান পৌরাণিক কাহিনীতে বিশ্বাস করে, তাহাদের নিজ বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যেই বইখানি লিখিত।

আমাদের কাছে এখন 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' পুস্তকের উপযোগিতা হইতেছে বাঙ্গালা ভাষার পুরাতন গদ্যের নিদর্শন হিসাবে, এবং রোমান অক্ষরে লিখিত বলিয়া পুরাতন বাঙ্গালার উচ্চারণ-নির্দেশক পুস্তক হিসাবে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রবন্ধে (১৩২৩ সাল, তৃতীয় সংখ্যা, পৃ. ১৯৭—২১৭) এ বিষয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি; এবং আমাদের সম্পাদিত পাদ্রি মানোএল্-এর ব্যাকরণের ভূমিকাতেও এ বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যাইবে। সে বিষয়ের পুনরবতারণা করিব না; জিজ্ঞাসু পাঠকগণকে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র প্রবন্ধ এবং এই বইয়ের টীকা-টিপ্পনী অংশ দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

পাদ্রি মানোএল্-এর বাঙ্গালা যে বিদেশীর রচিত বাঙ্গালা সে বিষয়ে যথে প্রমাণ তাঁহার রচনা-শৈলীর মধ্যেই বিদ্যমান। চারিটী কারণে তাঁহার রচনা খুব ভাল হইতে পারে নাই; (১) তিনি বিদেশী, খুব ভাল ভাষা দখল করা তাঁহার হয় নাই; মনে হয়, তিনি মৌখিক অভ্যস্ত ছিলেন, সাধু-ভাষা বা সাহিত্যের ভাষায় তাঁহা (২) তখনকার দিনে সাধু গদ্যের বই ছিল না বলিলেই ২ পাদ্রি মানোএল্‌কে অনেকটা নিজেই পথ কাটিয়া চলিতে হইয়

আদর্শ তাঁহার সমক্ষে না থাকায়, তাহাকে লাতীন ও পোর্তুগীসের (বিশেষতঃ মূল গ্রন্থের ভাষা পোর্তুগীসের) আদর্শ বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইহার ফলে তাঁহার ভাষায় বহু স্থলে ফিরিঙ্গিয়ানা আসিয়া গিয়াছে—বিশেষ করিয়া বাক্য-রীতিতে। (৩) তখন সাধু গদ্যে বেশী বই লেখা না হইলেও, পত্রাদিতে এক রকম সাধু বাঙ্গালা গদ্যের শৈলী দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পাদ্রি মানোএল্ ঢাকা ভাওয়াল অঞ্চলের কথ্য ভাষা নিশ্চয়ই ভাল করিয়া জানিতেন, সেই জন্য তাঁহার রচনায় কথ্য ভাষার প্রভাব এত বেশী পড়িয়াছে যে তাঁহার ব্যবহৃত বাঙ্গালাকে ঢাকার কথ্য ভাষার সহিত মিশ্রিত সাধু গদ্য বলিতে হয়। ভূষণার রাজপুত্র দোম্ আন্তোনিও-র ভাষা সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যায়। (৪) বহু স্থলে সম্পূর্ণ নূতন বিষয়ের অবতারণা করিতেছেন বলিয়া পাদ্রি মানোএল্-কে রোমান-কাথলিক ধর্মমত ও অনুষ্ঠান সম্পর্কে উপযুক্ত পরিভাষার জন্য বেগ পাইতে হইয়াছিল। তিনি সাধু-ভাষা ও আনুষঙ্গিক ভাবে সংস্কৃতের শব্দাবলীর ও ধাতু-প্রত্যয়াদির সহিত তেমন পরিচিত ছিলেন না বলিয়া পারিভাষিক শব্দের জন্য চল্‌তি বাঙ্গালা শব্দের সাহায্যই তাঁহাকে বেশীর ভাগ লইতে হইয়াছিল। Sancta Mater Ecclesia—সমস্ত খ্রীষ্টান সঙ্ঘ বা সম্প্রদায়, খ্রীষ্টান জনগণের আধ্যাত্মিক জীবনের রক্ষয়িত্রী মাতা রূপে কল্পিত হইয়া, লাতীনে এই নামে অভিহিত হয়—ইংরেজীতে Holy Mother Church, পোর্তুগীসে Santa Madre Igreja: পাদ্রি মানোএল্ (অথবা তাঁহার পরগামী অন্য কোনও পাদ্রি ?) ইহার বাঙ্গালা করিলেন—"সিদ্ধী মাতা ধর্মঘর (সিদ্ধা—পুংলিঙ্গ শব্দ, স্ত্রীলিঙ্গে সিদ্ধী)"। এইরূপ অনুবাদের চেষ্টা লক্ষণীয়; ভাষার পুঁজী যেটুকু তাঁহাদের হাতে আসিয়াছিল, তাহা লইয়া এই পাদ্রিরা যতটা সম্ভব খ্রীষ্টান ধর্মমত বাঙ্গালায় বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষায় রোমান-কাথলিক খ্রীষ্টান পরিভাষার পত্তন করিয়া গিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদের পরিশ্রম সাধুবাদের যোগ্য। বাধ্য হইয়া, উপযুক্ত শব্দ না জানায় বা না পাওয়ায়, তাঁহারা দুই চারি স্থানে লাতীন বা পোর্তুগীস শব্দ রাখিয়াছেন; যেমন "ইস্পিরিতো সান্তো, কন্‌ফেসার, ক্রুশ, বিস্‌পো" প্রভৃতি। কিন্তু মোটের উপর, বাঙ্গালী খ্রীষ্টানের ধর্মকার্যে তাহার মাতৃভাষা ব্যবহার করিবার কালে, সেই ভাষাকে যথাসাধ্য 'স্বদেশী' রাখিবার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য তাঁহাদের ছিল।

বাক্য রীতির অসঙ্গতি পাদ্রি মানোএল্-এর ভাষার প্রধান দোষ; ইহা পদে পদে পাওয়া যাইবে। পোর্তুগীস পাদ্রিদের বাঙ্গালায় গোয়ার কোঙ্কণী ভাষার প্রভাবের কথা আমি সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকায় ১৩২৩ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধে

উল্লেখ করিয়াছি। তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। কিন্তু পুস্তকে ব্যবহৃত সাধারণ শব্দ বিষয়ে, পাদ্রি মানোএল্-এর বাঙ্গালায় যে তখনকার দিনের ঢাকা-অঞ্চলে প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষার একটা সত্যকার প্রতিচ্ছায়া মিলিতেছে সে বিষয় সন্দেহ নাই। মুসলমান শাসনের যুগে যাহা হওয়া স্বাভাবিক—আরবী-ফারসী শব্দও বেশ আছে। সংস্কৃত সাধু ভাষার প্রভাব কথ্য ভাষায় ততটা যায় নাই, সেইজন্য প্রচলিত খাঁটী বাঙ্গালা ও অর্ধতৎসম শব্দ এবং সমাস যথেষ্ট আছে।

পাদ্রি মানোএল্-এর বাঙ্গালা সবচেয়ে বেশী স্ফূর্ত হইয়াছে তাঁহার উপাখ্যান-গুলিতে। এই উপাখ্যানগুলির সম্বন্ধে বলিতে পারা যায় যে, মোটের উপরে বেশ প্রাঞ্জল প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট সহজ-বোধ্য বাঙ্গালা তিনি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার বাক্য-রীতিতে স্থলে স্থলে স্খলন হইলেও, এবং পোর্তুগীসের প্রভাব দেখা দিলেও, তিনি যে বেশ সাবলীল ভঙ্গীতে তাঁহার উপাখ্যানগুলি শুনাইয়া গিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কতকগুলি উপাখ্যান সরল বাঙ্গালা গদ্যের নমুনা হিসাবে ধরা যাইতে পারে—অবশ্য তখনকার দিনের শব্দাবলী সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হইতে হইবে।

বাঙ্গালা ভাষার গদ্য-সাহিত্যের এক প্রধান ও লক্ষণীয় পুরাতন নিদর্শন বলিয়া এই বই হিন্দু-মুসলমান খ্রীষ্টান নির্বিশেষে সকল বাঙ্গালীর আদরের হওয়া উচিত। বাঙ্গালা গদ্যের উৎপত্তি ও বিকাশ চর্চা করিতে গেলে, পাদ্রি মানোএল্-এর 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'কে বাদ দিতে পারা যায় না। এবং বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন গদ্য লেখকগণের মধ্যে অন্যতম বলিয়া, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে পাদ্রি মানোএল্-দা-আসসুম্পসাম্ সমস্ত বাঙ্গালী জাতির কৃতজ্ঞতা ও সম্মানের পাত্র।

এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ বঙ্গাক্ষরে ফরাসী পাদ্রি "জাকবছ ফাঁছিসকস মারিয়া গেরে" ((Jacobus Franciscus Maria Gnerin) ১৮৩৬ সালে শ্রীরামপুরে ছাপাইয়া চন্দননগর হইতে প্রকাশিত করেন। ফরাসীতে এই দ্বিতীয় সংস্করণের নামপত্র এইরূপ:—CATECHISME | SUIVI | DE TROIS DIALOGUES | ET DE LA LISTE | DES ECLIPSES DE SOLEIL ET DE LUNE | CALCULEES POUR LE BENGALE | A PARTIR DE 1836 JUSQU'EN 19 0 INCLUSIVEMENT. | NOUVELLE EDITION, REVUE ET CORRIGEE | কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ। | সূর্য্যের আর চন্দ্রের গ্রহণ গণনার সহিত ১৪০ বৎসরের—আরম্ভ ১৮৩৬ সাল অবধি | সহর চন্দননগর | এবং সমস্ত

বাঙ্গালা দেশের নিমিত্তে। | করিয়াছেন জাকবছ্ ফাঁছিসকস্ মারিয়া গেরে | চন্দননগরের সর্ব্বগ্রাহের পাদরী | নিয়োজিত প্রেরিতসম্পর্কীয় এবং ধর্ম্মাত্মার সভাস্থ | দ্বিতীয় বার এবং শুদ্ধরূপে | শ্রীরামপুরে মুদ্রাঙ্কিত হইল। | সন ১৮৩৬।

এই সংস্করণের নামপত্র হইতেই ইহার ভাষার নমুনা দেখা যায়। ইহার লাতীন ভূমিকায় পাদ্রি মানোএল্ যে এই বই প্রথম ১৭৩৫ সালে রচনা করেন এবং লিস্‌বন হইতে এই বই যে প্রথম প্রকাশিত হয়—ভূমিকায় ভ্রমক্রমে ছাপার তারিখ ১৭৪৩ স্থলে ১৭৬৩ দেওয়া হইয়াছে—তাহার উল্লেখ আছে। কোনও কোনও স্থানে এই নূতন সংস্করণে শুদ্ধ করিবার চেষ্টা আছে, লাতীন Sanctus, Sancta, Sanctum,, পোর্তুগীস Santo, Santa এবং ইংরেজী Saint এর অনুবাদ পাদ্রি মানোএল্-এর বইয়ে আছে "সিদ্ধা, সিদ্ধী" ; পাদ্রি গেরে তাহা কাটিয়া করিয়া দিয়াছেন "শুদ্ধ"। "অর্থভেদ" Orth bhed শব্দ শুদ্ধ করিয়া এই সংস্করণে "অর্থবেদ" করা হইয়াছে ; "অর্থবেদ" মানে কি হয় জানি না ; "অর্থভেদ" কিন্তু সার্থক শব্দ, "অর্থের ব্যাখ্যা" অর্থে। ১ হইতে ৫৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত "কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ" ; মাত্র এই অংশকে পাদ্রি মানোএল্-এর বইয়ের সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ বলা যায়। উপাখ্যানগুলির প্রায় সব কয়টি ইহা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। তদনন্তর ৫৮ হইতে ৬২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মুসলমান মত খণ্ডন, ৬২ পৃষ্ঠা হইতে ৬৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত হিন্দু মত খণ্ডন, ৬৬ পৃষ্ঠা হইতে ৯৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত খ্রীষ্টান গুরু-কর্তৃক খ্রীষ্টধর্মান্তরিত মুসলমান ও হিন্দু শিষ্যদ্বয়কে খ্রীষ্টান জগতের ইতিহাস কথন ও রোমান কাথলিক ধর্মের প্রাধান্য ও মহিমা কীর্তন ; পৃঃ ৯৮-৯৯তে এক হিন্দু দৈবজ্ঞের সহিত এই গুরুর বাদ, এবং ৯৯-১২৫ পৃষ্ঠা সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের গণনা।

বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংলা অভিধান

সজনীকান্ত দাস

এখন পর্য্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের গবেষণার ফলে যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে পাদ্রি মানোএল-দা-আস্‌সুম্পসাউঁ রচিত *Vocabulario Em Idioma Bengalla, E Portuguez* নামক পুস্তককেই সর্ব্বপ্রথম বাংলা শব্দ-সংগ্রহ বা অভিধান বলা যাইতে পারে। এই পুস্তক ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ও ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পোর্ত্তুগালের রাজধানী লিসবন নগরে Francisco Da Sylva-র ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়াছিল। বইটি সম্পূর্ণ রোমান হরফে ছাপা। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে বিখ্যাত চার্লস উইলকিন্স সর্ব্বপ্রথম নিজে ছেনি কাটিয়া বাংলা হরফ ঢালাই করেন। নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড কর্ত্তৃক ইংরেজীতে লিখিত বাংলা ব্যাকরণ *A Grammar of the Bengal Language* নামক পুস্তকে সেই হরফ প্রথম ব্যবহৃত হয়। পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতেই সম্পূর্ণ বাংলা অক্ষরে কয়েকটি আইনের পুস্তক মুদ্রিত হয়। ইউরোপীয়গণ কর্ত্তৃক বাংলা এবং দেশীয়গণ কর্ত্তৃক ইংরেজী শিক্ষার সেই প্রথম যুগে ইংরেজী বাংলা এবং বাংলা ইংরেজী শব্দসংগ্রহ (vocabulary) বা অভিধানও প্রস্তুত হইবার কথা। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আমরা এতদিন পর্য্যন্ত ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে মুদ্রিত কোনও অভিধানের সন্ধান পাই নাই। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে হেনরী পিট্‌স ফরষ্টার ('Senior Merchant on the Bengal Establishment') প্রণীত *A Vocabulary, in two parts, English and Bengalee, and Vice Versa* নামক পুস্তকের প্রথম খণ্ড (ইংরেজী হইতে বাংলা) কলিকাতার 'Ferris and Co.'র প্রেসে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। পুস্তকের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ii+XX+421। ইহারই দ্বিতীয় খণ্ড (বাংলা ইংরেজী) উপরোক্ত প্রেস হইতে ১৮০২ সালে প্রকাশিত হয়; পৃষ্ঠা-সংখ্যা 443+IX। লঙ্‌ সাহেবের মতে এই পুস্তকে প্রায় ১৮০০০ বাংলা শব্দ আছে। (*A Descriptive Catalogue of Bengali Books*, p. 2)। এতদিন পর্য্যন্ত বাংলা হরফে মুদ্রিত অভিধানগুলির মধ্যে এই পুস্তকটিই আদিমতম বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। ফরষ্টার সাহেবের নিজেরও ধারণা ছিল যে, তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন এবং পরবর্ত্তী অভিধানকারেরাও (যথা উইলিয়ম কেরী—১৮১৫-২৫, রামকমল সেন—

১৮১৭-৩৪, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী—১৮২৭, জন মেণ্ডিস—১৮২৮, জি. সি. হটন—১৮৩৩ প্রভৃতি) তাঁহাকেই এই সম্মান দিয়াছেন ; ফলে এখন পর্য্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যতগুলি ইতিহাস রচিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিতেই ফষ্টারকৃত অভিধানটিই বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত সর্ব্বপ্রথম অভিধান বলিয়া উল্লিখিত হয়।

এখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলা ও ইউরোপীয় ভাষায় অভিধান সঙ্কলনের চেষ্টার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পুরাতন পুস্তক ও পত্রিকাদি পড়িতে পড়িতে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্কল্পের পরিচয় মাত্র পাওয়া গিয়াছে, সেই সকল কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল কি না, তাহার প্রমাণ নাই। ডক্টর স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার ***The Origin and Development of the Bengali Language*** পুস্তকের ১ম খণ্ডের ২৩৪ পৃষ্ঠায় Augustin Aussant প্রণীত ফরাসী-বাংলা শব্দাভিধানের (১৭৮১-৮৩ খ্রীঃ) উল্লেখ করিয়াছেন ; ইহা পাণ্ডুলিপি আকারেই আছে। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল তারিখে ***Calcutta Gazette***-এ একটি বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল, তাহাতে কয়েক জন বঙ্গদেশবাসী উপযুক্ত লোককে একটি বাংলা ব্যাকরণ ও অভিধান প্রণয়নের অনুরোধ জানাইতেছেন। অনুরোধের ধরন দেখিয়া মনে হয়, তখন পর্য্যন্ত তাঁহাদের ব্যবহারার্থ কোনও ইংরাজী-বাংলা অভিধানের প্রচলন ছিল না। স্থবিখ্যাত রামকমল সেন তাঁহার ***A Dictionary in English and Bengalee*** (Serampore Press, 1834) পুস্তকের ভূমিকায় (p. 17) কিন্তু লিখিয়াছেন—

"In 1774 the Supreme Court was established here, and from this period a knowledge of the English language appeared to be desirable and necessary. In tracing the progress made, it appears that a Brahmin named *Ramram Misra* was the first who made any considerable progress in the English language, but it is not known how he learnt it, or by whom he was taught. He himself taught several Baboos and amongst them *Ramnarain Misra*, a clerk to an attorney of the Supreme Court, who was considered to be a scholar and a great lawyear into the bargain, for he could draw up petitions, and knew the forms and practice of the pernicious system of law which has ruined almost every family of note in Calcutta, who were subject to its jurisdic-

tion. By it he made his fortune, there not being his equal at the time. He afterwards kept a school, in which he taught a number of Hindoos youth, and received from them a monthly fee of from 4 to 16 Rs. each. Before his time however there was another individual named *Anondiram Doss*, who knew a still greater number of English words than *Ramnarain.* This man had a vocabulary or collection of words which was considered a treasure of English knowledge, and a number of a young Hindoos used to attend daily upon him for hours and to wait his pleasure and convenience to get some scraps from his book. This pious philanthropist used to give out five or six words everyday for their study. A specimen of the words in Bengalee characters with their meaning is as follows.

লার্ড.........(Lord,) ....ইস্বর।
গাড.........(God,) ইস্বর।
কম.........(To come,) আইশ।
গো.........(To Go,) জাও।
গোইন......(Going,) জাইতেছি।

Ramlochun Napit, *Krishnaamohun Bose* and some others also used to teach English in the same manner as many writers in public offices do to this day. Sometime after this, *Bhabani Dutta*, *Sibu Dutt*, and a few others were celebrated as complete English Scholars, among the Hindoos; *Mr. Franco* called *Panchico*, also opened a school about this time which was followed by another, kept by one *Aratoon Pitrus*, several of whose scholars are still living. At that time there were no other elementary books than *Thomas Dyche's* Spelling Book and Schoolmaster. The Arabian Nights and the tootee nameh came many years after; those who could read any of these were reckoned learned men, and those who could run

over the rules of Grammar at the end of the spelling books, were considered masters of the language."

উপরোক্ত অংশ বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করিলাম এই জন্য যে, এই সময়ের ইংরেজী শিক্ষার প্রচেষ্টার ইতিহাস অন্য কোথায়ও পাওয়া যাইতেছে না এবং দুঃখের বিষয়, উল্লিখিত ব্যক্তিদের সম্বন্ধেও আর কিছু জানা যায় না। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু তাঁহার 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত' ও 'সেকাল আর একালে' বাঙ্গালীর প্রথম ইংরাজী শিক্ষার যৎসামান্য ইতিহাস দিয়াছেন। তিনি টমাস ডিস্, আরাটুন পিট্রস, রামরাম মিশ্র, ও কৃষ্ণমোহন বসুর উল্লেখ করিয়াছেন। ***Bengal : Past & Present*** এর দ্বাদশ ভ্যলুমে রামকিষণ মিশ্রের অন্য প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে। ইঁহাদের কাহারও শব্দসংগ্রহ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, তাহাও জানিবার উপায় নাই।

Sir G. C. Haughton তাঁহার ***A Dictionary, Bengali and Sanskrit***, (London, 1833) পুস্তকের ভূমিকায় (পৃঃ VII) লিখিয়াছেন, স্যার চার্লস উইলকিন্স বঙ্গদেশে অবস্থানকালে (১৭৭০-১৭৮৬ খ্রীঃ) তিনটি সংস্কৃতমূলক শব্দের তালিকা সঙ্কলন করেন ; তাহা পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই আছে।

উইলিয়াম কেরী মালদহের মদনাবতীতে অবস্থানকালে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে বারমিংহামের মিঃ পি কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বাংলা ভাষায় একটি অভিধান লিখিতে আরম্ভ করার কথা আছে। কিন্তু তাঁহার বিখ্যাত কোয়ার্টো বাংলা-ইংরেজী অভিধানের মুদ্রণকার্য্য ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে সুরু হইয়া ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়।

সুখের বিষয়, সম্প্রতি এইগুলি ছাড়াও আর দুইটি বাংলা-ইংরেজী শব্দসংগ্রহের সন্ধান আমরা পাইয়াছি। দুইটি পুস্তকই যে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেই বাংলাদেশেই মুদ্রিত, প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কি অজ্ঞাত কারণে ফরষ্টার এবং পরবর্ত্তী অভিধানকারেরা এই পুস্তক দুইটির সন্ধান পান নাই, অথবা সন্ধান পাইয়া থাকিলেও তাহার উল্লেখমাত্র করেন নাই, তাহা ভাবিবার বিষয়। ইহার প্রথমখানি ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয়খানি ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং ফরষ্টারের অভিধান প্রথম বাংলা অভিধান হিসাবে এতকাল যে সম্মান পাইয়া আসিতেছিলেন, এখন হইতে ১৭৯৩ সালে ছাপা অভিধানটিকেই সেই সম্মান দিতে হইবে।

এই প্রবন্ধে আমরা এই পুস্তকটি লইয়াই আলোচনা করিব। ইহার আবিষ্কারের একটু ইতিহাস আছে। প্রাচীন বাংলা মুদ্রিত পুস্তক সম্বন্ধে আলোচনা করিতে

করিতে ইণ্ডিয়া আফিস লাইব্রেরীর প্রথম ভ্যলুম ক্যাটালগের (১৮৮৮ খ্রীঃ) ৩৯৫ পৃষ্ঠায় "Extensive Vocabulary of Bengali, English and Udiya. 2 vols. Calcutta, 1793" এই নামটি দেখিতে পাই। ফরষ্টারের প্রথমতম বাংলা অভিধানের কথা স্মরণ করিয়া '১৭৯৩'কে ছাপার ভুল বলিয়াই ধরিয়া লই। তথাপি ইণ্ডিয়া আফিস লাইব্রেরীকে পত্র লিখি। উত্তরে জানিতে পারি, ভুল নয়, বইখানি ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দেই ছাপা, কিন্তু ক্যাটালগের নামে ভুল আছে। বইখানির নাম—"An Extensive Vocabulary, *Bengalese and English and Udiya*' শব্দ দুইটি পুস্তকের মূল মালিকের হাতে লেখা ; তিনি নিজের ব্যবহারের জন্য পুস্তকটিকে 'ইণ্টারলিফ' করিয়া দুই ভ্যলুমে বাঁধাইয়া প্রত্যেকটি শব্দের ওড়িয়া প্রতিশব্দ হাতে লিখিয়া রাখিয়াছেন। যথাসময়ে ইণ্ডিয়া আফিসে রক্ষিত পুস্তকের টাইটেল পেজ, ভূমিকা ও অভিধান-অংশের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি আমাদের হস্তগত হয়।

পুস্তকটির নাম—

ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি

An Extensive

Vocabulary,

Bengalese and English,

Very useful

To Teach the Natives English

And

To Assist Beginners in Learning

The Bengal Language.

Calcutta,

Printed at the Chronicle Press.

M D C E X C III

ক্রনিকল প্রেসের নাম মাত্র আছে, গ্রন্থকারের অথবা মুদ্রাকরের কোনও নাম নাই। ক্রনিকল প্রেসের সূত্র ধরিয়া আমরা গ্রন্থকারকে বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছি, এখন পর্য্যন্ত সফলকাম হই নাই। গ্রন্থকার ভূমিকাতেও আত্মপরিচয়ের কোনও সূত্র ধরিয়া দেন নাই। ভূমিকাটি যথাযথ উদ্ধৃত করিতেছি।

PREFACE

The Author spent ten years in compiling and revising this work. He is very sensible of its defects ; but as it is the first of the kind, and promises much utility in diffusing the English language among the Natives, he hopes it will be candidly received by the Publick, The Printer engages to furnish to every Purchaser a complete Index, as soon as it can be prepared, gratis.

সৌভাগ্যক্রমে, এই পুস্তকের একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি শোভাবাজার রাজবাটীতে রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরীতে খুঁজিয়া পাই, পরে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ্ গ্রন্থাগারেও ইহার একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি প্রাপ্ত হই। টাইটেল্ পেজ, ভূমিকা ইত্যাদি না থাকাতে ইহা 'মিলার সাহেবের অভিধান (১৮০১)', এই ভুল নামে তালিকাভুক্ত হইয়া আছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, হাতের কাছে এই পুস্তকের এতগুলি কপি থাকা সত্ত্বেও ইহা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস লেখকদের নজর এড়াইয়া গিয়াছে। এই অভিধান সম্পর্কে আমরা সর্ব্বপ্রথম ১৩৪৩ সনের আশ্বিন সংখ্যা চিঠিতে (পৃঃ ১৫৮১) উল্লেখ করি ও পরে কার্ত্তিক সংখ্যা শনিবারের চিঠির ৩২ ও ১৪৫-৪৬ পৃষ্ঠায় ইহার সামান্য পরিচয় প্রদান করি।

প্রথমটা আমাদের সন্দেহ হইয়াছিল, রামকমল সেনের ভূমিকায় উল্লিখিত 'আনন্দিরাম দাসে'র শব্দসংগ্রহই পরবর্ত্তী কালে 'ইংরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি' নাম লইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু এই সন্দেহের সপক্ষে আমরা কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় *Calcutta Chronicle* নামে একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইত। কলিকাতার ম্যাপ প্রস্তুতকারক সুবিখ্যাত A. Upjohn ইহার মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন। ইঁহাদের অফিস ও ছাপাখানা ছিল ৮নং লালবাজার। কলিকাতা ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীতে ১৭৯২ ও ১৭৯৩ এই দুই সালের *Calcutta Chronicle* আছে। তাহা হইতে জানা যায়, প্রেসের নাম ছিল 'Calcutta Chronicle Press' ; এই প্রেসটাই অভিধানের টাইটেল পেজে 'Chronicle Press' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এ. আপজন সাহেব Calcutta Chronicle (প্রেস ও পত্রিকা)-এর এক-ষষ্ঠাংশের মালিক ছিলেন। তিনি ১৭৭২ সালের গোড়ার দিক্ হইতেই দুরবস্থায় পতিত হন ও তাঁহার অংশ হস্তান্তরিত করিবার চেষ্টা করেন। কলিকাতা গেজেটের সেটন-কার-কৃত সঙ্কলনে ও

ক্যালকাটা ক্রনিকল সাপ্তাহিকের বিভিন্ন সংখ্যায় আপজন সাহেবের সম্পত্তি বিক্রয় বিষয়ে নানা অদ্ভুত বিজ্ঞাপন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই দুর্দ্দশার মধ্যেও আপজন সাহেবের অদম্য উৎসাহের অন্ত ছিল না ; তাঁহার সম্পত্তি বিক্রয়ের চেষ্টা চলিতেছে, এই অবস্থাতেই তিনি তাঁহার পত্রিকায় (Tuesday, March 20, 1792, Vol. VII, No. 322) বিজ্ঞাপন দিয়া বসিলেন,—

New Publications, In the Press, And speedily will be published, An Extensive Vocabulary, Bengalese and English, Very useful to teach the Natives English and to Assist Beginners in Learning the Bengal Language Those who wish for the works are requested to send their orders to Mr. Upjohn.

ইংরাজ এবং বাঙ্গালি লোকের/ সিখিবার কারন এক বহি অতি/ সিত্র ছাপাখানায় তৈয়ার হইবে/ক সাহেব লোকে বাঙ্গলা কথা/ সিখিবেক এবং বাঙ্গালি লোকে/ ইংরাজি কথা সিখিবেক অতএ/ব সকল লোকের কেফাএত/কারণ এই বহি তৈয়ার করা জা/ইতেছে জে ২ লোকে চাহে তা/হারা মেং আবজান সাহেবের/ ছাপাখানায় আসিয়া লইবেক/ইতি সন ১৭৯২ ইংরাজী/তারিখ ১৯ মার্চ্চ সন ১১৯৮ /বাঙ্গালা তারিখ ৯ চৈত্র।

এই বিজ্ঞাপনটিই ঘুরিয়া ফিরিয়া এবং সামান্য পরিবর্ত্তিত হইয়া ১৭৯৩ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত বার বার বাহির হয়। "Price Twelve Rupees" এই অংশটিও কয়েক বার জুড়িয়া দেওয়া হয়। আপজন সাহেব নিজেই হউক অথবা অপর কাহাকেও দিয়া হউক, অভিধানটি সঙ্কলন ও মুদ্রন করিতে থাকেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ তারিখের ক্যালকাটা ক্রনিকলের একটি বিজ্ঞাপনে অফিস ও প্রেস লালবাজার হইতে চিৎপুর রোডে Le Blanc-এর গৃহে উঠিয়া যাওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। আপজনের সহিত ক্যালকাটা ক্রনিকলের সম্পর্কও ওই সঙ্গে শেষ হয় এবং তৎপরেই ১৬ই এপ্রিলের কাগজে এই বিজ্ঞাপন দেখিতেছি,—

Just Published,/ At the Chronicle Office, Chitpore Road,/ (Price four Rupees,)/ ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি / বোকেবিলরি/ An Extensive/ Vocabulary,/ Bengalese and English,/ very useful to Teach the natives English/ And/ To Assist beginners in learning the/ Bengal Language.

বারো টাকা হইতে চার টাকায় দাম নামিয়া আসাতে বোধ হইতেছে, পুস্তকটি প্রথমে যত বৃহৎ হইবে বলিয়া প্রকাশক আশা করিয়াছিলেন, ঠিক তত বড় হয় নাই। মনে হয়, সম্পত্তি বিক্রয় ও হস্তান্তরণ ব্যাপারেই নানাবিধ গোলযোগ ঘটে এবং এই পুস্তক তেমন ভাবে প্রকাশ ও প্রচার না হওয়ার ইহাই সম্ভবতঃ কারণ।

এই অভিধান যাহার দ্বারাই সঙ্কলিত হইয়া থাকুক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক এ. আপজন ছাড়া আর কাহারও নামের সহিত এখনও ইহা যুক্ত করা যায় না। সুতরাং আপাততঃ ইহাকে ক্রনিকল প্রেসে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে (১৬ এপ্রিল তারিখের পূর্ব্বে) ছাপা আপজনের ইংরেজি-বাংলা অভিধান বলিয়াই উল্লেখ করিতে হইবে।

পুস্তকটি প্রায় ডবল ক্রাউন ষোলপেজী সাইজের ; টাইটেল পেজ ও ভূমিকা স্বতন্ত্র, মূল অভিধানের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৪৪৫। প্রত্যেক পৃষ্ঠার বাঁদিকে বাংলা ও ডান দিকে তাহার ইংরেজী প্রতিশব্দ দেওয়া আছে। শব্দগুলি বর্ণানুক্রমে সাজানো হইলেও ব্যঞ্জনবর্ণ পূর্ব্বে স্থান পাইয়াছে। ১-৩৯৩ পৃষ্ঠার অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত ব্যঞ্জনবর্ণ, ৩৯৩-৪৪৫ পৃষ্ঠা স্বরবর্ণ। সকল শব্দ ঠিক বর্ণানুক্রমে সাজান নাই। শব্দ ছাড়া অনেক বাক্য ও বাক্যাংশও অনুবাদ-সমেত দেওয়া হইয়াছে।

এই অভিধানের শব্দগুলি ভাষাবিদের বিশেষ আলোচনার যোগ্য ; অনেক শব্দ বর্ত্তমানে অপ্রচলিত, অনেক শব্দের অর্থের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, সংস্কৃতে তৎসম ও তদ্ভব শব্দের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক কম ; দেশজ শব্দ অত্যন্ত বেশী ; মুসলমানী শব্দও কম নয়। ফরষ্টারের অভিধান হইতে বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত করিবার যে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল, এই অভিধানে তাহার কোনই চিহ্ন নাই। এই শব্দ বিচারের জন্যই এই প্রাচীনতম অভিধানটির সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রণ আবশ্যক। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতেই এই চেষ্টা হইলে শোভন হইবে।

কালিদাসের অভিধান

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

মহাকবি কালিদাস কুমারসম্ভব নামে মহাকাব্য লিখিয়াছিলেন। মেঘদূত নামে খণ্ডকাব্য লিখিয়াছিলেন। অভিজ্ঞানশকুন্তল, বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র এই তিন নামে তিনখানি নাটক লিখিয়াছেন। তাঁহার সকলের চেয়ে বড় বই রঘুবংশ। তাহাকে মহাকাব্য বলিব কি না এ বিষয়ে লোকে বড়ই সন্দেহ করে। কারণ, এক বিশ্বনাথ কবিরাজ ছাড়া আর যত অলঙ্কার-লেখক মহাকাব্যের লক্ষণ করিয়াছেন, সে লক্ষণে রঘুবংশ পড়ে না। সে-সকল লক্ষণে এক নায়ক নহিলে মহাকাব্য হয় না ; সুতরাং সে মহাকাব্যের লক্ষণে রঘুবংশের জায়গা নাই। বিশ্বনাথ কবিরাজ বলিয়াছেন, একই নায়ক বা মহানায়ক হউক, মহাকাব্য হইতে পারে। তাঁহার ইচ্ছাটা যেন রঘুবংশকে মহাকাব্যের ভিতরে ফেলা। শারদাতনয় নামে এক নাট্যশাস্ত্রকার মুসলমান আক্রমণের কিছুপূর্ব্বে মিরাট অঞ্চলে ভাবপ্রকাশ বলে একখানি বই লেখেন। তাতে তিনি কালিদাসের রঘুবংশকে সংহিতা বলিয়া গিয়াছেন। একথাটা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু বলার দরকার, এইজন্য বলিলাম। রঘুবংশ মহাকাব্য হউক আর নাই হউক, আমার বিশ্বাস এত বড় কাব্য আর কেহ কখনও জগতে কল্পনা করিতে পারিবে না।

কালিদাস আরও বই লিখিয়াছেন। তাঁহার ঋতুসংহারখানি তাঁহার নিজের দেশের ছয় ঋতুতে বর্ণনা। তিনি গ্রন্থখানি তাঁহার প্রিয়াকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছেন। এছাড়া অনেক ছোট ছোট কাব্য কালিদাসের নামে চলিয়া আসিতেছে। শৃঙ্গারাষ্টক, শৃঙ্গারতিলক, নলোদয় তাহার মধ্যে প্রধান। অনেক চুটকি কবিতা তাঁহার নামে চলিতেছে। ফুক্‌কুড়িও তাঁহার নামে চলিয়া আসিতেছে। বাঙ্গালার ফুক্‌কুড়ি যেমন গোপাল ভাঁড়ের নামে চলে, হিন্দীর ফুক্‌কুড়ি যেমন আকবর ও বীরবলের নামে চলে, সংস্কৃতের অনেক ফুক্‌কুড়িও কালিদাসের নামে চলে।

কালিদাস যে কাব্য আর রসের কথা লিখিয়া শেষ করিয়াছেন তাহা নহে। তাঁহার নামে একখানি ছন্দের বই চলিতেছে। ছন্দের বই-এর কর্ত্তা হইলেন পিঙ্গল, কালিদাসের অনেক আগে। কিন্তু পিঙ্গলের গণ আছে, মাত্রা আছে, বৃত্ত আছে, জ, গ, ম, ইত্যাদি আছে। বীজগণিতের পরিবৃত্তি-অনুবৃত্তি আছে।

ব্যাপারটা খুব কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। তাহাকে সহজ করিবার জন্য কালিদাস একখানি ছন্দের বই করিলেন। কঠিন ছন্দের বইকে মিষ্ট করিবার জন্য ঋতু-সংহারের মত প্রায়ই প্রিয়াকে সম্বোধন করিয়া লিখিতে লাগিলেন। যে ছন্দের লক্ষণ সেই ছন্দেই তিনি লক্ষণ করিলেন। কোন রকম পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করিলেন না। প্রতিজ্ঞা করিলেন, শোনবা মাত্রই যাহাতে ছন্দের লক্ষণ বোঝা যায় তাহাই তিনি লিখিবেন। ইহাতে ৪৪টি কবিতা আছে, ৪১টি ছন্দের লক্ষণ আছে। পাণিনির সঙ্গে কলাপের যে সম্বন্ধ, পিঙ্গলের সঙ্গে ছন্দোবিষয়ে কালিদাসেরও সেই সম্বন্ধ। একজন লিখিয়াছেন পণ্ডিতের জন্য। আর একজন লিখিয়াছেন অপণ্ডিতের জন্য।

শ্রুতবোধ ছাড়া তাঁহার আর একখানি ছন্দের গ্রন্থ চলিতেছে, সেখানির নাম দেবীস্তুতি। উহাতে ৭১টি কবিতা আছে। ছন্দঃশাস্ত্র ক্রম অনুসারে ৭ টি কবিতা সাজান। এক একটি কবিতায় এক একটি ছন্দ। দেবীর পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত বর্ণনা। কথা আছে কালিদাস সরস্বতীর বর পাইয়া প্রথমেই সরস্বতীর স্তব করেন, মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত বর্ণনা করেন। তাহাতে সরস্বতী রাগিয়া বলেন, তুই আমাকে বেশ্যার মত বর্ণনা করিলি। তোর কার্য্য অশ্লীল হইবে। সেই ভয়ে কালিদাস দেবীস্তুতিতে পা হইতে আরম্ভ করিয়া মাথা পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়াছেন। কুমারসম্ভবেও তাহাই করিয়াছেন। একখানি জ্যোতিষের বই কালিদাসের নামে চলিতেছে। ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে বইখানি ছাপা হইয়াছিল। গ্রন্থকার বলিতেছেন, আমিই কালিদাস—রঘুবংশ ইত্যাদি লিখিয়াছি। সুতরাং সেকালের এক পণ্ডিত কালিদাসের এক জীবনচরিত পাওয়া গেল বলিয়া খুব গোলমাল করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে দেখা গেল সে জ্যোতির্বিদ্যাভরণের কাল-গণনার আরম্ভ ১৬শ শতাব্দীতে হইয়াছে; গ্রন্থকারের বাড়ি উৎকলে ছিল। কালিদাসের সম্বন্ধে এই সকল কথা বলিয়া আমরা এখন তাঁহার অভিধানের কথা বলিব। আমাদের আজকার বলিবার বিষয় সেই অভিধান।

মাদ্রাজের গর্ভমেণ্ট ওরিএন্টাল লাইব্রেরীতে কয়েক খানি পুঁথি আছে। তার মধ্যে একখানি 'নানার্থশব্দরত্নম' ও তাহার টীকা 'তরলা'। মূল পুঁথিখানি কালিদাসের টীকাটি 'নিচুল'-এর। রাওবাহাদুর রঙ্গাচারীয় প্রথম এই অভিধান-খানির নাম প্রকাশ করেন ও বিবরণ লেখেন। ইনি লিখিয়াছেন, অভিধানখানি A Kalidas-এর লেখা। অর্থাৎ কালিদাস নামে অনেক লোক ছিল। তাহার মধ্যে কোন অপ্রসিদ্ধ কালিদাসের লেখা। মহাকবি কালিদাসের লেখা নয়। তাঁহার দেখাদেখি আর যে কেহ এই পুস্তক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। তাঁহারাও

ঐভাবে লিখিয়াছেন। রামঅবতার শর্ম্মা তাঁহার কল্পদ্রুমকোষের ভূমিকায় অভিধানশাস্ত্রের যে ইতিহাস দিয়াছেন তাহাতে তিনি নানার্থশব্দরত্নকে অনেক পরে ফেলিয়াছেন। মুসলমান আক্রমণের পরেই ফেলিয়াছেন।

কিন্তু এই অভিধানখানি মহাকবি কালিদাসের বলিবারও নানা কারণ আছে। প্রথম কারণ এই যে, কালিদাস মেঘদূতের ১৪ শ্লোকের শেষ অংশে লিখিয়াছেন—

স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্ মুখঃ খং
দিঙ্নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্।

অর্থাৎ এই স্থান হইতে উত্তরমুখো হইয়া তুমি আকাশে ওড়। এই জায়গাটি বড় মনোহর। এখানে বেতগাছগুলি বড় সরস। দেখিও যাইবার সময় দিঙ্নাগেরা যেন তাহাদের মোটা শুঁড় তোমার পিঠে বুলায় না। এই স্থানে মল্লিনাথ টিপ্পনী করিয়াছেন যে, নিচুল শব্দে বেতগাছ বুঝায়। কিন্তু নিচুল একজন কবির নাম। তিনি কালিদাসের বন্ধু ছিলেন এবং কালিদাসের কাব্যের ভাল সমালোচনা করিতেন। আর দিঙ্নাগ নামে একজন বড় বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। তিনি ও তাঁহার দলভুক্ত লোকে কালিদাসের কাব্যের মন্দ সমালোচনা করিত।

মল্লিনাথের একথা যদি সত্য হয়, আর নিচুল যোগিচন্দ্র যদি কালিদাসের নানার্থরত্নের টীকা করিয়া থাকেন তাহা হইলে আর "A Kalidasa" বলিলে চলিতে পারিবে না। অভিধানকার যেন মনে হয় "The great Kalidasa." অভিধানখানি নানা দিক্ থেকে একখানি আশ্চর্য্য বই বলিয়া মনে হয়। এ যে ইদানীন্তন কেহ লিখিয়াছেন তাহা মনে হয় না। আমরা এ অভিধানখানির ও তাহার টীকার একটু বিস্তৃত সমালোচনা করিব।

অভিধানের মঙ্গলাচরণটি রঘুবংশের মঙ্গলাচরণটির মত।

অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির নমস্কার।

"তমেব শিরসা বন্দে পুণ্যেতরফলাদিকে।
কীর্ত্যং স্বমোক্ষবন্ধাদৌ সব্যবামসিসিতঃ॥" Cla. P 1171.

কালিদাস যে শৈব ছিলেন সে-বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ নাই। শেষ বয়সে তিনি অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিরই উপাসক হইয়াছিলেন। এখানে এবং রঘুবংশে দুইয়েতেই অর্দ্ধনারীশ্বরের কথা আছে। যেমন পিঙ্গলকে সহজ করিবার জন্য তিনি শ্রুতবোধ লিখিয়াছিলেন, এ অভিধানখানিও তেমনি তিনি—

তত্রাপ্যেকাদিধাত্বর্থবাচকত্বে নিগ্রন্থিতে।
মহাভাষ্যাদিব্যল্লোকে গ্রহীতুং নহি শক্যতে॥

অতো যেনৈতদাখলমায়াসাতিশয়ং বিনা।
জায়তে সুষ্টুসর্ব্বার্থশব্দরত্নং প্রদর্শ্যতে ॥

অতিশয় আয়াস না করিয়া সহজে যাহাতে বোঝা যায় তাহারই জন্য লিখিয়াছেন। এ গ্রন্থখানি যে প্রাচীন তাহার আর একটা প্রমাণ দিতেছি। তিনি শব্দশাস্ত্রের মধ্যে পাণিনি, শক্তি, সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র নির্ম্মিত ব্যাকরণের কথা বলিয়াছেন। পাণিনি, চন্দ্র, ইন্দ্র নির্ম্মিত ব্যাকরণ লোকের জানা আছে। বোপদেব যে আটজন আদি শাব্দিকের নাম করিয়া গিয়াছেন তাহার মধ্যে এ তিনজনের নাম আছে। কিন্তু সূর্য্য আর শক্তির নাম কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু সূর্য্যের যে একখানি ব্যাকরণ ছিল তাহার কিছু প্রমাণ আমি পাইয়াছিলাম, তাহা ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে। তখন আমি তাহার বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। নেপালে আমি "পদসূর্য-প্রকাশ" নামে একখানি বই পাই। আমি সেখানি কলাপ ব্যাকরণের বই বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু কালিদাসের অভিধানে সূর্য্যের নাম পাইয়া আমি আবার পদসূর্য্য ব্যাকরণ দেখি। তাহাতে লেখা আছে, সর্ব্ববর্ম্মা ও গুহ প্রভৃতি মতের সহিত ঐক্য করিয়া এই পদসূর্য্য ব্যাকরণ লেখা হইতেছে। সুতরাং পদসূর্য্য ব্যাকরণ কলাপ হইতে স্বতন্ত্র। এবং এখন যে লোকে কলাপ ব্যাকরণকে কার্ত্তিকের লেখা বলে সেটাও ঠিক নয়। কারণ, সর্ব্ববর্ম্মার ব্যাকরণ স্বতন্ত্র এবং গুহের অর্থাৎ কার্ত্তিকের ব্যাকরণ স্বতন্ত্র। এই দুইখানি ব্যাকরণের পরস্পর কি সম্বন্ধ তাহা ঠিক বলিতে যদিও পারা যায় না, তাহারা যে স্বতন্ত্র তাহা ঠিক বলিতে পারা যায়। গরুড়পুরাণে দু অধ্যায় ব্যাকরণের কথা আছে। তাহাতে কার্ত্তিক ও কাত্যায়ন দুজনের সংবাদ আছে এবং গরুড়পুরাণের যে ব্যাকরণ তাহা সূত্রে লেখা নয়। সিদ্ধ অর্থাৎ চলিত উদাহরণের দ্বারা শিখান হইত কিন্তু গরুড়পুরাণে যে-সকল উদাহরণ আছে তাহা সর্ব্ববর্ম্মার কাতন্ত্র ব্যাকরণেও আছে। সুতরাং কার্ত্তিক, সর্ব্ববর্ম্মা, সূর্য্য, ইঁহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যাকরণের কর্ত্তা। এ খবরটি আমরা কালিদাসের অভিধান হইতেই পাইলাম।

তাহার পর টীকাকারের কথা। মল্লিনাথ বলিয়া গিয়াছেন, টীকাকার নিচুল কালিদাসের বন্ধু ছিলেন। সেই নিচুলই দেখিতেছি কালিদাসের অভিধানের টীকা করিতেছে। তিনি গোড়ায়ই বলিয়াছেন—

স্বমিত্রকালিদাসোক্তশব্দরত্নার্থজৃম্ভিতাম্।
তরল্যাখ্যাংলসদ্ব্যাখ্যামাখ্যাস্থে তন্মতানুগাম্॥

স্থতরাং তিনি যে কালিদাসের বন্ধু ছিলেন একথা নিজেই স্বীকার করিতেছেন। কালিদাস পাঁচজন ব্যাকরণকারের নাম লিখিয়াছেন। টীকাকার বলিতেছেন যে, ব্যাকরণকার ছয় জন, শম্ভু (শিবস্থত্র-পাণিনি), শক্তি, কুমার, ইন্দ্র, স্থর্য্য, চন্দ্র। এ সংবাদ তিনি রহস্য নামক গ্রন্থ হইতে তুলিতেছেন। তিনি আরও বলিতেছেন—

শ্রীশক্তিশম্ভুস্থচিত বিভক্ত্যাকলনসিদ্ধপদযোগাৎ।
চক্রে কুমারমূর্ত্তির্ব্যাকরণং সর্বদেশরসার্থম্॥

অর্থাৎ কুমার যে ব্যাকরণ লিখিয়াছেন তাহা শক্তি শম্ভু প্রভৃতির নিয়মানুসারে সিদ্ধ অর্থাৎ চলিত পদগুলি লইয়া করিয়াছেন।

নিচুল কবি কে ছিলেন। তিনি ভোজমহারাজের প্রবোধিত হইয়া এই টীকা লিখিয়াছেন। ভোজমহারাজ বলিলেই তো একাদশ শতাব্দীতে আসিয়া পড়িল। কিন্তু একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। কারণ একাদশ শতাব্দীর ভোজ ধারা নগরাধিষ্ঠিত মহারাজাধিরাজ ভোজ। কিন্তু নিচুলের ভোজ মহারাজ-শিরোমণি ভোজমহারাজ। দুই ভোজ এক নয়। নিচুলের ভোজ খুব প্রাচীন হওয়ারই সম্ভাবনা।

কালিদাস যে অভিধানখানি পণ্ডিতের জন্য লেখেন নাই, সর্ব্বসাধারণের জন্য লিখিয়াছিলেন তাহা তিনি নিজে বলিয়াছেন। ইহার আরও প্রমাণ এই যে, কালিদাসের বর্ণমালা 'অ-কারাদি ক্ষ-কারান্ত'। বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে দুইরূপ বর্ণমালা চলিতেছিল—পণ্ডিতের জন্য অকারাদি হকারান্ত, আর সাধারণ লোকদিগের জন্য অকারাদি ক্ষকারান্ত। পাণিনি আদি বৈয়াকরণেরা 'ক্ষ'কে সংযুক্ত বর্ণ বলিয়া বর্ণমালার মধ্যে ধরেন নাই। বৌদ্ধ বৈয়াকরণেরাও ঐ পথেই গিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য বৌদ্ধ বইএ 'ক্ষ' বর্ণমালায় ভুক্ত আছে। তাহার উদাহরণ ললিতবিস্তর। বুদ্ধদেব যে বর্ণমালা শিখিয়াছিলেন তাহার শেষে 'ক্ষ' আছে।

এখন পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন অভিধানকার কালিদাস "A Kalidasa" কি "The Kalidasa।"

বাঙ্গলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ

অশ্বিনীকুমার সেন

চুঁচুড়ার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের পঞ্চম অধিবেশনে সভাপতি মাননীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের অভিভাষণে আমরা মিঃ হ্যালহেড সাহেব কৃত 'Grammar of Bengali Language' নামক বাঙ্গলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণের কথা জানিতে পারি। সভায় আমার পার্শ্বে হুগলীর একজন খ্যাতনামা সাহিত্যসেবী বসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, হ্যালহেড সাহেবের এই ব্যাকরণ শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরীতে আছে। এই সংবাদে শ্রীরামপুর যাইয়া ব্যাকরণখানি দেখিয়া আসিবার ইচ্ছা হইতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে ইহার এক সুবিধাও উপস্থিত হইল। অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যক্ষের প্রতিনিধি সম্মেলনে সমাগত সাহিত্যসেবীবৃন্দকে কলেজ লাইব্রেরী পরিদর্শন জন্য সাদরে আহ্বান করিয়া গেলেন। এই আহ্বানে পরদিন প্রাতঃকালেই আমি এবং দৌলতপুর হিন্দু একাডেমীর ইতিহাসের অধ্যাপক সুলেখক শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মিত্র বি-এ, এক সঙ্গে শ্রীরামপুর যাত্রা করিলাম। যথাসময়ে কলেজে পৌছিয়া পুস্তকালয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী মহাশয়ের সহিত বৃহৎ পুস্তকালয়ে প্রবেশ করিয়া স্ফটিকাধারে যত্নে রক্ষিত সংস্কৃত, চীন, হেব্রু প্রভৃতি বহু ভাষায় লিখিত বহুসংখ্যক দুষ্পাপ্য হস্তলিখিত পুঁথি দেখিতে দেখিতে অবশেষে কথিত ব্যাকরণখানি প্রাপ্ত হইলাম। ব্যাকরণখানি সেকালের সাদা পুরু কাগজে বড় অক্ষরে মুদ্রিত। ইহার প্রথম পত্রাঙ্কে—'বোধ প্রকাশং শব্দশাস্ত্রং ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থক ক্রিয়তে হালেদং গ্রেজি' এই যে বচন আছে, তাহা হইতেই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য ও গ্রন্থকার ইংরেজ হ্যালহেড সাহেবের নাম জানিতে পারা যায়।

হ্যালহেডের পূর্ণ নাম মিঃ ন্যাথনিয়েল ব্রেসি হ্যালহেড—ইনি হুগলীর সিবিল কর্ম্মচারী ছিলেন।

এখন ব্যাকরণ রচনার ইতিহাস একটু বলিব। ইংরাজেরা এদেশে আধিপত্য লাভ করিয়া ১৭৭৫খৃঃ ইহার দেওয়ানী ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু দেশীয় ভাষা না জানায় কোম্পানীর নবাগত কর্ম্মচারীবর্গের বিষয় কার্য্যের যথেষ্ট অসুবিধা হইতে লাগিল। সেই অসুবিধা দূরীকরণ জন্য কোম্পানীর তৎকালিক ছোট বড় সকল কর্ম্মচারীই বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করিবার আবশ্যকতা বোধ করিলেন। কিন্তু কোনও

বিদেশীয় ভাষা আয়ত্ত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহার মূল প্রকৃতি ও গঠনের নিয়ম জানার দরকার। ব্যাকরণের সাহায্য ব্যতীত বিদেশীর পক্ষে সে বিষয়ে বেশী দূর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল—কিন্তু তখন বাঙ্গলা ভাষার কোনও ব্যাকরণ ছিল না। তাই অদ্ভুতকর্ম্মা হ্যালহেড বাঙ্গলা ব্যাকরণ রচনা করিবার সঙ্কল্প করিয়া বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এবং বিপুল পরিশ্রমে অতি অল্প দিনের মধ্যে তাহাতে সম্যক্ অধিকার লাভ করিয়া ১৭৭৮ খৃঃ এই ব্যাকরণখানি প্রণয়ন করিলেন।

এই ব্যাকরণ রচনা করিতে হ্যালহেড্ সাহেবকে যে কি অসাধারণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, পুস্তকখানি পাঠ করিলেই তাহা সম্পূর্ণ উপলব্ধি হইতে পারে। তিনি সংস্কৃত, আরবী, পারসী, গ্রীক ও লাটিন প্রভৃতি কয়েকটী ভাষার ব্যাকরণের সহিত তুলনা করিয়া এই বাঙ্গলা ব্যাকরণ রচনা করেন। ইহাতে তৎকালিক ও আধুনিক বাক্ পদ্ধতির যথেষ্ট উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। যখন এদেশে বাঙ্গলা সাহিত্যের কোন আলোচনাই আরম্ভ হয় নাই, তখন সাত সমুদ্র তের নদী পারের ভিন্ন ভাষাভাষী একজন রাজকর্ম্মচারী বাঙ্গলা লেখ্য ও কথ্য ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া বাঙ্গলা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম ব্যাকরণ রচনা দ্বারা সেই ভাষার শৃঙ্খলা ও গদ্যরচনার সৌকর্য্য সাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন ইহা ভাবিলেও বিস্ময়ে অবাক্ হইতে হয়।

ব্যাকরণ লিখিত হইলে ইহার মুদ্রাঙ্কণ জন্য এই দেশে বাঙ্গলা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিবার প্রয়োজন হয়। কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব সিবিল কর্ম্মচারী স্যার চার্লস উইলকিন্সকে ইংলণ্ড হইতে আনাইয়া তাঁহারই উপর এই কার্য্যের যাবতীয় ভার অর্পণ করা হইয়াছিল। স্যার চার্লস সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষার অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি প্রাচীন পুঁথির অক্ষর ও পাকা মুন্সীদিগের হস্তাক্ষরের আদর্শ লইয়া বহুদিন পরিশ্রমের পর স্বহস্তে কাষ্ঠের খোদাই বাঙ্গলা অক্ষর প্রস্তুত করেন। এই কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য তিনি পঞ্চানন কর্ম্মকার নামীয় জনৈক এদেশীয়কে অক্ষর খোদাই কার্য্য শিখাইয়াছিলেন। স্যার চার্লস ও পঞ্চানন কর্ম্মকারের প্রস্তুত কাষ্ঠের অক্ষর দ্বারা স্থাপিত মুদ্রাযন্ত্রে ১৭৭৮ খৃঃ হুগলীতে হ্যালহেডের বাঙ্গলা ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়। সুতরাং এই পুস্তকখানি যে সুধু বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণ বলিয়াই প্রসিদ্ধ তাহা নয়—বাঙ্গলা দেশের প্রথম মুদ্রাযন্ত্রে বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাঙ্গলা পুস্তক বলিয়াও ইহার যথেষ্ট ঐতিহাসিক গৌরব আছে—তাহা স্পর্দ্ধা সহকারে বলা যাইতে পারে।

বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র—গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের "বেঙ্গল গেজেট", অথবা শ্রীরামপুরের মিশনরীদের "সমাচার-দর্পণ"—এই লইয়া 'প্রবাসী'তে বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে *Calcutta Review* পত্রে পাদ্রী লং প্রথমে শ্রীরামপুরের সমাচার-দর্পণকেই আদি বাংলা সংবাদপত্র বলিয়াছিলেন, কিন্তু পাঁচ বৎসর পরে ১৮৫৫ সনে তাঁহার *Descriptive Catalogue of Bengali Works*-এ এই মত বর্জ্জন করিয়া ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের *Bengal Gazette* কে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র বলেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে *Bengal Gazette* বাহির করেন। তিনি বিদ্যাসুন্দর, বেতাল ও অন্যান্য পুস্তকের সচিত্র সংস্করণ প্রকাশ করিয়া অনেক পয়সা করিয়াছিলেন। তাঁহার কাগজখানি অল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল।"

রামগতি ন্যায়রত্ন, রাজনারায়ণ বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি বাংলা ভাষার প্রাচীন ইতিহাস লেখকরা গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের বেঙ্গল গেজেটকেই প্রথম বাংলা সংবাদপত্র বলিয়াছেন। কেদারনাথ মজুমদার, সুশীলচন্দ্র দে প্রমুখ অনেক আধুনিক লেখকও এই মত পোষণ করেন। ইহারা সকলেই লং সাহেবের পরে লিখিয়াছেন, এবং খুব সম্ভব ঐ পাদ্রীর কথার বলেই 'বেঙ্গল গেজেট'-এর নাম করিয়াছেন।

অপর পক্ষ—যাঁহারা ১৮১৮, ২৩এ মে তারিখে প্রকাশিত 'সমাচার-দর্পণ'কেই বাংলার প্রথম সংবাদপত্র বলিতে চান, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে শ্রীরামপুরের মিশনরীদের নাম করিতে হয়; ইঁহাদের *Friend of India*, সমাচার দর্পণ ও অন্যান্য পুস্তকে একথা বহুবার প্রকাশিত হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাস লিখিতেছেন; তিনিও সম্প্রতি লিখিয়াছেন,—

"সমাচার দর্পণের পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালা সংবাদপত্র বাহির হইয়া থাকিলে… সমসাময়িক অন্য কোন কাগজে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইত। অন্ততঃ সমাচার-দর্পণও তাহার নাম করিত।…দুঃখের বিষয় কেহই প্রস্তাবিত *Bengal Gazette*খানি দর্শন করেন নাই। বাঙ্গালা *Bengal Gazette* কোনদিন

বাহির হয় নাই। এই ভ্রান্ত প্রবাদের মূল লঙ্‌ সাহেব। আর লঙ্‌ সাহেব তাঁহার লেখায় যথেষ্ট ভুল করিয়াছেন—এটী নূতন নয়।"

"সমসাময়িক অন্য কাগজ, অন্ততঃ সমাচার-দর্পণে"ও যে বেঙ্গল গেজেটের উল্লেখ নাই, একথা সত্য নহে। ১২৩৮, জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষাশেষি (১৮৩১ জুন) ভবানী-চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদ-চন্দ্রিকা'য় জনৈক সংবাদপত্র পাঠকের একখানি চিঠি প্রকাশিত হয়। ইহাতে আছে—

"শ্রীযুত চন্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয়েষু।—"

"বাঙ্গলা সমাচারপত্রের বিষয়ে কোন বিজ্ঞতম গত ৬৮০ সংখ্যক দর্পণে অনেক লিখিয়াছেন তন্মধ্যে এক কথা লেখেন যে,—

'এই অপূৰ্ব্ব সমাচার দর্পণাবতারের পূৰ্ব্বে প্রায় কাহারো কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল না যে বাঙ্গালা সমাচারপত্র নামে কোন পদার্থ আছে।'

"উত্তর ঐ লেখক মহাশয় বুঝি, এতন্নগরবাসী না হইবেন কেননা ৺গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য যিনি প্রথম অন্নদামঙ্গল পুস্তক ছবিসহিত ছাপা করেন তিনি বাঙ্গালা গেজেটনামক এক সমাচারপত্র সর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা নগরে প্রায় সর্ব্বত্র গ্রাহ্য হইয়াছিল কিন্তু ঐ প্রকাশক সাংসারিক কোন বিষয়ে বিশেষ বাধিত হইয়া, তাঁহার নিজ ধাম বহরাগ্রামে গমনকরাতে সে পত্র রহিত হয় তৎপরে দর্পণাবতার ঐ লেখক মহাশয়কে দর্শন দিয়াছেন। অতএব এ পদার্থ প্রথমে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অনেকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

উপরের পত্রখানি হইতে জানা যাইতেছে, পাদ্রী লং-এর পূর্ব্বেও লোকে 'বাঙ্গালা গেজেট'কেই প্রথম বাংলা সংবাদপত্র বলিয়া জানিত—সমাচার-দর্পণকে নহে। লং-এর লেখার সহিত 'বাঙ্গালা গেজেট'-এর উপরিউক্ত বিবরণের অতি সামান্যই পার্থক্য।

সংবাদ-চন্দ্রিকায় প্রকাশিত উক্ত চিঠিখানি সমাচার-দর্পণের সম্পাদক মহাশয় ১৮৩১, ১১ই জুন (১২৩৮. ৩০ জ্যৈষ্ঠ) সংখ্যার ১৯১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়া, সেই সংখ্যারই ১৯৪ পৃষ্ঠায় এইরূপ মন্তব্য করেন :—

"চন্দ্রিকার এক পত্র লেখক, দর্পণে প্রকাশিত এক পত্রের উত্তর দেওনেতে কহেন দর্পণ যে প্রথম বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত হয়, ইহা তিনি স্বীকার করেন না। এবং তিনি কহেন যে দর্পণ প্রকাশ হওনের পূর্ব্বে গঙ্গাকিশোর নামক এক ব্যক্তি প্রথম বাঙ্গালা গেজেট নামক সম্বাদ পত্র প্রকাশ করিয়াছেন।

"ইহাতে আমাদের এই উত্তর যে আমাদের প্রথম সংখ্যক দর্পণ প্রকাশ

হওনের দুই সপ্তাহ পরে অনুমান হয় যে বাঙ্গাল গেজেট নামে পত্র প্রকাশ হয়। কিন্তু কদাচ পূর্ব্বে নহে।"

দেখা যাইতেছে, 'দর্পণ'-সম্পাদক মহাশয়ও অতি স্পষ্টভাবে 'বাঙ্গালা গেজেট'-এর অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন, তবে তাঁহার "অনুমানে" উহা না কি দর্পণের প্রথম সংখ্যা প্রকাশের দুই সপ্তাহ পরে বাহির হয়!

'সমাচার-দর্পণ'-এর প্রতিদ্বন্দ্বী কাগজ ছিল—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদ-চন্দ্রিকা'। বাঙ্গালা গেজেটকেই প্রথম বাংলা সংবাদপত্র বলিয়া চন্দ্রিকা-সম্পাদকের ধারণা ছিল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে যখন 'সমাচার-দর্পণ' বন্ধ করিবার কথা উঠে তখন 'চন্দ্রিকা'-সম্পাদক দুঃখ করিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"সমাচার দর্পণ রহিতের কল্পবিষয়ক।—আমরা অবশ্যই স্বীকার করি সমাচার দর্পণ উপকারক কাগজ এবং এতদ্দেশীয় ভাষায় যে কএক কাগজের সৃষ্টি হইয়াছে, এসকলের অগ্রজের অনুমান হয় ইহার পূর্বে বাঙ্গালা গেজেট নামক এক সমাচার পত্র সর্জন হইয়াছিল বটে, কিন্তু অতি শৈশবকালে তাহার কাল প্রাপ্তি হয়। অতএব সমাচার দর্পণ প্রাচীন এবং বিবিধ সংবাদপ্রদ।"

'চন্দ্রিকা'-সম্পাদকের এই মন্তব্য ১৮৩৪, ১৫ই নভেম্বর (১২৪১, ১লা অগ্রহায়ণ) তারিখের 'সমাচার দর্পণ'-এর ৫৪৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছিল। কিন্তু 'বাঙ্গালা গেজেট' যে আদি বাংলা সংবাদপত্র—'চন্দ্রিকা'-সম্পাদকের এই উক্তির বিরুদ্ধে 'দর্পণ'-সম্পাদক আর কোনই আপত্তি উত্থাপিত করেন নাই।

তাহা হইলে দেখা গেল, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে পাদ্রী লং-এর লেখার পূর্ব্বেও প্রথম বাংলা সংবাদপত্র বলিয়া 'বাঙ্গালা গেজেট'-এর নাম অনেকের জানা ছিল। ইহা হইতে বুঝা যায়, কেন পাদ্রী লং ১৮৫০ সালে প্রথমে সমাচার-দর্পণকে আদি বাংলা সংবাদপত্র বলিয়া, পাঁচ বৎসর পরে সেই মত পরিবর্ত্তন করিয়া ***Bengal Gazette***-এর নাম করিয়াছিলেন।

আমার বিনীত নিবেদন, এ যাবৎ একখানিও 'বাঙ্গালা গেজেট' আবিষ্কৃত হয় নাই বলিয়া কেহ যেন ইহার অস্তিত্বে সন্দিহান না হন। এ বিষয়ে এখনও বিশেষ অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও ইণ্ডিয়া আপিসে সন্ধান করিলে 'বাঙ্গালা গেজেট'-এর কোন সংখ্যা আবিষ্কৃত হওয়া বিচিত্র নহে।

বাঙ্গালী প্রবর্ত্তিত প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

বাঙ্গালার প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র কি তাহা লইয়া অনেক দিন ধরিয়া নানা বাদানুবাদ চলিতেছে। 'সমাচার-দর্পণ'ই যে প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র ইতিপূর্ব্বে আমি তাহাই প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সমাচার-দর্পণ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২৩ মে শনিবার প্রথম প্রকাশিত হয়।

কাহারও কাহারও ধারণা 'বেঙ্গল গেজেট' নামক একখানি সংবাদ-পত্র 'সমাচার-দর্পণে'র পূর্ব্বে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। গঙ্গাকিশোর বা গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য তাহা বাহির করেন। পাদ্রী লঙ্ ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে সমাচার-দর্পণকে প্রথম সংবাদ-পত্র বলিয়াছিলেন, কিন্তু পরে ১৮৫৫ ও ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কোন ধাঁধায় পড়িয়া বেঙ্গল গেজেটকে প্রথম সংবাদ-পত্র বলিয়া বর্ণনা করেন। ইনি লেখেন যে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল গেজেট নামে প্রথম সংবাদ-পত্র বাহির হয়। গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য 'বিদ্যাসুন্দর', 'বেতালপঞ্চবিংশতি' প্রভৃতি পুস্তকের সচিত্র সংস্করণ বেচিয়া বেশ দু-পয়সা করেন। তারপর এই কাগজখানি বাহির করেন। অল্পকালের মধ্যে কাগজখানি উঠিয়া যায়। সম্প্রতি বেঙ্গল গেজেট সম্বন্ধে পুনরালোচনা পূর্ব্বে হইয়াছে। সেই আলোচনায় পূর্ব্বে প্রকাশিত মতগুলি ছাড়া কয়েকটি নূতন মতের অস্তিত্ব জানা গিয়াছে। তবে বেঙ্গল গেজেটের ফাইলও পাওয়া যায় নাই—উহার সঠিক প্রকাশ-কালও জানিতে পারা যায় নাই।

পাদ্রী লঙ্ গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের গ্রন্থের কথা লিখিয়াছেন। বিদ্যাসুন্দর, বেতাল-পঞ্চবিংশতি বলিয়া তাঁহার কোন গ্রন্থ ছিল না। এগুলি গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার 'বেঙ্গল গেজেটে' নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করেন—

> "মে. ফেরিস এন কোম্পানি সাহেবের
> ছাপাখানায় সিঘ্র প্রকাষ হইবেক
> অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর পুস্তক
> অনেক পণ্ডিতের দ্বারা শোধিয়া শ্রীযুত
> পদ্মলোচন চূড়ামণি ভট্টাচার্য্য মহাস
> য়ের দ্বারা বর্ন্ন সুদ্ধ করিয়া উত্তম বাঙ্গলা
> অক্ষরে ছাপা হইতেছে পুস্তকের প্রতি

উপক্ষণে এক২ প্রতিমুত্তি থাকিবেক মূল্য
৪ টাকা নিরূপণ হইল জাহার লইবার
ইচ্ছা হয় আপন নাম ছাপাখানায়
কিম্বা এই আপিষে শ্রীযুত গঙ্গাকিশোর
ভট্টাচার্য্যের নিকট পাঠাইবেন ইতি—"

তারপর ঐ সালেই তিনি রামচাঁদ রায়ের তৈয়ারি ছয়খানা ব্লক দিয়া 'অন্নদামঙ্গল' নামক গ্রন্থ ফেরিস কোম্পানীর ছাপাখানা হইতে প্রকাশ করে। ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ত্রৈমাসিক ইণ্ডিয়া'র প্রথম সংখ্যায় (পৃ. ১২২-২৩) এই সম্বন্ধে সামান্য একটু বিবরণ বাহির হয়। তাহা হইতে জানা যায়—গঙ্গাকিশোর প্রথমে শ্রীরামপুরে ছাপাখানায় কাজ করিতেন। তারপর বাঙ্গালা বই ছাপিয়া দু'পয়সা করিবার অভিপ্রায়ে ছাপাখানা করিবার কল্পনা করেন। কিন্তু আগে ছাপাখানা না করিয়া সাধারণের মন বুঝিতে চাহিলেন। যদি বইগুলির কাট্‌তি হয় তাহা হইলে তিনি ছাপাখানা করিবেন এই ভাবিয়া প্রথমে একেবারে নিজে প্রেস না করিয়া বুদ্ধিমানের মত পরের প্রেসে ছাপাইতে আরম্ভ করিলেন। এই য়ুরোপীয় কোম্পানীর ছাপাখানায় ছাপিয়া যখন দেখিলেন বেশ্ বিক্রয় হইতেছে, তখন তিনি নিজে একটি আফিস ও একটি বইয়ের দোকান খুলিলেন। ছয় বৎসর ধরিয়া কলিকাতায় অনেক বই ছাপিলেন। তারপর অংশীদারের সঙ্গে বনীবনাও না হওয়ায় প্রেসটি তিনি দেশে লইয়া যান। সেখান হইতে তিনি বাঙ্গলার শহরে ও গ্রামে লোক পাঠাইয়া বই বিক্রয় করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীরামপুর ছাপাখানা হইতে প্রথম সাপ্তাহিক পত্র সমাচার-দর্পণ প্রকাশিত হইল। ইহার দুই সপ্তাহের মধ্যে তিনি আর একখানি সাপ্তাহিক বাহির করেন। সত্বরই তাহা উঠিয়া যায়।

লেখকের উক্তি হইতে বোঝা যায় যে, গঙ্গাকিশোর বাঙ্গলা সাপ্তাহিকের প্রথম প্রকাশক, আর তাহা সমাচার দর্পণের প্রকাশের একপক্ষ মধ্যে প্রকাশিত হয়।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের মে-জুন মাসে প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র সম্বন্ধে বাদানুবাদ বাহির হয়। ১৮৩১ সালের ২৮এ মে তারিখে সমাচার-দর্পণে 'ধর্ম্মদত্ত' এই উপনাম দিয়া এক ব্যক্তি সমাচার লেখেন যে, দর্পণই প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র। কিন্তু পর মাসের ৬ তারিখের সমাচার-চন্দ্রিকায় অপর এক লেখক তাহার প্রতিবাদ করিয়া লেখেন—

"...৺গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য যিনি প্রথম 'অন্নদামঙ্গল' পুস্তক ছবি সহিত ছাপা করেন তিনি বাঙ্গালা গেজেট নামক এক সমাচারপত্র সর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা

নগরে প্রায় সর্ব্বত্র গ্রাহ্য হইয়াছিল কিন্তু ঐ প্রকাশক সাংসারিক কোন বিষয়ে বাধিত হইয়া তাঁহার নিজ ধাম বহরা গ্রামে গমন করাতে সে পত্র রহিত হয় তৎপরে দর্পণাবতার ঐ লেখক মহাশয়কে দর্শন দিয়াছেন। অতএব এ পদার্থ প্রথমে ব্রাহ্মণ কর্তৃক অনেকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

এই বাদানুবাদের উত্তরে ডাঃ মার্শম্যান্ বলেন (সমাচার-দর্পণ, ১১ জুন, পৃঃ ১৯৮) যে, সমাচার-দর্পণের প্রথম সংখ্যা বাহির হইবার দুই সপ্তাহ পরে বাঙ্গাল গেজেট বাহির হয় 'কদাচ পূর্ব্বে নহে'। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সমাচার-দর্পণে (পৃ. ১৪৪) লেখেন,—

"আমরা অবশ্যই স্বীকার করি সমাচারদর্পণ উপকারক কাগজ এবং এতদ্দেশীয় ভাষায় যে কএক কাগজের সৃষ্টি হইয়াছে এ সকলের অগ্রজ অনুমান হয় ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা গেজেট নামক এক সমাচারপত্র সর্জন হইয়াছিল বটে কিন্তু অতি শৈশবকালে তাহাও কালপ্রাপ্তি হয়। অতএব সমাচারদর্পণ প্রাচীন ও বিবিধ সংবাদ-প্রদ।"

এ পর্য্যন্ত গৌণ প্রমাণেই এ সম্বন্ধে আলোচনা চলিয়াছে। যখন 'বেঙ্গল গেজেট' বাহির হয় তখনকার কোন বিবরণ আজ পর্যন্ত কেহ বাহির করেন নাই। ত্রৈমাসিক 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'র প্রদত্ত মত সকলের চেয়ে পুরাতন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সময়ের লোক হইলেও ১৬।১৮ বৎসর পরে তাঁহার স্মৃতির ভুল হওয়া বিচিত্র বা অসম্ভব নয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বলেন, বিদেশীর প্রযত্নে বাঙ্গালা সমাচার পত্র প্রকাশিত হয় নাই। 'বেঙ্গল গেজেট' বাহির হইবার সময় তাঁহার বয়স ৪ কিংবা ৬ বৎসর। বিশেষতঃ ৩৮ বৎসর পরে তিনি যে উক্তি করিয়াছেন তাহাতে দেখা যাইতেছে তিনি প্রকাশকের নামটি পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। প্রকাশের বৎসর যে ভুলিতে না পারেন তাহাই বা কিরূপে বলা যাইতে পারে?

এখন এই সমস্ত মতবাদ ছাড়িয়া দিয়া আমরা অন্যদিক দিয়া 'বেঙ্গল গেজেট' সম্বন্ধে কিছু বলিব। মুখ্য প্রমাণ না হইলেও তৎসদৃশ প্রমাণ বলে আমরা এই কাগজ সম্বন্ধে নূতন তথ্য দিতে চেষ্টা করিব। 'বেঙ্গল গেজেট' যে বাহির হইয়াছিল সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা কে বাহির করিলেন? গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য—না, অপর কেহ?

১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২৩এ মে 'সমাচার দর্পণ' বাহির হয়। তাহার পর জুলাই মাসের ৯ তারিখে আর একখানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক প্রকাশের সংবাদ বাহির হয়।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুলাই তারিখে 'গভর্ণমেণ্ট' গেজেট-এ একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনটির প্রতিলিপি নিম্নে প্রদান করিলাম—

HURROCHUNDER ROY

Having established a BENGALEE PRINTING PRESS and a WEEKLY BENGAL GAZETTE, which he publishes on Fridays, containing the Translation of Civil Appointments, Government Notifications and Regulations, and such other LOCAL MATTER as are deemed interesting to the Reader, into a plain, concise and correct Bengalee language, and having spared no pains or trouble to render it as interesting as possible, earnestly hopes that in consideration of the heavy expenses which he has incurred. Gentlemen who have a knowledge and proficiency in that language, will be pleased to patronize his undertaking by becoming subscribers to this BENGAL GAZETTE. No publication of this nature having hitherto been before the Public, HURROCHUNDER ROY trusts that the community in general will encourage and support his exertions in the attempt which he has made, and afford him a small share of their Patronage.

Gentlemen wishing to become Subscribers to this WEEKLY PUBLICATION, will be pleased to send their names to HURROCHUNDER ROY, at his Press. No. 145, Chorebagan Street, where every information will be thankfully received. The Price of Subscription is 2 Rupees per month. Extras included.

Calcutta, Chorebagan Street, No. 145.

এই বিজ্ঞাপন হইতে অনেকগুলি খবর জানিতে পারা যায়। 'বেঙ্গল গেজেট' যে বাহির হইয়াছিল, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। সম্ভবতঃ বিজ্ঞাপন বাহির হইবার এক মাসের মধ্যে 'বেঙ্গল গেজেটে' বাহির হইয়া থাকিবে। ১৮২০ সালের 'ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া' বলিয়াছে, 'সমাচার-দর্পণ' বাহির হইবার এক বৎসরের মধ্যে এই সাপ্তাহিক বাহির হইয়াছিল। পাদ্রী মার্শম্যানও তাহা সমর্থন করিয়া

দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন, ইহার প্রকাশ সমাচার-দর্পণের 'কদাচ পূর্ব্বে নহে'। তবে ঠিক কোন্ তারিখে বাহির হইয়াছিল তাহা বলিবার মত উপকরণ এখনও আমাদের নাই। গঙ্গাধর বা গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য ইহার প্রকাশক ছিলেন না। পক্ষান্তরে প্রকাশক ছিলেন অপর ব্যক্তি—নাম "হরচন্দ্র রায়"। বেঙ্গল গেজেট ছিল সাপ্তাহিক—প্রতি শুক্রবারে বাহির হইত। ১৪৫ নং চোরবাগান ষ্ট্রীটে ইহার কার্য্যালয় ছিল এবং এই স্থান হইতেই ইহা মুদ্রিত হইত। এই সাপ্তাহিকের ছাপাখানা হরচন্দ্র রায়ের সম্পত্তি ছিল। বেঙ্গল গেজেটে সরকারী কাজে কর্ম্মচারী বাহালের (Civil Appointment) তর্জমা থাকিত। ইহাতে গভর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপন ও প্রবর্তিত আইনের সংবাদ থাকিত। আর থাকিত পাঠকদের রুচিকর স্থানীয় সংবাদ। এখানির ভাষা সরল বাঙ্গালা। মূল্য ছিল ডাক খরচ সমেত মাসিক তুই টাকা।

কাগজখানির মুদ্রণ ও প্রকাশস্থান ১৪৫ নং চোরবাগান ষ্ট্রীট। চোরবাগান ষ্ট্রীটের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। এখন চোরবাগান লেন আছে। ষ্ট্রীট লুপ্ত। কিন্তু এ ষ্ট্রীট কোথায় ছিল? ১৭৯৫-৯৭ সালের আপ্‌জনের মানচিত্রে মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, নেত্যদালাল ষ্ট্রীট ও মদন দত্ত ষ্ট্রীট আছে। Schlach-এর মানচিত্রেও (১৮২৫) মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটের দক্ষিণে পাওয়া যায় বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট। এই তুইটি রাস্তার মধ্যে একটা রাস্তার চিহ্ন আছে। সেখানে অনেকগুলো বাড়ির নম্বরও আছে। ১৭৫ নম্বরও আছে। যদি এইখানটা ১৪৫ নং চোরবাগান ষ্ট্রীট হয় তাহা হইলে বাঙ্গালীর প্রথম সাপ্তাহিকের এইটিই জন্মস্থান। আর এই জায়গাটা হওয়া সম্ভব। কেননা, আজও এই জায়গাটাকে লোকে চোরবাগান বলে। মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীটের (পশ্চিমাংশে) যেখানে ইহা চীৎপুরের সহিত মিশিয়াছে সেখানে তুটি ডাক্তারখানা আছে—নাম চোরবাগান ফার্মেসী, চোরবাগান ডিসপেনসারি। এখন এই প্রকাশক হরচন্দ্র রায় কে? কাগজপত্রে এইটুকু জানা যায় যে রামমোহন রায়ের আত্মীয় সভার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিল। তবে বহু অনুসন্ধানের পরে তাহার সম্বন্ধে কয়েকটি সংবাদ জানিতে পারিয়াছি। প্রাচীন লোকের মুখে সংবাদ। সত্য হওয়া সম্ভব—নাও হইতে পারে। তবে ভবিষ্যতে অনুসন্ধানের যদি কোন সুবিধা হয় তজ্জন্য কোন নজীর না থাকলেও যাহা শুনিয়াছি তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। হরচন্দ্র রায়ের বাড়ি শ্রীরামপুরে। তিনি কলিকাতায় থাকিবার সময় বহড়ার গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যকে মধ্যে মধ্যে পুস্তক মুদ্রণের জন্য অর্থসাহায্য করিতেন। তাঁহার কাগজ সাড়ে এগার মাস চলিয়া বন্ধ হইয়া যায় তাঁহার ছাপাখানার নাম ছিল "বাঙ্গাল গেজেট" অফিস—প্রেসও

বলিত। তখন ছাপাখানাকে অনেকে Printing offices বলিত। কাগজখানি বন্ধ হইয়া গেলে গঙ্গাকিশোর ছাপাখানাটি হরচন্দ্র রায়কে কিঞ্চিৎ রজত খণ্ড দিয়া বহড়ায় চলিয়া যান। হরচন্দ্রের পুত্রকন্যা ছিলেন তাঁহার আত্মীয় রামচাঁদ রায়ের পৌত্র শ্রীরামপুরবাসী (অধুনা নবদ্বীপবাসী) শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ রায়ের নিকট এই সংবাদগুলি সংগৃহীত হইয়াছে।

আমার প্রবন্ধ লিখিত হইবার পর শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বেঙ্গল গেজেট' সম্বন্ধে আমাকে জানাইয়াছেন :

বেঙ্গল গেজেট' সম্বন্ধে যে বিজ্ঞাপনটি প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা ১৯১৮ সালের ৯ই, ২৩এ ও ৩০ এ জুলাই তারিখে 'গবর্মেণ্ট গেজেটে' প্রকাশিত হয়। তখন 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কাগজখানি প্রকাশিত হইবার কয়েক দিন আগেও 'গবর্মেণ্ট গেজেটে' উহার একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল। বিজ্ঞাপনটি এইরূপ :—

HURROCHUNDER ROY begs leave to inform his Friends and the Public in general, that he has established a BENGALEE PRINTING PRESS, at No. 45, Chorebagan Street, where he intends to publish a WEEKLY BENGAL GAZETTE, to comprise the Translation of Civil Appointments, Government Notifications, and such other Local Matter, as may be deemed interesting to the Reader, into a plain, concise, and correct Bengalee Language, to which will be added the Almanack, for the subsequent Months, with the Hindoo Births, Marriages and Deaths.

Advertisement for insertion in the Gazette, will be received at 2 Annas per line. English and Persian, the same Price.

Gentlemen wishing to become Subscribers to this Weekly Publication, will be pleased to send their Names to HURRO-CHUNDER ROY, at his PRESS, No. 45, Chorebagaun Street, where every information will be thankfully received.

The Price of Subscription is 2 Rupees per Month, Extras included. *Calcutta*, 12*th May*, 1818. (*Government Gazette*, 14 May 1818.)

এই বিজ্ঞপনটি হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে, ১৮১৮ সনের ১২ই মে তারিখের অল্পদিন পরেই 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুর হইতে 'সমাচার দর্পণে'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—এই বৎসরের ২৩এ মে তারিখে। 'বেঙ্গল গেজেট' 'সমাচার দর্পণে'র কয়েক দিন আগে, কি কয়েক দিন পরে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা এখনও জোর করিয়া বলা যাইতেছে না। তবে 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশিত হইয়া যাইবার পর হরচন্দ্র রায় যে বিজ্ঞাপন দেন তাহার নিম্নলিখিত পংক্তিটি অনুধাবনযোগ্য ঃ—

"No publication of this nature having hitherto been before the Public…"

যাহা হউক, অনুসন্ধান যখন চলিতেছে তখন শীঘ্রই এ-সম্বন্ধে চরম কথা বলা সম্ভব হইবে।

উপরে গবর্ণমেণ্ট গেজেটের যে-যে সংখ্যার কথা বলা হইল তাহার সকলগুলিরই ফাইল কলিকাতার ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরিতে আছে।

বাংলার প্রথম মাসিক-পত্র

হরিহর শেঠ

বাংলার প্রথম মাসিক-পত্র 'দিগ্দর্শন'। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে জন্ ক্লার্ক মার্শম্যান উহা শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশ করেন। এই মার্শম্যান সাহেব বাংলা ভাষার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকা 'সমাচার দর্পণ'ও ইঁহার দ্বারা পরে প্রকাশিত হয়।

দিগ্দর্শন কয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা আমার ঠিক জানা নাই। দুই খণ্ড আমার হস্তগত হইয়াছিল।

তাহার প্রথম খণ্ডে প্রথম হইতে দ্বাদশ ভাগ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ত্রয়োদশ হইতে ষড়বিংশ ভাগ আছে। প্রথম খণ্ডে কোন মাসের কাগজে প্রথম পৃষ্ঠায় মাস বা সাল কিছুই লেখা নাই তবে ভিতরের পৃষ্ঠার শীর্ষদেশে মাস ও সাল লেখা আছে দেখে তাহা হইতে জানা যায়, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে ১৮১৯-এর মার্চ্চ পর্য্যন্ত প্রতি মাসে এক সংখ্যা করিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।

পত্রিকার নাম প্রথম প্রথম 'দিগ্ দর্শন' লেখা আছে ; পরে 'দিগদর্শন' এবং 'দিগ্দর্শন' উভয় প্রকারই দেখা যায়। আজকাল মাসিক পত্রে "সংখ্যা" যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন সে স্থলে "ভাগ" এই কথা ব্যবহৃত হইত। পত্রিকার আকার ডিমাই বার পেজির অপেক্ষা কিছু বড়। প্রথম দুই সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা করিয়া বাহির হইয়াছিল, পরে কিছু বেশী দেখা যায়। প্রথম বর্ষে নির্ঘণ্ট ও দিগ্দর্শনের অভিধান অংশ এগার পৃষ্ঠা বাদ মোট ২৭২ পৃষ্ঠা বাহির হইয়াছিল। দ্বিতীয় খণ্ডে ঐরূপ ৩০৭ পৃষ্ঠা ছিল। সমগ্র বৎসরের সূচিপত্র নির্ঘণ্ট নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই সূচিপত্রেরও কিছু বৈচিত্র্য দেখা যায়। প্রবন্ধের নাম ভিন্ন উহার অন্তর্গত বিষয়গুলিও পরপর অতি বিশদভাবে পত্রাঙ্ক সহিত দেওয়া আছে।

'দিগ্দর্শনের 'অভিধান' নাম দিয়া প্রত্যেক খণ্ডের শেষে অতি ক্ষুদ্রাকারের একখানি করিয়া বর্ণানুক্রমিক অভিধান আছে, উহা প্রথম খণ্ডে এগার এবং দ্বিতীয় খণ্ডে আট পৃষ্ঠা আছে। উহাতে প্রবন্ধান্তর্গত অপেক্ষাকৃত দুরূহ শব্দ ও তাহার অর্থ দেওয়া আছে। অবশ্য, অধিপতি—রাজা, কদর্ম—কাদা, ক্ষত—ঘা, এরূপ শব্দেরও অভাব নাই।

পত্রিকার ছাপা সুন্দর, অবশ্য কোন কোন অক্ষর বেশ পরিষ্কার নহে, কাগজ কিছু মোটা খস্‌খসে। প্রথম হতেই চতুর্থ সংখ্যার মধ্যে প্রবন্ধের ভাষাতে একমাত্র পূর্ণচ্ছেদ ভিন্ন অন্য কোন ছেদ দেখা যায় না। পঞ্চম হইতে ষোড়শ সংখ্যার ৮৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত কমা, সেমিকোলন ও ফুলষ্টপ মধ্যে মধ্যে আছে। পরে পুনরায় শেষ পর্য্যন্ত একমাত্র পূর্ণচ্ছেদের ব্যবহারই দেখিতে পাওয়া যায়। এই বৈচিত্র্যের কারণ নির্ণয় করা সহজ নহে।

রচনার মধ্যে সমস্তই গদ্য প্রবন্ধ, কবিতা একটিও নাই। লেখকের নাম কোন প্রবন্ধের সহিত বা নির্ঘণ্টপত্রে দেখা যায় না। প্রথম খণ্ডে দশম সংখ্যা পর্য্যন্ত যে-সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি দেশ-বিদেশের, জীবজন্তু, ধাতব দ্রব্যের বিবরণ; কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের কথা, বেলুনের কথা, পোর্ত্তুগীজদের প্রথম ভারতে আগমনের কথা, জলপ্লাবন প্রভৃতির কথায় প্রায় পূর্ণ। এই সকল প্রবন্ধে তৎকালীন ভাষা ও সাহিত্যের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাই উপভোগ্য, নচেৎ অন্য বিশেষত্ব কিছু নাই। 'হিন্দুস্থানের বাণিজ্য' ও 'ভারতবর্ষের স্বাভাবিক বৃক্ষ' এই প্রবন্ধগুলি হইতে সে সময়ের ব্যবসা-বাণিজ্য ও উৎপন্ন দ্রব্যাদির যে পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় অথবা 'বাষ্পের দ্বারা নৌকা চালান' এই প্রবন্ধে বাষ্পীয় পোত আবিষ্কারের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা আধুনিক মাসিক পত্রিকা-পাঠার্থীদের ভাল লাগিতে পারে মনে করিয়া তাহা হইতে নিম্নে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

একাদশ হইতে ষড়্‌বিংশতি সংখ্যা প্রধানতঃ হিন্দুস্থানের ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধেই পূর্ণ এবং উহা মুসলমানদের সময়ের কথা। ইহা ভিন্ন যে-কয়েকটি প্রবন্ধ আছে তন্মধ্যে 'বঙ্গভূমির মহাদুর্ভিক্ষ' এই প্রবন্ধটি জ্ঞাতব্য মনে হওয়ায় উহা হইতেও উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ইহাতে ইংরেজী ফুলষ্টপের ব্যবহার লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভাষার বিষয় আলোচনার দ্বারা বুঝাইবার প্রয়াস অপেক্ষা ভাষার নমুনা দেওয়াই শ্রেয়ঃ বিবেচিত হওয়ায় তাহাই করিলাম।

"হিন্দুস্থানের উৎপন্ন নানা দ্রব্য অন্য দেশীয় লোকেরদের অতিশয় উপকারক এদেশের ধনের এক প্রধান কারণ এই। এখানকার লোকেরা অন্য দেশের উৎপন্ন বস্তুর বড় আবশ্যক রাখে না অন্যত্র গ্রাহ্য বস্তু হিন্দুস্থানে বহুসংখ্যক উৎপন্ন হয় এই হেতুক অন্য২ লোকেরা এখানকার বস্তু ক্রয় করেণ বৎসর২ অনেক ধন এদেশে আনে।"—দিগদর্শন, প্রথম খণ্ড, ১০ পৃষ্ঠা।

"হিন্দুস্থানোৎপন্ন বস্তুদ্বারা অন্য২ দেশীয়েরদের বাণিজ্য হয় সে এই২ বস্তু। প্রথম নীল। ত্রিশ বৎসরের মধ্যে তাহার কৃষি বৃদ্ধি হইয়াছে এবং স্থানে২ প্রায়

ইংগ্লণ্ডীয় সম্পর্কীয় নীলের কুটী হইয়াছে। সেই নীল কাপড়ের নানা প্রকার রঙ্গ করিবার কারণ আবশ্যক। এবং অনুমান হয় যে হিন্দুস্থানে প্রতিবর্ষ আশী হাজার মোন নীল উৎপন্ন হয় যদি প্রত্যেক মোনের মূল্য দেড়শত টাকা হয় তবে সমুদয় নীলের মূল্য বৎসরে এককোটি বিশলক্ষ টাকার অধিক উৎপন্ন হয়। সকল নীল প্রায় ইংগ্লণ্ডে যায় ও সেখান হইতে গিয়া সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়।"—দিগদর্শন, প্রথম খণ্ড, ১১ পৃষ্ঠা।

"তুলা প্রথম বাঙ্গালাতে অনেক উৎপন্ন হইত এখন দোয়াবে অর্থাৎ গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তি দেশে অধিক উৎপন্ন হয়। যখন কলিকাতা নগরে তুলা আইসে তখন সেই তুলার রাশি জাহাজে অল্পস্থানে রাখিবার কারণ একটা মহাকালের দ্বারা চাপিয়া অতিক্ষুদ্র করা যায়। তুলা চীন দেশে প্রতি বৎসরে অধিক যায় এবং তিন চারি বৎসর হইল ইংগ্লণ্ডেও অনেক যাইতেছে এবং সেখানে সেই তুলাদ্বারা বস্ত্র উৎপন্ন হয় তাহাতে অনেক লোকে কার্য্য পায়।"—দিগদর্শন, প্রথম খণ্ড, ১১ পৃষ্ঠা।

"মগধ ও কাশীতে অনেক আফিম প্রতি বৎসর জন্মে। তাহার বাণিজ্য কেবল কোম্পানি বাহাদুরের অধীন তাঁহার আজ্ঞা বিনা অন্যের কোন অধিকার নাই। * * * মহাজন লোকেরা তাহা ক্রয় করিয়া চীন ও মালাই প্রভৃতি দেশে লইয়া যায়।"—দিগদর্শন, প্রথম খণ্ড, ১১-১২ পৃষ্ঠা।

"বস্ত্র বৎসরের মধ্যে হিন্দুস্থানে অনেক জন্মে ঢাকা অঞ্চলে অতিসূক্ষ্ম বস্ত্র জন্মে। গঙ্গানদীর উত্তরভাগে খাসা বস্ত্র জন্মে। বাঙ্গালার দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে লক্ষ্মীপুরের নিকটে বাপ্তা জন্মে। মেদিনীপুর ও উড়িষ্যাতে ও তাহার নিকটস্থ মহারাষ্ট্র দেশে শান জন্মে বীরভূমিতে গড়া জন্মে। আমেরিকা দেশে অধিক লোক কৃষি কর্ম্মে নিযুক্ত শিল্পব্যবসায় অধিক নাই এই হেতুক তাহারা কলিকাতা হইতে অধিক টাকার বস্ত্র ক্রয় করিয়া লইয়া যায় তাহারা ক্রয় কারণ কেবল ডলার আনিয়া থাকে। কিন্তু সম্প্রতি কতক দিনের মধ্যে ইউরোপ ও আমেরিকাতে এতদ্দেশীয়েরা স্ব স্ব দেশে বস্ত্রের শিল্পকর্ম্ম স্থাপন করিবার নিমিত্ত অনেক উদ্যোগ করিতেছে।" —দিগদর্শন, প্রথম খণ্ড, ১২ পৃষ্ঠা।

"রেশম রামপুর বোয়ালিয়া ও কুমারখালি ও জঙ্গীপুর ও কাশীমবাজার ও মালদহ প্রভৃতি কোম্পানির কুটীতে অনেক রেশম উৎপন্ন হয় সে যখন অন্য২ দেশে যায় সেই দেশে নানা রঙ্গ দিয়া নানা প্রকার বস্ত্র নির্ম্মাণ করে।"—দিগদর্শন, প্রথম খণ্ড, ১২ পৃষ্ঠা।

"হিন্দুস্থানের ষষ্ঠ উৎপন্ন সোরা তাহার দ্বারা বারুদ জন্মে। কোম্পানির বারুদ

খানাতে অনেক সোরা ব্যয় হয় এবং বিলাতেও অধিক চালান হয়।”—দিগদর্শন, প্রথম খণ্ড, ১৩ পৃষ্ঠা।

“কোন২ স্থানে কোন২ বৃক্ষজন্মানেতে অত্যুপযুক্ত যেমন চা চীন দেশ ভিন্ন অন্য দেশে ভাল জন্মে না তৎপ্রযুক্ত চীন দেশের বাণিজ্যের এক প্রধান বস্তু চা।”—দিগদর্শন, প্রথম খণ্ড, ২৭ পৃষ্ঠা।

“ভারতবর্ষের উৎপন্ন চিনি ইংগ্লণ্ডে গেলে বাণিজ্য চলিতে পারে এবং এই দেশে এত চিনি উৎপন্ন হয় যে ইংগ্লণ্ড দেশের তাবৎ ব্যায়োপযুক্ত কিন্তু চিনি প্রস্তুত করিতে এতদ্দেশীয় লোকেরা সুন্দর পারগ নহে এই হেতুক এতদ্দেশীয় চিনি আমেরিকার নিকটস্থ উপদ্বীপজাত চিনির মত অন্য দেশে লইবার উপযুক্ত নয়।” —দিগদর্শন, প্রথম খণ্ড, ২৮ পৃষ্ঠা।

“তামাকু ইংগ্লণ্ডে তাহার কৃষি হয় না ভারতবর্ষেও পূর্ব্বে জন্মিত না কিন্তু আমেরিকা জানা গেলে পোর্ত্তুগীশেরা সেখান হইতে এদেশে আনিল।”—দিগদর্শন, প্রথম খণ্ড, ২৮ পৃষ্ঠা।

“তুলা এখানে অধিক জন্মে ইংগ্লণ্ডে কিছুই জন্মে না অতএব এদেশ হইতে বৎসর২ অনেক তুলা ইংগ্লণ্ডে যায়।”—দিগদর্শন, প্রথম খণ্ড, ২৯ পৃষ্ঠা।

“নীল ইংগ্লণ্ডে জন্মে না আমেরিকাতে জন্মে যখন এদেশে নীল ব্যবসায় না ছিল তখন সেখান হইতে নীল ইংগ্লণ্ডে যাইত কিন্তু এখন এদেশে অতিশয় ও উত্তম নীল জন্মানেতে এখান হইতেই এখন যাইতেছে আমেরিকা হইতে ইংগ্লণ্ডে তাহার রপ্তানি নিবৃত্ত হইয়াছে।”—দিগদর্শন, প্রথম খণ্ড, ২০ পৃষ্ঠা।

বঙ্গভূমির মহাদুর্ভিক্ষ

“বঙ্গভূমির প্রধান উৎপন্ন বস্তু ধান্য, তাহার অনেক অন্য২ দেশ প্রেরিত করা যায়, দৈবাৎ কখন ফসল না জন্মিলে দুর্ভিক্ষ হয়, এইরূপ দুর্ভিক্ষ বঙ্গভূমিতে ও হিন্দুস্থানের অন্য ভাগে কখন২ হইয়াছিল, সন ১৭৭০ সালে বাঙ্গালা দেশে এইরূপ অতিঘোর দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তৎকালে নবাব ও ভাগ্যবান লোকেরা দরিদ্র লোকেরদের মধ্যে অনেক তণ্ডুল দান করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে তাঁহাদের ভাণ্ডার শূন্য হওয়াতে দান নিবৃত্ত হইল, ইহাতে অনেক দুঃখি লোক জীবনোপায় প্রত্যাশাতে তৎকালীন ইংগ্লণ্ডীয়দের প্রধান বসতিস্থান কলিকাতায় আইল, কিন্তু তখন কোম্পানীর ভাণ্ডারে দ্রব্যাভাবপ্রযুক্ত তাহারদের কোন উপায় হইল না, ইহাতে সে দুর্ভিক্ষারম্ভের দুই সপ্তাহ পরে সহস্র২ লোক রাজপথে ও মাঠে স্থানে২ পড়িয়া মরিল, এবং কুক্কুর

ও শকুনি দ্বারা ঐ সকল মৃত শরীর ছিন্ন ভিন্ন হওয়াতে বায়ু অনিষ্টকারী হইল, তাহাতে সকলের ভয় জন্মিল যে এই দুর্ভিক্ষের পশ্চাতে মহামারী আসিতেছে, কোম্পানীর প্রেরিত একশত লোক নিযুক্ত ছিল, তাহারা ডুলি ও ঝোড়া দ্বারা ঐ সকল মৃত শরীর নদীতে ফেলিত, তৎপ্রযুক্ত নদীর জল এমত শবেতে পূরিল যে তাহার মৎস্য অখাদ্য হইল, এবং অনেক মৎস্যভোজী তৎক্ষণাৎ মরিল, * * *

এই মহাদুর্ভিক্ষ জলাভাবপ্রযুক্ত হইয়ছিল, বঙ্গভূমিতে দুই ফসল জন্মে, এক ফসল ক্ষুদ্র শস্য ও অন্য, মহাফসল ধান্যাদি জন্মিল না এবং সন ১৭৭০ সালেও ক্ষুদ্র ফসল জন্মিল না ইহাতেই পূর্ব্ব লিখিত দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছিল।

এই দুর্ভিক্ষ অদ্যাপি বঙ্গভূমিস্থ লোকেরদের মন হইতে লুপ্ত হয় নাই এবং অনেক বৃদ্ধ লোকেরা আপনারদের যৌবনকালীন ক্রিয়ার সময় সেই দুর্ভিক্ষ বৎসরদ্বারা গননা করেন, সেই সময়ে কলিকাতার উচ্চপদস্থ একজন ইংগ্রণ্ডীয় সাহেব দানার্থে তণ্ডুল সঞ্চয় করিতে উদ্যোগ করিলেন এবং লোকেরা স্ব২ আহারার্থ স্ব২ সন্তান বিক্রয় করিতে উদ্যোগ হইল, ইহাতে স্নেহ বিনিময়ে যৎকিঞ্চিৎ কালের আহার মাত্র তাহারা পাইল ঐ সাহেব আপন চাকরেরদিগকে আজ্ঞা করিলেন যে যত বালক বিক্রয় করিতে আসিবেক তাহারদিগকে ক্রয়কর, এবং যাবৎ দুর্ভিক্ষ থাকিবেক,তাবৎ তাহারদিগকে আহার দেও ইহাতে অনেকশত বালক তাহার দয়াপ্রযুক্ত মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইল, পুনর্ব্বার সুভিক্ষকাল হইলে সর্ব্বত্র ঘোষণা দিলেন যে যে২ লোকের সন্তান আমার এখানে আছে তাহারা লইতে চাহিলে বিনামূল্যে তাহারদিগকে পাইবেক, এই আশ্চর্য্য যে ইহা শুনিয়াও পুত্র লইতে কেহই আইল না, কেবল এক বৃদ্ধা স্ত্রী বধির ও বোবা আপনার পুত্রকে লইতে আসিল"—দিগ্‌দর্শন, দ্বিতীয় খণ্ড, ৮১-৮৪ পৃষ্ঠা

বাষ্পের দ্বারা নৌকা চালানের বিষয়ে।

বাষ্পের জোর অতিবড় এই হেতুক ইউরোপ দেশেও তাহার দ্বারা অনেক কল ঘূরাণ যায়। অনেক শিল্প কর্ম্মদ্বারা বাষ্পের কল হয় কিন্তু কল একবার প্রস্তুত হইলে পরে অনায়াসে খেলে এবং যে কল অন্যরূপে ঘূরান অতিদুষ্কর তাহা বাষ্পের দ্বারা অতি সহজে ঘূরাণ যায়। কতক বৎসর হইল আমেরিকা দেশে এক সাহেব বুঝিল যে দাঁড় ব্যতিরেকে এই কল দ্বারা নৌকা চালান যায় এই কারণ এক নৌকা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে দাঁড় না দিয়া এইরূপ কল তাহার মধ্যস্থানে দিল। এবং নৌকার দুই পার্শ্বে দুইটা চক্র দিল সেই চক্র কলের

সহিত সংলগ্ন অথচ ঐ কল দ্বারা ঘোরে ঐ চক্রের বাহিরে কতক দাঁড় লাগাইল চক্রের ঘূরাণেতে ঐ দাঁড় জলের মধ্যে গমন করিল যখন কল ঘূরিল তখন ঐ চক্রও ঘূরিল এবং তাহার সহিত সংলগ্ন দাঁড়ের চলনেতে নৌকা অনায়াসে চলিল। এই প্রকারে কর্ম্মসিদ্ধি দেখিয়া অন্য লোকেও সেইরূপ করিল এবং ইউরোপ ও আমেরিকার সর্ব্বত্র তাহার প্রচার হইয়াছে এই কলযুক্ত যে নৌকা সে অতিবড় তাহার মধ্যে কোন২ নৌকায় দুইশত লোক অনায়াসে আহারাদিও শয়ন প্রভৃতি করিতে পারে এ মহানৌকা ক্ষুদ্র জাহাজের তুল্য জলে ও বায়ুর প্রতিকূলেও দণ্ডে এক ক্রোশ চলে এবং অতি স্থির রূপ দিবারাত্র চলে চড়ন্দার লোকে জ্ঞান করে না যে নৌকা চলিতেছে।—দিগদর্শন, প্রথম খণ্ড, ৩০-৩১ পৃষ্ঠা।

গেরাশিম লেবেডেফ ও বাংলা মুদ্রণ

দীপঙ্কর সেন

১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে গেরাশিম লেবেডেফ আমাদের দেশ থেকে চলে গিয়েছিলেন। ব্রিটিশ জাহাজ লর্ড টার্লোর অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের উপকূলে অবতরণ করেছিলেন লেবেডেফ। ১৭৯৯-এর মস্কোভস্কি ভেডোমস্টিতে (মস্কো গেজেট) সংবাদ দেওয়া হয়েছিল : "ভারত প্রত্যাগত একজন রুশ সঙ্গীতজ্ঞ সবেমাত্র লণ্ডনে পৌঁছেছেন। তিনি বাংলা এবং হিন্দি 'আরিয়ার' (arias) একটি সঙ্কলন প্রকাশ করবেন ব'লে স্থির করেছেন। ['ওপেরার' (অপেরা) উচ্চ মার্গের গানের ভিতর দিয়ে তার নাট্যীয় রস সম্পূর্ণভাবে ফুটে ওঠে না বলে সহজ, সরল কাব্যের মাধ্যমে তার আখ্যানভাগের অংশবিশেষ বর্ণনা করা হয়। এইজন্যই য়ুরোপীয় ওপেরা বর্ণনাত্মক এবং লিরিক এই দুটি অংশে বিভক্ত। বর্ণনাত্মক অংশটির নাম রেসিটেটিভ, যাতে থাকে ওপেরার কাহিনী। লিরিক অংশটির নাম হ'ল আরিয়া। আরিয়ার মধ্য দিয়ে গায়ক এবং গায়িকারা তাঁদের গলার অতি সূক্ষ্ম কাজগুলি ফুটিয়ে তোলেন।] বাংলা এবং হিন্দি এই দু'টি ভাষার সঙ্গে বাংলা এবং হিন্দি সঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান আছে বলেই আশা করা যায়। প্রাচ্যের সঙ্গীত সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ য়ুরোপীয়দের মধ্যে প্রাচ্যীয় সঙ্গীতকে জনপ্রিয় ক'রে তুলতে তিনি পারবেন।"

লেবেডেফের নাম ভারতবর্ষ এবং সোভিয়েট রাশিয়ায় সমভাবে পরিচিত। এই প্রতিভাশালী সঙ্গীতজ্ঞ, শিল্পী এবং বিজ্ঞানী ভারতবর্ষে ছিলেন বারো বছর। আমাদের দেশ হয়ে উঠেছিল তাঁর দ্বিতীয় মাতৃভূমি। বাংলা থিয়েটারের প্রবর্তক হিসাবে তিনি যা করেছেন তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে রয়েছে। প্রচলিত ইতিহাস বলছে—সাধারণভাবে আমরা জানি যে প্রথম বাংলা নাটক এবং নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব একজন রুশদেশবাসীর—নাম গেরাশিম স্টেপানোভিচ লেবেডেফ (১৭৪৯-১৮১৭ খ্রীঃ)। তিনি এম জডরেল প্রণীত 'দি ডিসগাইজ' নাটকের বঙ্গানুবাদ 'কাল্পনিক সংবদল' নামে মঞ্চস্থ করেন। (প্রথম অভিনয় : ২৭ নভেম্বর, ১৭৯৫ খ্রীঃ ; দ্বিতীয় অভিনয় ২১ মার্চ, ১৭৯৬ খ্রীঃ)। এ ব্যাপারে তাঁর প্রধান উৎসাহদাতা ও সহকর্মী ছিলেন তাঁর ভাষা-শিক্ষক গোলকনাথ দাস। বস্তুতঃ এই শেষোক্ত ব্যক্তিই অভিনেতা-অভিনেত্রী

সংগ্রহের ভার নেন। মাত্র তিন মাসের প্রস্তুতিতে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। এই অল্প সময়ের মধ্যে লেবেডেফ ২৫ নম্বর ডোমটোলায় (বর্তমান এজরা স্ট্রীট) একটি নাট্যশালা নির্মাণ করেন। কোম্পানির (সরকারী) রঙ্গালয়ে অভিনয় করার অনুমতি না পাবার জন্যই নিজস্ব অভিনয়-গৃহ প্রস্তুত করতে হয়।

'কাল্পনিক সংবদল' সাফল্যের সঙ্গে দু রাত্রি অভিনীত হবার পর কলকাতার বাইরে গ্রামাঞ্চলে অভিনয় করার ইচ্ছাও লেবেডেফের ছিল। সেইমত একটি বিজ্ঞাপনও দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সে ইচ্ছা পূরণ করতে পারেন নি। বাধা এসেছিল ব্রিটিশ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নাট্যশালার কর্মকর্তাদের কাছ থেকে। তাঁদের চক্রান্তে প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় ভারতবর্ষ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি।

ভারতবর্ষে থাকার সময় লেবেডেফ কি করেছেন তা নিয়ে ভারতবর্ষে এবং রুশদেশে বিস্তারিত গবেষণা করা হয়েছে। কিন্তু স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি কি করেছেন সে খবর অনেকেই তেমন রাখেন না। অথচ অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি যেভাবে তাঁর ভারতচর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন তা আমাদের শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের সঞ্চার করে। প্রকৃতপক্ষে দেশে ফেরার পর তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্যই হয়ে উঠেছিল ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব এবং ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চা। হিন্দি এবং বাংলা গানের 'আরিয়া' প্রকাশ করতে তিনি পেরেছিলেন কিনা সে খবর পাওয়া যায় না। কিন্তু ১৮০১ সনেই তাঁর 'গ্রামার অভ দি ক্যালকাটা ডায়ালেক্ট অভ স্পোকেন হিন্দুস্থানী' লণ্ডনে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই বছরেই তিনি নিজের দেশে ফিরে যান। আগেই বলেছি তিনি এদেশ থেকে অনেক টাকা নিয়ে যেতে পারেন নি। তার পরিবর্তে নিয়ে গিয়েছিলেন আরো বেশি মূল্যবান এক সম্পদ। আমাদের দেশের ভাষা এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে গবেষণালব্ধ নানাবিধ তথ্য। এগুলি কি শ্রেণীর জিনিস ছিল সে সম্পর্কে স্বভাবতই কৌতূহল বোধ করি আমরা। মস্কোর জাতীয় মহাফেজখানায় এর কিছু কিছু অংশ সংরক্ষিত হয়েছে। তা ছাড়া লেবেডেফের সমসাময়িক পণ্ডিতমণ্ডলীর মতামত কিংবা মন্তব্য অনুধাবন ক'রেও এ বিষয়ে একটি ধারণা মনে আনা যায়। এর উপর আছে লেবেডেফের নিজের লেখা কিছু চিঠিপত্র।

লেবেডেফের পাণ্ডুলিপির মধ্যে রয়েছে বাংলা করলিপির বিধি সংক্রান্ত একটি গ্রন্থ, হিন্দুস্থানী অভিধান এবং ব্যাকরণ, ভারতীয় ভাষার সংলাপের সংকলন, ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের নরনারীর আচার ব্যবহার এবং জীবনযাত্রার পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু টীকা-টিপ্পনী, এবং ভারতীয় গণিতশাস্ত্রের মূলনীতি, নিয়মসূত্র, তত্ত্ব বা উপাদান

সম্পর্কে একটি পাণ্ডুলিপি। তাঁর পাণ্ডুলিপির সংগ্রহের মধ্যে বিখ্যাত সংস্কৃত সমার্থক শব্দের অভিধান 'অমরকোষ' এবং রূপকথার সঙ্কলন 'হিতোপদেশ'ও আছে।

দেশে ফেরার পর লেবেডেফ যে কেবল ভারতচর্চা ছাড়েন নি তাই নয়। তিনি রাশিয়ার মানুষের কাছে ভারতীয় মনীষার আসল রূপটি উদ্‌ঘাটিত করার চেষ্টা করেছিলেন। কাজটি খুব সহজ ছিল না। কারণ ভারতবর্ষের সঙ্গে রাশিয়ার তখন কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। সামান্য যা কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য দুটি দেশের মধ্যে চলত তা সম্ভব হত ইংরেজ বণিকদের মধ্যস্থতায় এবং ইংরেজ সওদাগরদের জাহাজের মাধ্যমে। সে যুগে রাশিয়ার কোন বিদ্যালয়েই প্রাচ্য ভাষা শেখানো হত না। সুতরাং লেবেডেফের সব কাজই গোড়ার থেকে শুরু হয়েছিল। রাশিয়ার মাটিতে পদার্পণ ক'রেই তিনি সে কাজ শুরু করেছিলেন। প্রথমেই একটি ছাপাখানা খুলে সেখানে ভারতীয় কয়েকটি ভাষার আলগা হরফ ব্যবহার ক'রে মুদ্রণের কাজ শুরু করলেন। সম্ভবত তাঁর আগে য়ুরোপীয় ভূখণ্ডে এ কাজ আর কেউ করেন নি। ১৮০৫ সনে ভারতীয় ধর্মবিশ্বাস, আচার-আচরণ এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে রচিত গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থের উদ্ধৃতিগুলি বাংলা হরফে মুদ্রিত বাংলা ভাষায়।

এ যে কত বড় কাজ তা বুঝতে আজকের দিনে আমরা অনায়াসেই পারি। কারণ তার মাত্র পঁচিশ বছর আগে খোদ বঙ্গভূমির হুগলীতে এক অ্যাণ্ড্রুজ সাহেবের ছাপাখানার বাংলা ভাষার প্রথম আলগা হরফের ব্যবহার হয়েছে ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হলহেডের রচিত 'গ্রামার অভ দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ-এর জন্য। লেবডেফের বইটি যেমন মূলত একটি রাশিয়ান ভাষায় রচিত পুস্তক, হলহেডের গ্রন্থটিও তেমনি একটি ইংরেজী বই ছাড়া আর কিছু নয়। আর দুটিতেই বাংলা অক্ষরে বাংলা শব্দ মুদ্রিত হয়েছে। নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে গেলে বলতে হয় এই কীর্তির জন্য লেবডেফকে একটু বেশি তারিফ করা প্রয়োজন। কারণ তিনি যা করেছিলেন—তার জন্য তাঁকে এককভাবে প্রচেষ্টা করতে হয়েছিল। হলহেডের গ্রন্থ মুদ্রণের কৃতিত্ব তাঁর থেকে কম একথা আমি বলছি না। কেবল এটুকুই বলতে চাইছি যে বঙ্গভূমিতে সরকারী আনুকূল্যে একটি গ্রন্থ মুদ্রণের যে সুযোগসুবিধা হলহেড পেয়েছিলেন লেবেডেফ তেমন কিছুই পান নি। সেই দিক থেকে তাঁর ভারতচর্চার প্রয়াস খুবই প্রশংসনীয়। হলহেডের ব্যাকরণের সীমিত হ'লেও কিছু পাঠক ছিল। প্রমাণস্বরূপ বলতে পারি যে গ্রন্থটির নামপত্রে সংস্কৃত ভাষার লেখক ঘোষণা করেছিলেন 'ফিরিঙ্গিদের' উপকারার্থে বইটি রচিত হয়েছে। কথাটি পুরোপুরি সত্য, কারণ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্রিটিশ কর্মচারীদের বাংলা শেখাবার

জন্যই রইটি রচিত হয়েছিল। অপরদিকে লেবেডেফের রচনার কোন নির্দিষ্ট পাঠক-গোষ্ঠি ছিল না।

আজ থেকে এক শ তিয়াত্তর বছর আগে প্রকাশিত এই গ্রন্থের অনেক কিছুই এখন পুরনো হয়ে গেছে একথা বলাই বাহুল্য। আফানাসি নিকিতিন-এর 'ট্রাভেলস বিয়ণ্ড থ্রি সিজ' ছাড়া অন্য কোন রাশিয়ান পর্যটকের রচনায় ভারতবর্ষের কথা এত বিশদভাবে বলা হয়নি। তাই লেবেডেফের গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য অসাধারণ।

নিজের দেশে ফিরে যাবার পর তৎকালীন রুশ সরকারের বৈদেশিক দফতরে অনুবাদকের পদ গ্রহণ করেছিলেন লেবেডেফ। এই পদে বেতন ভালই পেতেন তিনি। ক্ষতি হয়েছিল অন্যভাবে। গবেষণার জন্য তিনি সময় দিতে পারতেন না। সেই জন্যই তাঁর বহু মূল্যবান রচনা ছাপিয়ে নেবার সময়ও তিনি পাননি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাংলা, হিন্দী, রাশিয়ান এবং ইংরেজির সমার্থক শব্দ সঙ্কলন ক'রে একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের অভিধান রচনায় তিনি ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর আশা ছিল শেষ পর্যন্ত এই গ্রন্থ মুদ্রণের কাজ তিনি ক'রে যেতে পারবেন। বিভিন্ন লোকের কাছে তাঁর লেখা চিঠিগুলো পড়ে তাই মনে হয়। কিন্তু তাঁর এ স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হয়ে ওঠে নি। লেবেডেফ ১৮১৭ সনের ১৫ই জুলাই মারা যান। তাঁর সমাধিফলকে রুশদেশের ভারতচর্চার পথিকৃৎ রূপে তাঁকে স্বীকৃতি দান ক'রে একটি কবিতা রয়েছে। আজও ভারতবর্ষ সম্পর্কে আগ্রহী নরনারী তীর্থ-স্থানের মত সেই সমাধি পরিদর্শন করেন।

লেবেডেফের জীবদ্দশায় প্রাচ্য সম্পর্কে তৎকালীন রুশদেশের মানুষের তেমন কোন আগ্রহ অথবা কৌতূহল ছিল না বলেই তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তাঁর এই অসামান্য কাজের জন্য যোগ্য সমাদর লাভ করেন নি। সমস্ত জিনিসটির প্রকৃত মূল্যায়ন হয়েছে তাঁর মৃত্যুর প্রায় দু শ বছর পরে। আজ রুশদেশে ভারতবর্ষ তথা প্রাচ্য সম্পর্কে অসীম আগ্রহ। পশ্চিম য়ুরোপের ক্লান্ত সভ্যতায় ভারতচর্চা সম্পর্কে কোন আগ্রহ নেই বললেও চলে। পঞ্চাশের দশকে রুশদেশে যখন রবীন্দ্রনাথের কীর্তি নিয়ে নতুন ক'রে গবেষণা শুরু হয়েছে, তাঁর সাঙ্কেতিক নাটক-গুলো মঞ্চস্থ হচ্ছে তখন ইংলণ্ডের বড় বড় গ্রন্থাগারে রবীন্দ্রনাথ একটি বিস্মৃত নাম। তাঁর রচনাবলী লাইব্রেরীর ভাণ্ডারে সংরক্ষণ ক'রে রাখা হয়েছে। কারণ তার পাঠক নেই। কিন্তু রুশদেশে, পূর্ব জার্মেনীতে এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ-গুলিতে ভারতচর্চার কাজ ক্রমাগতই এগিয়ে চলেছে। লেবেডেফের কীর্তি পরম-পরিপূর্ণতায় রূপায়িত হয়েছে রুশদেশের পরবর্তী যুগের মানুষের কাজের মধ্য দিয়ে।

সাধারণ গ্রন্থাগার ও জাতীয় উন্নয়ন

জে. এ. চ্যাপম্যান

ভারতবর্ষে আমাদের একটিও এমন সুন্দর গ্রন্থাগার নেই যাকে এই দেশের সমান বৃহৎ কোনও একটি দেশের প্রধান গ্রন্থাগারের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। সমান বলতে এখানে আমি দেশের আকৃতি এবং গুরুত্ব বোঝাতে চেয়েছি। এমন কি ছোট ছোট দেশ যেমন সুইজারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশের যে প্রধান গ্রন্থাগারগুলি রয়েছে—তাদের সঙ্গেও এখানকার গ্রন্থাগারগুলির তুলনা চলেনা। শুধু তাই নয়, আমি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলতে পারি—সেখানকার গ্রন্থাগারগুলির গৃহ, পুস্তক সংখ্যা, সূচীকরণ ও নির্ঘণ্ট প্রভৃতি থেকে ভারতবর্ষে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। এর কারণ সেখানে বডলিয়ান (Bodleian), দি বিবলিও-থিকিউ ন্যাশনাল (the Bibliotheque National)-এর মত এত সুন্দর সুন্দর গ্রন্থাগার রয়েছে বা এদের থেকে ছোট যেগুলি রয়েছে সেগুলিও আমাদের ভারত-বর্ষের গ্রন্থাগারগুলির থেকে অনেক অনেক গুণ ভাল। এর কারণ কিন্তু এই নয় যে সেখানকার শাসকশ্রেণী এবং জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরাই এগুলি তৈরী করেছেন। আসলে ওই সমস্ত দেশের সাধারণ মানুষ, যারা এই দেশের আপনার আমার মতই সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ তাঁরাই গ্রন্থাগারের জন্য উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করে বলেছেন—"আমরা পড়তে চাই, শিখতে চাই—আমাদের পড়ার জন্য বই চাই, পড়া শেখার জন্য শিক্ষক চাই।" তাঁরা এই দাবী তুলতে পেরেছেন বলেই সেইসব দেশের সরকার গ্রন্থাগার তৈরী করতে জনগণকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আজকের ভারতবর্ষে যে নামী দামী গ্রন্থাগার নেই তার জন্য দায়ী এই দেশের জনগণ। কারণ আপনারা, এই দেশের নাগরিকেরা বিধানসভা ও আইনসভার কাছে আত্মপ্রত্যয়ের সাথে এই দাবী পরিষ্কার করে তুলে ধরতে পারেননি যে গ্রন্থাগার স্থাপনের মত মহৎ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে হবে বা যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তা বৃদ্ধি করতে হবে।

দি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী

আপনারা ভাবছেন যে আমি একটা ভুল তথ্য পরিবেশন করে আপনাদের কাছে অপরাধীতে পরিণত হচ্ছি। কারণ এখানে ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরীর মত মূল্যবান গ্রন্থাগার আছে। আমি স্বীকার করছি যে সঠিক কথা বলিনি। কিন্তু

এর জন্য আপনারা কার কাছে ঋণী ? এই গ্রন্থাগারটি কি আপনাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা বা প্রচেষ্টার ফসল ? না, এই ইম্‌পেরিয়াল লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার সঠিক তথ্য হল এই যে আপনারা এমন একজন মানুষকে ভাইসরয় হিসাবে পেয়েছিলেন যাঁর চরিত্র অন্যান্য ভাইসরয়দের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। অনেক কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর মনের মধ্যে বিশেষ কিছু চিন্তাভাবনা ছিল। লর্ড কার্জনের মনোজগত এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভারাক্রান্ত থাকলেও, তার মধ্যেও তিনি ফলপ্রসূ পরিকল্পনা করতেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে ভারতবর্ষে উন্নতমানের গ্রন্থাগার নেই। তাই তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই ইম্‌পেরিয়াল লাইব্রেরী। শুধু প্রতিষ্ঠা করেই তিনি থেমে যাননি। তিনি লণ্ডনে পুস্তক ব্যবসায়ীদের কাছে দুষ্প্রাপ্য পুস্তকের তালিকা পাঠিয়ে, সেগুলি সরবরাহ করতে বলতেন। শুধু তাই নয় সমস্ত বইয়ের দাম তিনি নিজের আয় থেকেই দিতেন এবং বইগুলি গ্রন্থাগারে উপহার দিয়ে দিতেন। তবে তিনি শর্ত করে নিয়েছিলেন যে এই বইগুলি পাঠকক্ষে বিশেষ সংরক্ষিত স্থানে রক্ষিত হবে এবং তাঁর নাম লেখা থাকবে। এটা কিন্তু তিনি আত্মমহিমা প্রচারের জন্য করেননি। এর কারণ তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, এই সংরক্ষিত স্থানে রক্ষিত বইগুলি দেখে অন্যান্য ভাইসরয়েরা "অবশ্যই গ্রন্থাগারে যাবেন ও ওনার মতই কর্মসূচী গ্রহণ করবেন।"

লর্ড কার্জনের প্রিয় সন্তান

লর্ড কার্জনের চিন্তার অতীত ছিল যে ইম্‌পেরিয়াল লাইব্রেরী তাঁর উত্তরসূরী হবে না। এই গ্রন্থাগারটি ছিল তাঁর প্রিয় সন্তান—কারণ তিনি ছিলেন নিঃস্বার্থ মনের মানুষ। তাঁর মন অন্যান্য মানুষের মনের মত সমভাবাপন্ন ছিল না। কিন্তু ইম্‌পেরিয়াল লাইব্রেরী তাঁর উত্তরসূরী কোনও ভাইসরয় বা বাংলার কোনও গভর্নরের কাজেই তাঁদের প্রিয় সন্তান হয়ে উঠতে পারেনি। তাই লর্ড কার্জনের পরে কোনও ভাইসরয় এই গ্রন্থাগারটি পরিদর্শন করেননি। কেবলমাত্র একজন বাংলার গভর্নর গ্রন্থাগারটি পরিদর্শনে এসেছিলেন। কারণ তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল পরিদর্শনের জন্য। তাই তিনি কেবলমাত্র এসেছিলেন ও দেখে, ঘুরে, ফিরে চলে গিয়েছিলেন।

গ্রন্থাগারগুলির মূল্য

কেন আমি এইসব বিষয়ের ওপর এত গুরুত্ব আরোপ করছি। কারণ আপনারা যাতে সহজে বুঝতে পারেন যে আপনারা কখনই ভাইসরয় গভর্নরদের ও প্রশাসনিক কর্তাদের বিশ্বাস করবেন না—কারণ এঁরা কখনই ভারতবর্ষকে তার ঈপ্সিত গ্রন্থাগার দেবেনা। আমি বিশ্বাস করি, আপনারা বুঝতে পারছেন যে আপনাদের দাবী করতে হবে। আপনারা কি করে চিন্তা করেন যে বই না পড়ে আপনারা বড় দেশগুলির সমকক্ষ হতে পারবেন? আপনারা কি করে আশা করেন জাপানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার—যে দেশের গ্রন্থসংগ্রহ অতুলনীয় বিশেষতঃ প্রযুক্তি বিজ্ঞানের সংগ্রহ যাদের অসংখ্য। এমন কি অষ্ট্রেলিয়া, যে দেশকে বয়সে নবীনই বলা চলে, যার জনসংখ্যা স্বল্প এবং যাদের অধিকাংশের জীবিকা মেষপালন, সেই দেশেও ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগারের চেয়েও অন্ততঃ ছটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার রয়েছে। ভারতবর্ষ পুণ্য বেদভূমি, শিক্ষার দেশ, বিদ্বৎজনের দেশ—বহু শতাব্দী ধরে যার মূল্যমান আজও অম্লান।

ভারতীয়দের কর্তব্য

যদি ভারতবর্ষের জনসাধারণ আত্মসজাগ হন এবং অন্যান্য দেশের সাধারণ জনগণের মতই গ্রন্থাগার আন্দোলনে (বর্তমানের ভাষা) অংশীদার হতে পারেন, ততখানি মূল্য আপনাদের দিতে হবে না। আপনারা খুব শীঘ্রই দেখতে পাবেন বোম্বাই, মাদ্রাজ, করাচীতে একটি করে নিজস্ব বৃহৎ গ্রন্থাগার স্থাপন করা হবে এবং জনসংখ্যার আধিক্য যেখানে কম সেখানেও গ্রন্থাগার স্থাপিত হবে। কিন্তু সেই গ্রন্থাগারগুলিতে সবই পুরানো বই থাকবে, কাজেই নূতন বই ও তার প্রকাশনার প্রশ্ন থেকেই যায়।

নূতন বইয়ের প্রকাশনা

গ্রন্থাগার বৃদ্ধির সাথে সাথে নূতন বই প্রকাশ হলে জনগণের বৃহদংশ উপকৃত হবে এবং এই ব্যাপারে সাধারণ মানুষের কমবেশী অবদান থাকবেই। ক্ষুদ্রমাত্রা ব্যতিরেকে পুস্তক প্রকাশনা নির্ভর করবে ভারতবর্ষের জনগণের বৃহদংশের পুস্তক ক্রয় করার ওপর। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি দেশে প্রচুর সংখ্যক বই কেনার মানুষ

রয়েছেন। সেখানকার সাধারণ মানুষের বিরাট অংশের এটা একটা নিয়ম এবং অভ্যাস যে আয়ের কিছু অংশ বই কেনার জন্য ব্যয় করা। ইংলণ্ডে আমার নিজের বোনেরা যারা কেউই বড় মানুষ বা রাণী নয়—তারা প্রতি বছরই অন্ততঃ কিছু বই কেনে। কিন্তু ভারতবর্ষে এই অভ্যাস প্রায় নেই বললেই চলে। আপনাদের কাছে যতক্ষণ পর্যন্ত বই কেনার জন্য কিছু খরচ করা আনন্দদায়ক বলে মনে হবে না, ততক্ষণ ভারতবর্ষে নূতন বই প্রকাশের হার বৃদ্ধি পাওয়া কষ্টকর হবে। বিশেষতঃ গুণগত মানের বই কমই প্রকাশ হবে। যেগুলি হবে সেগুলি নিকৃষ্ট মানেই পরিণত হবে এবং প্রকাশনার বাজার বর্তমানের মতই চলবে।

আমি আন্তরিকভাবেই দুঃখিত এই ধরনের কঠিন (দয়া করে কর্কশ বলবেন না) কথা বলার জন্য। কিন্তু আমি চাই আপনারা সত্যিকারের পুরুষ হবেন, সত্যকে ভয় করবেন না আর মুখের গল্পের ওপর নির্ভর করে থাকবেন না।

পল্লী পাঠাগারের আদর্শ

হরিহর শেঠ

এই শ্রীপুর একটী পুরাতন গ্রাম। অধুনা কালপ্রভাবে ইহার অবস্থা হীন হইলেও ইহার গৌরবময় পূর্ব্ব ইতিহাস অনেকেই অবগত আছেন। ইতিপূর্ব্বে আমার কখনও এখানে আসিবার সুযোগ হয় নাই। এই হিতৈষী সভার উদ্দেশ্য ও কার্য্য সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমার কোন পরিচয় ছিল না, অদ্য ইহার সংস্পর্শে আসিয়া আপনাদের কর্ম্মসাধনার সম্যক পরিচয়লাভে বিশেষ প্রীত হইলাম।

এরূপ পল্লীতে দরিদ্রের দুঃখ মোচন করিতে, আর্ত্তের সেবা করিতে, সাধারণের মধ্যে অজ্ঞতা দূর করিতে এই রূপ প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা খুবই আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ধন-জন-বহুল সহরে বিদ্যালয়, পুস্তকালয়, দাতব্য চিকিৎসাগার, সেবাশ্রম সমস্তই পৃথক পৃথক ভাবে গঠিত হইতে পারে। সেখানে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন পরিচালক সম্প্রদায়, বিভিন্ন ভাণ্ডার থাকিতে পারে। এখানে অধিবাসীর সংখ্যা কম সুতরাং সে সম্ভাবনা নাই, অথচ আবশ্যকের সংখ্যা, অভাবের মাত্রা কম নহে। সুতরাং সেখানকার যাহা দরকার এখানেও তাহা চাই ; এখানেও ছেলেমেয়েদের শিক্ষা চাই, স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা চাই, খেলাধূলার সরঞ্জাম চাই, আর্ত্ত আতুরের জন্য সেবা ও চিকিৎসা চাই, অধিকন্তু চাই ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, দরিদ্রতা ও অজ্ঞতার সঙ্গে নিত্য সংগ্রাম। কিন্তু শক্তি অল্প। এ অবস্থায় এরূপ একটী সমিতির দায়িত্ব অনেকটা তাহাতে সন্দেহ নাই আপনারা সে দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া পল্লীবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

আপনাদের নিতান্ত স্বল্প সামর্থ্য লইয়া এই জনবিরল পল্লীর মধ্যে এই সমিতিকে অবলম্বন করিয়া কর্ম্মীবৃন্দ যে কর্ম্মসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। আপনাদের মধ্যে ঐকান্তিকতার অভাব না ঘটিলে ভগবানের কৃপায় সাফল্যলাভ সুনিশ্চিত। এই সমিতির অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে একটী পাঠাগার পরিচালনা অন্যতম প্রধান কার্য্য। পল্লীর পুস্তকাগার সম্বন্ধে আমি যেভাবে চিন্তা করিয়া থাকি সেই সম্পর্কেই এখানে কিছু বলিব।

আজকাল প্রায় সকল সহরে যেখানেই কিছু শিক্ষিত লোকের বাস, সেখানেই পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠা একটা আগ্রহ পরিলক্ষিত হইতেছে। দূর পল্লী অঞ্চলের মধ্যে যে সকল স্থান অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ, সেখানেও এ আগ্রহ দেখা যায়। বলা বাহুল্য, এই

সকল গ্রন্থাগারের মধ্যে অধিকাংশই অতি সামান্য আকারে, কতকগুলি একেবারে নগণ্য। আমি সে বিষয় কিছু বলিতেছি না। আমি বলিতেছি এই যে একটা প্রচেষ্টা, ইহাতে বাস্তবিকপক্ষে আমাদের শিক্ষা-বিষয়ে বিশেষ কিছু উন্নতি বা লাভ হইতেছে কিনা তাহা চিন্তা-সাপেক্ষ। যদি তাহা নাও হয়, লাভের উদ্দেশ্য লইয়া উদ্যোগিগণ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তাহাতেও আশা করিবার থাকে। কিন্তু বাস্তবে যাহা দেখা যায়, তাহাতে আমাদের জ্ঞান, চরিত্র ও স্বাস্থ্যগত উন্নতি যে অনেক ক্ষেত্রেই হইতেছে না বরং বিপরীত হইতেছে, ইহাই মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

অধুনা পাঠাগার, গ্রন্থাগার, তর্কসভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সমূহের নিত্য উদ্ভব ও বিলোপ সাধন যাহা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, তাহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ সকলের প্রতিষ্ঠার মূলে কতিপয় যুবকের খেয়াল, একটা গতানুগতিকতা বা অনুকরণ-প্রিয়তা মাত্র আছে। তন্মধ্যে ঐকান্তিকতার একান্ত অভাব। অনেক প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠান পত্রের পৃষ্ঠায় অনেক কিছু সদুদ্দেশ্যে কথা লিখিত থাকিলেও কার্য্যত তাহার প্রায় কিছুই হয় না। পাঠাগারের অন্য যে উদ্দেশ্যই থাকুক, মূল উদ্দেশ্য মানুষের জ্ঞান ও শিক্ষার উন্নতি-সাধনে সহায়তা করা। বিদ্যাসাধনা, কাব্য, সাহিত্য আলোচনা প্রভৃতির দ্বারা আত্মোৎকর্ষলাভের জন্য যে সব পথ আছে, তন্মধ্যে গ্রন্থই সর্ব্বপ্রধান, সুতরাং গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা অতুল্য। এজন্য সদ্‌গ্রন্থের সংগ্রহ করা পাঠাগারের প্রথম কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই, কিন্তু কেবলমাত্র কতকগুলি মূল্যবান চাকচিক্যসম্পন্ন গ্রন্থরাজি সংগ্রহ করিয়া আলমারিতে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াই সেকার্য্য শেষ হয় না! যে সকল পাঠক স্বেচ্ছায় ঐ সকল গ্রন্থরাজি পাঠদ্বারা নিজ নিজ জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিতে প্রয়াসী, তাঁহাদের উহা পাইবার জন্য যথাসম্ভব সহজসাধ্য ব্যবস্থা করা যেমন প্রয়োজন, তেমনই যাঁহারা পাঠাগারের সঙ্গে সম্পর্কিত নন বা গ্রন্থাদি পাঠ দ্বারা যে কিছু উন্নতি হইতে পারে এমন কথা কখনও ভাবেন না, তাঁহাদের পাঠাগারের দিকে আকৃষ্ট করিয়া ভাল ভাল পুস্তক পাঠের আকাঙ্খা উদ্দীপ্ত করাও পাঠাগার-গুলির একটী প্রধানতম কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। কারণ, যাঁহারা অন্তরের বলবতী ইচ্ছায় নিজে নিজের আবশ্যক সংগ্রহে যত্নবান, তাঁহাদের জন্য তাঁহারা আপনা হইতে সবই করিতে পারেন, কিন্তু অপর সাধারণের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে।

ভাষার বর্ণপরিচয় ও ভাষাজ্ঞান হইতে আরম্ভ করিয়া সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞান গণিতাদি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা-লাভের জন্য যেমন স্কুল কলেজের আবশ্যকতা অনিবার্য্য, তেমনই তথাকার উপার্জ্জিত বিদ্যার অনুশীলন দ্বারা উৎকর্ষ লাভের জন্য, ছাত্র-

ছাত্রীদের অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধির সহিত গবেষণা কার্য্যের দ্বারা জগতের কল্যাণ-সাধনের জন্য, জ্ঞানালোকে মানবহৃদয়কে উদ্ভাসিত করিবার জন্য, গ্রন্থাগারের আবশ্যকতা অনিবার্য্য। বিদ্যালয়ের সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে যে সকল শিক্ষার স্থান নাই, পুস্তকাগারের বৃহত্তর গণ্ডীর মধ্যে তাহার যথেষ্টই আছে। বিদ্যালয়ের মধ্যেও স্থল বিশেষে যে সংকীর্ণতার পরিচয় পাওয়া যায়, গ্রন্থাগারে তাহা নাই!

জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারের জন্য গ্রন্থাগারের কার্য্যকারিতাও কম নহে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জ্ঞানমার্গের সোপান-সমীপে আসিবার উপায় হয়, কিন্তু তাহার শীর্ষদেশে পৌছিতে হইলে গ্রন্থাগারের আবশ্যক। এক কথায়, বিদ্যালয়ের অর্জ্জিত শিক্ষার পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে হইলে আবশ্যক পুস্তকাগারের। সুতরাং বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় যাহা দিতে পারিতেছে না, গ্রন্থাগার তাহা পারে। অবশ্য মনুষ্যত্ব-গুণসম্পন্ন জ্ঞানবিবেকপূর্ণ প্রকৃত শিক্ষিত পদবাচ্য মানবের উদ্ভব যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেষ্টনের বহির্দেশে, ইহাই আমার বক্তব্য কথা নহে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এমন অনেক জ্ঞান-বিজ্ঞান-ভূষিত মনীষী বাহির হইয়াছেন, যাঁহারা বিনয় সৌজন্যের প্রতিমূর্ত্তি, এখানকার বিবিধ বিদ্যালঙ্কৃত শিক্ষিতের জ্বলন্ত উদাহরণ। তাঁহাদের মানবতার কাছে সকলেরই মস্তক অবনত করিতে হয়। তবে সাধারণতঃ দেখা যায়, এখনকার ধর্ম্ম-নীতি-বিবর্জ্জিত বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবর্ত্তিত শিক্ষা এসব বিশিষ্ট মহিমান্বিত মানব সৃষ্টির পক্ষে অনুকূল নহে।

বিদ্যালয়ের ভিতরে থাকিয়া পাঠ্যাবস্থায় শিক্ষা ও পরবর্ত্তী জীবনে সদ্‌গ্রন্থ পাঠ দ্বারা শিক্ষার মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা সুপরিস্ফুট। প্রথমোক্ত স্থানে শিক্ষাকালে প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই দেখা যায় সুশিক্ষার যাহা কিছু উদ্দেশ্য হওয়া উচিত তাহা ভাল করিয়া মনের মধ্যে ফুটিতে দেয় না বা ভুলাইয়া দেয় বিদ্যালয়ের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহ। তখন বিদ্যাশিক্ষার প্রধানতম উদ্দেশ্যগুলির দিকে ছাত্র-ছাত্রীদের দৃষ্টিপাতের সময় থাকে না। সে সময় একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে পরীক্ষায় সাফল্যলাভ। ইহাতে সফলতা প্রাপ্ত হইলেই যে তাহাদের সব পাওয়া হইল না; অধুনা একথা না বিদ্যালয়ের শিক্ষক মণ্ডলীর ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার দিকে দৃষ্টি থাকে, না বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাবিধির মধ্যে তাহার কোন ধারা আছে! গ্রন্থপাঠ, তাহার ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম করা বা মুখস্থ করাই পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার পক্ষে যথেষ্ট হইলেও, বিদ্যার্জ্জন দ্বারা প্রকৃত শিক্ষিত পদবাচ্য হইবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট নহে। পঠিত পুস্তকে যে সকল ভাব বা শিক্ষিতব্য বিষয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়, সেগুলি নিজের দেহের রক্তমাংসের সঙ্গে এক হওয়া আবশ্যক; তৎপরে তাহাই কর্ষণ দ্বারা মানসিক

উৎকর্ষ সাধনের পথ পরিষ্কার হইয়া থাকে। এ সকল অনুশীলনের জন্য সাধারণ গ্রন্থাগারের সহায়তা অপরিহার্য্য।

আরও এক কথা ; প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন, যাহা দ্বারা আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান জন্মে, জাতীয়তা রক্ষা হয়, নানাকারণে এক্ষণে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্যে তাহার স্থান কম। যে শিক্ষার প্রভাবে পাশ্চাত্যদেশসমূহ গৌরবান্বিত, জগতের সকল স্বাধীন সভ্য জাতির যে শিক্ষা কাম্য, সে শিক্ষার পথ আমাদের ভাগ্যদোষে অর্গলবদ্ধ। সত্য কথা বলিতে হইলে ইহাই বলিতে হয়, এসকল ছাড়িয়া আমরা যে বিদ্যাই লাভ করি এবং যত বড় বিদ্বান বলিয়াই পরিচিত হই, আমাদের শিক্ষা অপূর্ণই থাকিয়া যায়। তদ্ভিন্ন ইহাও চিন্তা করিবার বিষয়, ব্যবহারিক জীবনে যে শিক্ষা আমাদের কাজে ঠিকমত না লাগে, মনুষ্যত্ব ও জাতীয়ত্ব লাভের পক্ষে তাহা হইতে কি সাহায্য হইতে পারে? মানুষ নাম লইয়া ধরাপৃষ্ঠে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে আমাদের মানুষের মত শিক্ষাই চাই। তাহা যত আয়াসলব্ধই হউক, তাহা অর্জ্জন করিতে হইবে। পরাধীন জাতির পক্ষে শিক্ষা-বিষয়ে এসব সংস্কার-সাধন অতীব দুরূহ। পরাধীনতার চাপে পিষ্ট হইয়া আমাদের নিজস্ব অনেক কিছু গিয়াছে, অনেক কিছু যাইতে দিতে হইতেছে। রাষ্ট্রগত পরাজয়ের সহিত দিনের পর দিন আমাদের ব্যবসা, শিল্প, সভ্যতা সবই বিসর্জ্জন দিতে হইতেছে। তদুপরি শিক্ষার বিপর্য্যয়ে যদি আমাদের ভাবগত পরাজয় ব্যাপক হইয়া উঠে, তাহা হইলে একদিন পৃথিবী হইতে এজাতির নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

শিক্ষার আবশ্যকীয় সংস্কার-সাধন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে সম্ভবপর নহে, কিন্তু সাধারণ পাঠাগারকে অবলম্বন করিয়া ইহার কতকটাও করা যাইতে পারে। লোক-শিক্ষার জন্য দেশের পাঠাগারগুলি উদ্যোগী হইলে এখনও আমাদের আদর্শ ভাব ও জাতীয়তা অনেক রক্ষা হইবে, বা যাহা লুপ্ত হইয়াছে বা হইতে বসিয়াছে তাহা ফিরাইয়া আনিতে পারা যায়।

আমার মনে হয়, পুস্তকাগারসমূহকেই প্রকৃত জনশিক্ষার একটী বিশিষ্ট কেন্দ্রে পরিণত করা আবশ্যক। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, এজন্য শুধু বহু বিষয়ের গ্রন্থরাজির সংগ্রহ করিলেই হইবে না। সাধারণের মধ্যে পাঠের অনুরাগ-বৃদ্ধির জন্য, স্বাস্থ্য-নীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয় জ্ঞান প্রচারের জন্য স্থান কাল উপযোগী যথারীতি ব্যবস্থা দ্বারা পাঠাগারকে আদরের বস্তু করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। আবশ্যকীয় উপাদানের সহিত এজন্য সর্ব্বাপেক্ষা দরকার একজন বিচক্ষণ যোগ্য

লাইব্রেরিয়ান। ইঁহার কার্য্য শুধু গ্রাহকবৃন্দের ফরমাইস মত পুস্তক বিতরণ করা নহে, যাঁহার পক্ষে যে পুস্তক পাঠে উপকারের সম্ভাবনা, তাঁহার যাহাতে সেই পুস্তক পাঠে প্রবৃত্তি হয়, পাঠক-সাধারণের মধ্যে অনিষ্টকর নাটকোপন্যাস পাঠের রুচি যাহাতে পরিবর্ত্তিত হয়, এ সকল বিষয় চেষ্টিত হওয়া তাঁহারই কার্য্য হওয়া উচিত। এই যে যোগ্য গ্রন্থরক্ষকের কথা বলিলাম, ইহা মুখে বলা যতটা সহজ, এরূপ উপযুক্ত লোক অবৈতনিক ভাবে বা স্বল্প বেতনে পাওয়া মোটেই সহজ নহে। কলিকাতার ন্যায় সহরেও নির্দ্দিষ্ট অল্পসংখ্যক স্থান ব্যতিরেকে সুযোগ্য গ্রন্থরক্ষক প্রায় নাই। পল্লীগ্রাম অঞ্চলে বহুক্ষেত্রেই অধিক ব্যয় করিয়া ভাল লাইব্রেরিয়ান্ রাখা সম্ভবপর হয় না। আমার মনে হয়, সে সব ক্ষেত্রে একজন দায়িত্বজ্ঞানহীন যুবকের হস্তে সে ভার না দিয়া বরং গ্রন্থাগারের কর্ত্তৃপক্ষদের মধ্য হইতে একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী-ব্যক্তির উপর সেই কার্য্যভার অর্পণ করা উচিত। বলা বাহুল্য, যিনি এ ভার লইবেন, তাঁহার নিজের জ্ঞান ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবের সহিত পড়াশুনাও ভালরূপ থাকা দরকার!

শুধু গ্রন্থ বা গ্রাহক অথবা সভ্য-সংখ্যার আধিক্যই পুস্তকাগারের শ্রেষ্ঠত্বের পরিমাপক নহে; ইহা পরিচালকদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত। বিশিষ্ট সহর-অঞ্চলে যেখানে লোক-শিক্ষা-বিষয়ক অন্যান্য বিবিধ প্রতিষ্ঠান আছে সেখানকার কথা বরং কতকটা স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট সহরে এবং পল্লী অঞ্চলে যেখানে সে সব নাই, সেখানে লোকশিক্ষার সুযোগ যে পুস্তকাগারে না হয়, সে পুস্তকাগারের অস্তিত্ব থাকা না থাকা সমান বরং চিত্তবিনোদনের জন্য অপাঠ্য পুস্তক পাঠের সুবিধা করিয়া দেওয়ায় ক্ষতিই অধিক হয়; সুতরাং তাহা না থাকাই ভাল।

এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক; গল্প উপন্যাস বা নাটকাদি লঘু-সাহিত্য গ্রন্থমাত্রেই পুস্তকাগারের অঙ্গীভূত করা বা উহা পাঠ করাতেই যে আমার আপত্তি, এরূপ কেহ না মনে করেন। যে সকল উপন্যাসাদি পাঠে লালসার উদ্রেক হয় তাহা পরিত্যজ্য। আর যে পুস্তকপাঠে নৈতিক অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে তাহা হইতেও বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক—বিশেষ কোমলমতি কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীদের। উপন্যাসমাত্রই অপাঠ্য—একথা কেহই বলিবেন না বরং গল্প উপন্যাস পাঠেই যখন সাধারণ পাঠকদের স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যায়, তখন শিক্ষাপ্রদ ভাল ভাল উপন্যাস যাহাতে পাঠক-পাঠিকাদের হস্তগত হইতে পারে সে সুযোগ করিয়া দেওয়া ভাল। যুবক-যুবতী ও মহিলাদের ডিটেক্‌টিভ্ উপন্যাস একেবারে পড়িতে না দেওয়াই ভাল।

শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য তাহাদের উপযোগী গল্পপুস্তকের মধ্য দিয়া যাহাতে জ্ঞানলাভ হইতে পারে, পুস্তকাগারে সে সকল পুস্তকের সংগ্রহ থাকা এবং তাহা তাহাদের পাইবার ও পাঠের সুযোগ করিয়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। বাল্যকাল হইতে যাহাতে পুস্তক পাঠের একটা আগ্রহ জন্মে তাহার দিকে পরিচালকদের দৃষ্টি থাকা দরকার। এ সময় যে বিষয়টী অন্তরে গ্রথিত হইয়া যায়, তাহা প্রায় জীবনে কখন লুপ্ত হয় না। সাধারণ জ্ঞানলাভ বিষয়ে বর্ত্তমান যুগের উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী সকল অবলম্বন করিয়া তাহাদের শিক্ষা দিবার চেষ্টা যদি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে সে বিষয় যত্নবান হওয়া আবশ্যক। সাময়িক বক্তৃতা, ম্যাজিক্ লণ্ঠন্, বায়স্কোপ দ্বারা অনেক বিষয় সহজে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

আমি এই প্রসঙ্গে যে সকল বিষয় বলিলাম বা যে যে বিষয়ে পরিচালকদিগের লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম, তাহা যে আপনাদের অজ্ঞাত আছে বা সে বিষয় আপনারা লক্ষ্য রাখেন না এরূপ আমি মনে করিনা, অন্ততঃ তাহা মনে করিয়া আমি বলি নাই। আমার বিশ্বাস, এখানকার পরিচালকদিগের মধ্যে কৃতবিদ্য ও গ্রন্থাগার বিষয়ে অভিজ্ঞতার অভাব নাই। পুস্তকাগারে দীর্ঘদিন থাকিয়া এবিষয় যাহা চিন্তা করিয়া থাকি, যে সব ত্রুটি সর্ব্বদা নয়নগোচর হয় এবং তৎ-প্রতিকারার্থ বুধজন যাহা বলিয়া থাকেন, আমি তাহারই কোন কোন কথার পুনরাবৃত্তি করিলাম মাত্র, নচেৎ আমি এ বিষয় বিশেষজ্ঞ এরূপ কখন মনে করিনা।

আমার কথা, গ্রামে গ্রামে পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠা, ইহা ভাল। কিন্তু অন্যের দেখাদেখি মাত্র না হয়। উচ্চ আদর্শ, মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া যাহাতে পুস্তকাগার একটী শিক্ষাকেন্দ্র হইতে পারে, সে চেষ্টা চাই। একজন চিন্তাশীল লেখক বলিয়া গিয়াছেন,—পুস্তকাগার লোকান্তরিত গ্রন্থকারদের সমাধিস্থান নহে। একথাটীর গূঢ় অর্থ মনে রাখা উচিত। গ্রন্থাগার উদ্দেশ্যবিহীনভাবে সৃষ্ট হইলে উহা যে শুধু নিরর্থক হইল তাহা নহে, উহাই ক্রমে গ্রাম্য দলাদলি অথবা তাসপাশার আড্ডায় পরিণত হইয়া তাহার উচ্ছেদ সাধিত করিবার পথ প্রস্তুত করিবে।

গ্রন্থাগার ও পাঠক

অনাথবন্ধু দত্ত

প্রায়ই শুনা যায় যে বাঙ্গালী পাঠকেরা উপন্যাস ব্যতীত অপর কোন প্রকারের গ্রন্থ বড় বেশী পছন্দ করেনা। এই কথার সত্যতা অস্বীকার না করিয়াও একথা বলা চলে যে সকল দেশে সকল কালেই রস-সাহিত্যের পাঠকের সংখ্যা বেশী। কেন এরূপ হয় তাহা বুঝিতে হইলে মানুষের প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। মানুষ খুব বিদ্বান, পণ্ডিত, বা বড় বৈজ্ঞানিক হইলেও সে সাধারণ মানুষ হইতে যে খুব বড় একটা পৃথক হইয়া পড়ে তাহা নহে। এ অনেকটা ব্যক্তিবিশেষের বিচারক হওয়ার মত। আদালতে যিনি নির্ম্মম সত্যনিষ্ঠ বিচারক সেই লোকই নিজ গৃহে অতি স্নেহপ্রবণ পিতা, দরদী গৃহস্থ, আড্ডার মজলিসী সদস্য। এই বহুরূপী মানুষের বহুরূপের মধ্যে তাহার রস-পিপাসু রূপ স্মরণ করিয়া তাহার মনের রীতিমত আহার যোগাইতে হইবে। গ্রন্থাগারের কার্য্যই বিভিন্ন পাঠকের রুচি অনুযায়ী মনের খাদ্য যোগান। ডাক্তারেরা যেমন ব্যক্তি বিশেষ খাদ্যের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন গ্রন্থাগারের পাঠকের সম্বন্ধেও এইরূপ বিভিন্ন ব্যবস্থা কেবল সমীচিন নহে, অপরিহার্য্য। এরূপ পাঠকও আছে যে ধৈর্য্য ধরিয়া একখানা উপন্যাস শেষ করিতে পারেনা। আবার উপন্যাস ব্যতীত অপর পুস্তকে মন বসেনা এরূপ পাঠক-পাঠিকার ত অভাব নাই। শুনা যায় মিল্টনের 'প্যারাডইস্ লষ্ট' পড়িয়া কোন বৈজ্ঞানিক বলিয়াছিলেন যে এত বড় বই কিছু প্রমাণ করিল না। যখন বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠকের মধ্যে এত ব্যবধান তখন গ্রন্থাগারিকের কর্ত্তব্য যে কত দায়িত্বপূর্ণ তাহা সহজেই বুঝা যায়।

এখন কথা হইতেছে কেবল চাহিদা অনুযায়ী বই সরবরাহ করাই কি গ্রন্থাগারিকের কার্য্য না যাহাতে উচ্চশ্রেণীর পাঠক তৈয়ার হয় সে দিকেও লক্ষ্য রাখা অন্যতম কর্ত্তব্য। অবশ্য গ্রন্থাগারিক মাষ্টার নহে এবং গ্রন্থাগারও স্কুল নহে। তবে গ্রন্থাগারিক জ্ঞান ভাণ্ডারেই পরিবেশক এবং গ্রন্থাগার জ্ঞানেরই ভাণ্ডার। জ্ঞানের চাহিদা অনুযায়ী যোগান দেওয়া যাহার কার্য্য ; জ্ঞানের পরিসর বাড়ানো যে তাহার কর্ত্তব্যের অন্তর্গত নয় তাহা নহে। এই কারণেই প্রত্যেক গ্রন্থাগারিকের কর্ত্তব্যের দুইটী দিক আছে। এই উভয় রক্ষা করিতে পারিলেই তাহার কর্ত্তব্য করা হইল। যোগান দেওয়ার কার্য্যে বিশেষ যোগ্যতার দরকার হয়না ইহা অনেকটা আপিসের

কেরাণীগিরির মত। হয়ত অনেক প্রকারের কেরাণীগিরি হইতে সহজ। কিন্তু অপর কার্য্য অর্থাৎ পাঠক তৈরি করা বা পাঠকের রুচি মার্জ্জিত ও উন্নত করা ইত্যাদি বেশ কঠিন কাজ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি গ্রন্থাগারিক মাষ্টার নহে; তবুও শিক্ষক না হইয়াই তাহাকে শিখাইতে হইবে। গ্রন্থাগারের পাঠকেরা কেহই গ্রন্থাগারিকের ছাত্র নহে অথচ তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে ইহা যে সহজ-বোধ্য কথা নয় তাহা বলাই বাহুল্য। অথচ প্রতিদিনের কার্য্যের মধ্য দিয়া গ্রন্থাগারিকের এই কার্য্য করিতে হইতেছে। সম্পূর্ণ স্বাধীন মিলনের এবং আদান প্রদানের মধ্যদিয়া যে শিক্ষা যে জ্ঞান লাভ হয় সেই শিক্ষাও গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করিয়া বিতরিত হইতেছে। জ্ঞানভাণ্ড হইতে যে যাহার ইচ্ছা, রুচি ও শক্তি অনুযায়ী আহরণ করিতেছে। নিজ নিজ জ্ঞান পিপাসা মিটাইবার জন্য নানা বয়সের লোকের এই অদ্ভুত সমাবেশই গ্রন্থাগারের বিশেষত্ব। এই অদ্ভুত লোক-সমাবেশ গ্রন্থাগারে বিভিন্ন প্রকারের পুস্তক সমাবেশের জন্যই সম্ভব হইয়াছে। এই মিলনের ফলেই বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞান-বিজ্ঞান-রসতত্ত্ব পাঠকগণকে সংক্রামিত করে। হুঁসিয়ার গ্রন্থাগারিক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেন যে পাঠকের রুচি বদলাইতেছে এবং নূতন নূতন পুস্তকের চাহিদা বাড়িতেছে। রুচিপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই রীতিমত গ্রন্থ যোগান দেওয়া হইতেছে গ্রন্থাগারিকের অবশ্য কর্ত্তব্য। গ্রন্থভাণ্ডার সম্বন্ধে গ্রন্থাগারিক যতটা ওয়াকিবহাল ততটা কোন পাঠকই নহে এজন্য গ্রন্থাগারিকের সহানুভূতি ও সহযোগিতা পাঠকের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। এই-জন্যই সহজ কথায় বলা চলে যে পাঠকের পক্ষে গ্রন্থাগারিকই গ্রন্থারণ্যের একমাত্র পথপ্রদর্শক।

অধ্যয়ন ও জ্ঞানলাভ

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

আমি এখনও নিজেকে ছাত্র ব'লে গণ্য করি। ঐ জীবন ত্যাগ ক'রে একদিনও অন্য জীবনে পদার্পণ করেছি ব'লে মনে হয় না। "ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ"—বাস্তবিক এই ঋষিবাক্য বড় সত্য—বড় সার কথা। আর আমাদের এই ছাত্রজীবন ও গার্হস্থ্যজীবনের পার্থক্যের প্রাচীর বড়ই অমঙ্গলকর।

ইউরোপীয় অবস্থাপন্ন লোকের একটি ষ্টডী অর্থাৎ পাঠাগার থাকে। সেখানে প্রবেশ করবার অর্থ—আর যেন কেউ না দেখে বা ঢোকে। যেমন আমাদের দেশের ঠাকুর-ঘর। ভক্ত সেখানে আপন মনে সাধনা করেন, হৃদয়দেবতাকে ভক্তির অর্ঘ্য দান করেন—কিন্তু তা লোকচক্ষুর অন্তরালে—আর কেহ দেখে না। আমাদের পাঠাগারকে ঠাকুরঘরের পবিত্রতায় মণ্ডিত করতে হ'বে, তাকে নিভৃতে স্থাপন করতে হবে—যেন চপলতার গোলমাল সেখানে না পৌঁছায়।

আমাদের দেশে ছাত্র বাড়ীতে, আবার অনেকে মেসে থাকেন। এখানে ছাত্রের প্রধান বিপদ এই যে তার কোন স্বতন্ত্র পাঠাগার থাকে না। বড়লোকে বড় বাড়ীতে থাকেন—নানাকার্য্যের বন্দোবস্তের জন্য তাঁদের অনেক ব্যয় করতে হয়। কিন্তু বাড়ীর ছেলে কিরূপে কোলাহলের বাইরে নির্জ্জনে ব'সে পড়্‌বে সাধারণতঃ কোন বাড়ীতেই তার বন্দোবস্ত থাকে না—এরূপ বন্দোবস্ত যে থাকা দরকার তাও কেউ ভাল ক'রে উপলব্ধি করেন না। আর মেসের ত কথাই নেই। আমাদের দেশে কথা আছে—'একে উস্‌খুস্‌ হয়ে দুয়ে পাঠ, তিনে গণ্ডগোল চারে হাট।' মেসে অনেকে একত্র জোটে—কাজেই প্রত্যেকে হাটের মধ্যে গিয়ে পড়ে। হাটে হয় হট্টগোল, সরস্বতী সেখানে টিক্‌তে পারে না; মন্দিরে যেরূপ ভক্তের জপতপ আরাধনা—পাঠাগারে সেইরূপ ছাত্রের অধ্যয়ন ও সাধনা। ছাত্রের প্রধান কর্ত্তব্য অধ্যয়ন; আর এই অধ্যয়ন তপস্যা ব্যতীত আর কিছু নয়। একাগ্রচিত্ততা এই তপস্যায় সিদ্ধি দান করে।

প্রথম কথা এই যে—কি ক'রে পড়তে হয়? ক ঘণ্টা পড় তার হিসাব রাখবার দরকার নেই, কিরূপ একাগ্রতার সহিত অধ্যয়ন কর সেইটাই সবার চেয়ে দরকারি জিনিস। পড়াশুনার উদ্দেশ্য সফল করতে হ'লে—ঘণ্টার উপর নয়—একাগ্রতার উপর নির্ভর করতে হয়। আমি আজ সকালে 'খুব' পড়েছি—কিন্তু মোটে

একঘণ্টা কি তার কিছু বেশী। এই ভাবে আমি রোজই পড়ি, তা রবিবার নেই, ছুটিও নেই, অবকাশও নেই। এইভাবে সমানে (নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সহিত) পড়ে যেতে হবে। কিন্তু এদেশে ছাত্রদের প্রধান বিপদ গল্প খেলা আর আড্ডা। একাগ্রতার ত সম্পূর্ণ ই অভাব ; তার উপর খেয়াল ও হুজুগে পড়্বার সব সময়টা কেটে যায়। পরে যখন পরীক্ষা কাছে এগিয়ে আসে তখন আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে, রাত্রি জাগরণে স্বাস্থ্য নষ্ট ক'রে তার জন্য প্রস্তুত হবার বিপুল প্রয়াস। এ-কে লেখা পড়া বলে না, এ লেখা পড়া নয়, এ ইউনিভারসিটিকে ফাঁকি। কেবল মুখস্থ আর উদরস্থ ; পেটুকের মিষ্টান্ন ভক্ষণের মত—একপণ সন্দেশ টপাটপ করে গেলা, তারপর গলায় আঙুল দিয়ে বমি। সব সময়টা ফাঁকি দিয়ে পরীক্ষা কাছে এসেই টপাটপ্ মুখস্থ ও উদরস্থ কর্বার প্রয়াস ; তারপর পরীক্ষামন্দিরে গিয়ে একেবারে বমি। পরীক্ষার পরই সরস্বতীর সঙ্গে সকল সম্বন্ধ লোপ। আর পাশ হ'লে 'হকার' চাচার দোকানে পুস্তক বিসর্জ্জন। মনে পড়ে ছেলে-বেলায় জ্বর হ'ত, আর কেবল মিছ্রী বেদানা ও কুইনীন্ খেতে হ'ত। বাল্যজ্বর মনে করিয়ে দেয় ব'লে ঐ জিনিসগুলোয় আমার একটা ভয়ানক বিতৃষ্ণা আছে—ওগুলো আমার কাছে বিভীষিকা। পাশ কর্বার পর এদেশের ছাত্রদের পুস্তকের উপর ঐ রকমই তীব্র বিতৃষ্ণা হয়—বইগুলো তাদের কাছে আতঙ্ক উপস্থিত করে। পুস্তককে আজীবন সঙ্গী করতে হবে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে পরীক্ষার পর বইখানার পাবার জো নেই ! শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় একবার কোন ছাত্রকে বলেছিলেন 'ব্ল্যাকীর "সেল্ফ্-কাল্চার" বইখানা দাও ত।' সে জবার দিলে 'সে বই তালা বন্ধ, দেখ্‌লে ভয় হয়।' এ বড় দুঃখের কথা। সৎপুস্তককে আজীবন সহচর কর্‌তে হবে, আজীবন ধ'রে সৎপুস্তক পাঠে ভাব সংগ্রহ কর্‌তে হবে, হৃদয়ে উদ্দীপনা জাগিয়ে রাখ্‌তে হবে, এবং প্রকৃত জ্ঞানের অনুশীলন কর্‌তে হবে। ইংরেজ কবি সাদি পুস্তককে লক্ষ্য করে যথার্থই বলেছেন—

"The mighty minds of old"
"My never-falling friends are they"

পুস্তক পাঠের উদ্দেশ্য সফল করতে হ'লে খুব বেশী বই পড়্বার দরকার হয় না। অনেকে যা পায় তাই পড়ে, পরিণত বয়সেও তাদের এই অভ্যাস থেকে যায়। তারা কখন পুস্তক নির্ব্বাচন করে পড়ে না। ছুটি পেলে তারা অনেক রকম অনেক পয়সা ব্যয় কর্‌বে। বেড়াবার সখ মেটাবার জন্যে দামী পোষাক ট্রাঙ্ক গ্লাড্‌ষ্টোন্ ব্যাগ কিন্‌বে, কিন্তু ছুটীতে পড়্বার জন্যে কি বই সঙ্গে নিয়ে

যাবে কখ্‌নই তার কিছু স্থির করবে না। হাতে যা পাবে তাই পড়বে, কিছু বিচার করবে না। বায়রনের পত্ত থেকে এমার্সেন বলেন, "He knew not what to say and so he swore." প্রথম মনে হ'ল কি পড়্‌ব? খবরের কাগজখানা তুলে নিলাম, আগে খবর পড়্‌লাম, তারপর অন্য কথা পড়া হ'ল, শেষ বিজ্ঞাপন-স্তম্ভ পর্য্যায় নিঃশেষ করা গেল। কি পাওয়া গেল, কি বোঝা গেল, তার কোন চিন্তাই কর্‌লাম না। কিন্তু এরকম ঠিক না, উদ্দেশ্যবিহীন পাঠ কোনমতেই ঠিক নয়। সবার আগে পড়্‌বার উদ্দেশ্য খুব ভাল ক'রে বুঝ্‌তে হবে, তারপর রুচি অনুসারে পুস্তক নির্ব্বাচন কর্‌তে হবে, কারণ, সকলের সব বই ভাল লাগে না, কিন্তু একটা উদ্দেশ্য মনে রেখে তারই উপযোগী পুস্তক নির্ব্বাচন করা এদেশের ছাত্রদের মধ্যে নেই বল্‌লেই চলে। যে-কোনো লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষগণকে যদি জিজ্ঞাসা করে দেখেন "পাঠকগণ নভেল নাটকই বা কত পড়েন আর ইতিহাস ও জীবনীই বা কখানা পড়েন, দেখ্‌বেন তৃপ্তিকর উত্তর পাওয়া যাবে না।"

আমাদের ছাত্রদের মধ্যে নভেলের প্রতি একটা ভয়ঙ্কর আগ্রহ দেখা যায়। ভা-লপাশ-করা শিক্ষিত-ছেলে ছুটীতে যদি নভেল পেলে ত স্নানাহার বন্ধ—যতক্ষণ না বইখানা শেষ হয়। কিন্তু একখানা বড় নভেল পড়্‌তে আমার ছ মাস লাগে, কারণ আমাকে ঠিক সময়-মত কাজ কর্‌তে হয়, ল্যাবরেটরীতে কাজ করার পর আধ ঘণ্টা সময় পেলে পড়ি, নইলে নয়। সব কাজেরই একটা নির্দ্দিষ্ট সময় থাকা চাই—সকলেরই এই প্রণালী অবলম্বন করা উচিত, বিশেষতঃ আমাদের দেশে, যেখানে স্বাস্থ্যের একান্ত অভাব। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে লোকে আজীবন ব্যাধিগ্রস্ত; দেশে খাবার নেই, শরীরে পুষ্টি নেই। সকলেই দীন দরিদ্র, অন্নসংস্থানের ভাবনায় সবাই অস্থির। বাঙ্গালীর প্রধান পুষ্টিকর খাদ্য মাছ ও দুধ সর্ব্বত্রই দুষ্প্রাপ্য হ'য়ে উঠেছে। একে অস্বাস্থ্যের এইসব কারণ উপস্থিত রয়েছে, তার উপর ছাত্রের অতিরিক্ত পাঠ, কাজেই অল্প বয়সে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং সে কাজের বার হ'য়ে পড়ে। ২৪ ঘণ্টায় একদিন। ছেলে-মানুষের আট ঘণ্টা ঘুমুলেই যথেষ্ট হয়। ১৬ ঘণ্টা হাতে থাকে। তার মধ্যে রোজ ৪ ঘণ্টা পড়্‌লেই প্রচুর। কিন্তু পড়্‌তে হবে পরিপূর্ণ একাগ্রতার সহিত, নইলে কোন কাজ হবে না। বাঙ্গালী ছাত্রের প্রধান শত্রু—পড়্‌বার সময় অনেকের একত্র অবস্থান। এরূপ কর্‌লে গল্প আস্‌বেই—অন্ততঃ অতর্কিতভাবে আস্‌বে। আর বাঙ্গালীর প্রধান বিপদ হচ্ছে আড্ডা। বেশী বয়সে আমরা সবাই বসে কাটাই, বাহিরে উঠে হেঁটে বেড়াতে উৎসাহ আসে না, প্রবৃত্তিও

হয় না ; তাস-পাশাতেই কত সময় কেটে যায়। আবার এই তাস-পাশার আড্ডার পাশে অনেক সময় ছেলেরা পড়াশুনা করে। বিপদ্ কি ভয়ানক! ইউরোপীয়ান্ যখন পাঠাগারে একমনে অধ্যয়ন করে তখন তার স্ত্রীকেও ("May I come in") "আমি কি ভিতরে যেতে পারি" এই ব'লে দরজায় (knock) ঠোকা দিতে হয়। যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘরে যেতে হচ্ছে যেন শুধু বিরক্ত করতে। কারণ পাঠাগার ঠাকুরঘরের মত পবিত্র স্থান, সেখানে কথা কওয়া পাপ।

তার পরের কথা—

"Work while you work, play while you play,
This is the way to be cheerful and gay"—

কাজের সময় কাজ করতে হয়, খেলার সময় খেলা ; তা হলেই মনে আনন্দ ও উৎসাহ থাকে। আমি সর্ব্বদাই কাজ করি, আবার অবসর-মত করি না। একজন বড় ইংরেজ দোকানদার আফিসে একমনে পাঁচ ছয় ঘণ্টা কঠিন পরিশ্রম ক'রে কাজ করে, কিন্তু যেমনি কাজ শেষ হয় অমনি গঙ্গার ধারে—খোলা মাঠে মুক্ত বাতাসে বেড়াতে যায়। তারা সে সময়ে বসে থাকে না—কুঁড়েমি করে না ; আড্ডা বা মজ্‌লিসে জমে না। কিন্তু আমরা স্বাস্থ্য রাখ্‌তে জানি না, সময়ে কাজ না, তাই শরীর ও সময় তুইএরই অপব্যবহার হয় ; স্বাস্থ্যও থাকে না, কাজও ওঠে না।

এদেশে শুধু বই পড়িয়ে বিদ্যা শেখানো হয়। কিন্তু ইউরোপে সাধারণ পুস্তক পাঠের সঙ্গে প্রকৃতির উন্মুক্ত বিশাল গ্রন্থ পাঠ ক'রে জ্ঞানার্জ্জন করবার প্রবৃত্তি জাগিয়ে দেওয়া হয়। শুধু বই প'ড়ে কত শেখা যায়? নিজের চেষ্টায় বিশ্বরাজ্যের নানাপ্রকার অদ্ভুত ঘটনা নিপুণচক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করতে হয়, তবেই প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জন হয়। পুঁথিগত বিদ্যার দৌড় কখনই বেশী হয় না। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ডিকেন্স্ সময়ে সময়ে ছদ্মবেশে মদের দোকানে গিয়ে বসে থাকতেন। উদ্দেশ্য মাতালের কথাবার্ত্তা শুনে তার প্রকৃতি বুঝে দেখা। এইভাবে নানা রকমে বিখ্যাত ইউরোপীয়েরা মানবপ্রকৃতি নিখুঁত করে জানবার চেষ্টা করেন। এ-ই প্রকৃত অধ্যয়ন। মানব-প্রকৃতির পর জড়প্রকৃতি। পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা তাও বুঝ্‌তে হবে। লণ্ডনের কাছে এক বটানিকেল গার্ডেন আছে, তার নাম কিউ গার্ডেনস্ (Kew Gardens), পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা আহরণ করবার জন্যে শত সহস্র বিদ্যার্থী সেখানে যান। নানা রকমের গাছ, তাদের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির নিয়ম—নিজের চোখে সুকৌশলে পর্য্যবেক্ষণ ক'রে উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে তাঁরা অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। আর আমাদের এই সুজলা

সুফলা দেশে, এই ভারতবর্ষে গাছের ত অভাব নেই। কিন্তু উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে কি তত্ত্ব জান্‌তে পেরেছি আমরা? বিলাতে তিন মাস কি তার কিছু বেশীদিন ধ'রে গাছপালার সবুজ পাতা থাকে। অন্য সময়ে কাঁচের ঘরের মধ্যে কলাগাছ প্রভৃতি বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হয়। কিন্তু সে দেশের লোকেরা এই কয়মাসের সুবিধায় উদ্ভিদ্‌বিদ্যা অধ্যয়ন ক'রে সেই সম্বন্ধে নানা সত্য আবিষ্কার করে। আর আমরা এই চিরসবুজ দেশে চিরকালই চুপ ক'রে বসে থাকি। চক্ষুষ্মান কারা? ১৮৪৫ সালে হুকার নামে এক ইউরোপীয়ান্ এদেশে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা আহরণ কর্‌তে এসে--ছিলেন। তখন দার্জ্জিলিং-এর তখন রেল হয়নি। কিন্তু তিনি অশেষ ক্লেশ স্বীকার ক'রে গাছগাছড়া দেখ্‌বার জন্যে সিকিম গেলেন। তারপর সে দেশে বন্দী হলেন; সেই কারণে সিকিমের সঙ্গে যুদ্ধই বেধে গেল। যা হোক্ অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তিনি ১০০০০ (দশ হাজার) রকম আবশ্যকীয় গাছগাছড়া সংগ্রহ ক'রে বিলাতে ফিরে গেলেন; সে-সব এখনও কিউ গার্ডেন্সে (Kew Gardens) আছে। আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে ভারতের উদ্ভিদ্‌জ্ঞান ইংরেজের বই প'ড়ে শিখতে হয়।

রক্‌স্‌বর্গের Flora Indica নামে এক অমূল্য গ্রন্থ আছে। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে তিনি সমস্ত ভারত পদব্রজে ভ্রমণ করে নানা রকম গাছ সংগ্রহ করেছিলেন। এবং প্রত্যেকটির বাঙ্গলা হিন্দি তামিল নাম জোগাড় করেছিলেন। তাঁর বই সকলে পড়ে। এঁরা ইউরোপীয়ান্ ম্লেচ্ছ, কিন্তু আমাদের চিরস্মরণীয়।

জ্‌অলজিক্যাল গার্ডেনে ইউরোপীয়েরা নানারকম পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ প্রভৃতির জীবনযাপন-প্রণালী অধ্যয়ন করেন। ফরাসী দেশের একজন উকিল কুড়ি বৎসর ধ'রে শুঁয়োপোকা ও প্রজাপতি কেমন ক'রে এক থেকে অপরে পরিণত হয় তা পর্য্যবেক্ষণ করেছেন, আর তার একটি কৌতুহলপ্রদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। এছাড়া তিনি নিজের চোখে গুটি ও তুঁত-পোকার জীবনযাত্রা দেখে ঐ সকল কীট থেকে রেশম উৎপন্ন করা সম্বন্ধে অনেক আবশ্যকীয় নূতন কথা সভ্যজগৎকে জানিয়েছেন। আর একজন অন্ধ, মধুমক্ষিকার ইতিহাস লিখেছেন। তিনি যৌবনে অন্ধ হয়েছিলেন। তাই তাঁর স্ত্রী ও ভৃত্য মধুমক্ষিকার জীবনযাত্রা পর্য্যবেক্ষণ ক'রে সেইসব কথা তাঁর কাছে বল্‌তেন এবং তিনি বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে তা লিপিবদ্ধ কর্‌তেন। এই প্রকারে হিউবার (Hubar) তাঁর বিখ্যাত পুস্তক মৌমাছির ইতিবৃত্ত (History of the Bees) লিখেছেন।

ইংরেজ ও আমেরিকানের এক-একটি (Hobby) অর্থাৎ খেয়াল আছে। কেউ গার্ডেনিং করেন, বাগানে নানারকম ফলফুল উৎপন্ন করেন। এ একটা

সুন্দর খেয়াল। কেউ বা প্রাণীতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন, আর কেউ বা পতঙ্গবিজ্ঞান (Entomology) সম্বন্ধে আলোচনা করেন। আমাদের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল নিজে পতঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা কর্‌তেন। ইংরেজ কখন ব'সে থাকে না। এই রকম একটা খেয়ালে থাকে। এই সকল ব্যাপার অধ্যয়ন করে তাদের সকলেই যে কলেজের অধ্যাপক হয় তা নয়, কিন্তু এইসব কথা পুস্তকে প্রত্যক্ষ ক'রে তাঁরা জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করেন, তাঁদের তিনগুণ আয়ও হয়।

এদেশে গবর্ণমেণ্ট পুনা কৃষিকলেজে লেফ্রয় (Lefroy) নামক একজন মস্ত পতঙ্গবিজ্ঞানবিৎ (Entomologist) আনিয়াছেন। তিনি কোন্ কোন্ পতঙ্গ শস্য নষ্ট করে সে সম্বন্ধে আলোচনা করছেন। আমরা জানি শুধু পঙ্গপালই ফসল নষ্ট করে দেয়। কিন্তু আরও অনেক রকম পতঙ্গ আছে যারা ফসলের বড় কম ক্ষতি করে না, ইনি তাদেরই জীবনচরিত আলোচনা কর্‌ছেন আর কিন্তু তাদের নষ্ট করে শস্য বাঁচানো যায় তার উপায় আবিষ্কার করবার চেষ্টা কর্‌ছেন। এই সকল ব্যাপারের আলোচনা ও অধ্যয়ন আমাদের ব্যবসা সম্বন্ধে অনেক সাহায্য করে। যাঁরা পতঙ্গবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেছেন, তাঁরা কি করে তুঁতপোকাকে রোগের হাত থেকে রক্ষা ক'রে বর্দ্ধিত করতে হয় তা জানেন। গুটিপোকার রোগ হলে তা থেকে ভাল রেশম হয় না। ফ্রান্সে "Disease of Silkworm" অর্থাৎ গুটিপোকার রোগ সম্বন্ধে পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। সে বই পড়ে যাঁরা রেশমের চাষ করেন তাঁরা গুটিপোকাকে বর্দ্ধিত কর্‌বার নানারকম উপায় জান্‌তে পেরেছেন, আর সেই কারণে রেশমের চাষ খুব লাভবান হয়েছেন। আর আমাদের দেশে মুর্শিদাবাদ ও বহরমপুরে যেখানকার উৎকৃষ্ট রেশম এক সময়ে সব দেশে আদৃত হ'ত—সেখানে রেশমের চাষ দিন দিন উঠে যাচ্ছে; কারণ আমরা ঐ কাজ অজ্ঞ চাষাদের হাতে ফেলে রেখে দিয়েছি, যাদের গুটিপোকা সম্বন্ধে খুব বেশী কিছু জ্ঞান নেই।

এই সমস্ত কারণেই বল্‌ছি যে শেখ্‌বার অনেক আছে, শুধু কেতাব পড়্‌লেই হয় না। আমি এলবার্ট স্কুলে পড়্‌তাম। সেখানে প্রত্যেক শনিবার কেশব সেনের বক্তৃতা হত। তিনি এক সময়ে বলেছিলেন, "বাঙ্গালীর ছেলের লেখাপড়া শেখা যেন বালিসের খোলে তূলো পুরে দেওয়া; কেবল ঠাসো আর গাদো।" তার উপর অভিভাবক সর্ব্বনাশ কর্‌ছেন—স্কুলের ছুটি হলেই মাষ্টারবাবুকে ছেলের পিছনে লেলিয়ে দেবেন, ছেলে বিদ্যে শিখ্‌বে। এঁরা হচ্ছেন murderer of boys অর্থাৎ বালকহন্তা; কারণ স্কুলের ছুটির পর অন্ততঃ দুই বা আড়াই ঘণ্টা খেলা চাই। সে সময়টা খোলা মাঠে ছোটো, দৌড়াও, লাফাও, নদীতে নৌকা

যাও। তবে ত স্বাস্থ্য থাক্‌বে, মনে প্রফুল্লতা আস্‌বে। তা নয়, বাড়ী এসেই কেতাব নিয়ে বসো। তারপর কোন্ ছেলে কোন্ বিষয়ে backward অর্থাৎ কাঁচা, অমনি প্রাইভেট্ টিউটর লাগাও,—ইংলিসে একটি, সংস্কৃতে একটি, সব বিষয়ে একটি একটি। টিউটরের ঠেলায় বেচারি ছাত্র একেবারে dull অর্থাৎ গাধা হয়ে ওঠে, নিজে ভাব্‌বার্ বা নিজের উপর নির্ভর কর্‌বার শক্তি তার একেবারে লোপ পায়। তাই বলি এ প্রথার অনেক দোষ। এমার্সন বলেন, "Guardians are benefactors but sometimes they act like the worst malefactors"—অভিভাবকগণ ছেলের উপকার করেন বটে কিন্তু সময়ে সময়ে ভয়ঙ্কর অপকার সাধন করে থাকেন। বেশী পড়্‌লেই বিদ্যে হয় না। আমি আজীবন ধরে সামান্য একটি বিদ্যা আয়ত্ত কর্‌বার চেষ্টা করছি, কিন্তু পাঠ ঐ এক ঘণ্টা।

আমাদের বাঙ্গালীর ছেলের জীবন যেন একটা ভার বওয়া। বেদান্ত-মতে জীবন কিছুই নয়, দুহাজার বছর ধরে আমরা চিরকাল শুনে আস্‌ছি, জীবন মানে কিছুই নয়—নলিনীদলগত জলমিব—এর একটা প্রভাব জাতীয় চরিত্রে ত আছেই। আমরা সকলেই খানিকটা স্বীকার করে নিই যে জীবন একটা দুর্ব্বহ ভার। তার উপর আবার এই ভয়ঙ্কর জীবনসংগ্রাম। সকালে আটটার সময় বাড়ী থেকে দৌড়োদৌড়ি করে ম্যালেরিয়া-জীর্ণ শরীরখানি নিয়ে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করা অর্থাৎ কলমপিষে জীবিকা-অর্জ্জনের জন্য সহরের দিকে ছুটোছুটি করা। দিন যে কোথা দিয়ে চলে যায়, দুর্ভাগ্য বাঙ্গালী তা জান্‌তে পারে না—পৃথিবীর কোন আনন্দই সে উপভোগ করে না। আকাশের উন্মুক্ততা, আলোকের হাসি যা বাতাসের সুখময় স্পর্শ কিছুই প্রাণে সজীবতা ও নবীনতা আনয়ন করে না। লাবকের 'জীবনের সুখ' নামে একখানি পুস্তক আছে। ঐ পুস্তকে তিনি বলছেন—জীবন কি শুধু ঔষধ গেলা? জীবনে আনন্দ উপভোগই বিধাতার উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা কর্ম্মদোষে সেই উদ্দেশ্য বিফল করি। পাখী গায় কেন, প্রজাপতি মধু আহরণ করে কেন, যদি বিধাতার সৃষ্টিতে আনন্দ না থাকে।

লাবক একজন ধনী মহাজন (broker) ছিলেন। অতুল তাঁহার ধন ঐশ্বর্য্য, কিন্তু তিনি লেখাপড়া যথেষ্ট জান্‌তেন। তিনি আজীবন ছাত্র ("student")। অনেক ইউরোপীয় ধনী মৌমাছি পিঁপ্‌ড়া প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা আবিষ্কার করেছেন। আমরা তা বই পড়ে জানি, কিন্তু তাঁরা নিজের চোখে দেখে ঐসব কথা লিখে গেছেন। আমরা চোখ থাকতেও অন্ধ। শুধু চোখ থাকলেই হয় না, সূক্ষ্ম দর্শন চাই। ইউরোপীয়ান্ লেখক লাবক মৌমাছিদের

সাধারণতন্ত্র (Republic) সম্বন্ধে এক চমৎকার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। মৌচাকে কেমন করে সকলে কাজ করে সে অদ্ভুত বিবরণ পড়লে মাতোয়ারা হয়ে উঠ্‌তে হয়। লর্ড লাবক (Sir John Lubbock) যে শুধু ধনী ছিলেন তা নয়, কিন্তু তিনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও চিন্তাশীল লেখক। আমাদের দেশের ধনী সাধারণতঃ জবড়জং জানোয়ার হয়। তার নাকের ডগা থেকে ওলন-দড়ি ঝুলিয়ে দিলে ভুঁড়ির দরুন perpendicular অর্থাৎ লম্ব রেখার যে বিচ্যুতি হয় তাই তাঁর ধনশালিতার মাপ। ধনী জুড়ি চড়েন আর আয়েসে বিলাসে ডুবে থাকেন। কিন্তু ইউরোপে অনেক স্থলে এরূপ হয় না। বিলাতে মাটীর তলার রেল (underground railway) আছে। তাতে প্রথম দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণী নেই। লাখ্‌পতি ও সাধারণ লোক সব এক সঙ্গে এক জায়গায় বসে। এণ্ড্রু কার্ণেগী একজন ক্রোড়পতি: পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লৌহের মালিক। আমেরিকার পিট্‌স্‌বর্গে তাঁর লোহার কারখানা ছিল। প্রথম বয়সে তিনি খবরের কাগজ রাস্তায় বেচ্‌তেন। তারপর অসাধারণ অধ্যবসায়ের বলে আমেরিকায় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হন। পরে টাকা রোজগার ত্যাগ করে অধ্যয়নে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করেন। তাঁর ব্যবসা এত বড় ছিল যে একজনে নয়—অনেকে প'ড়ে ৯০ কোটি টাকা দিয়ে সেই ব্যবসাটি কিনেছেন। তার বাৎসরিক আয় হচ্চে সাড়ে চার কোটি টাকা। তিনি শ্রমজীবীদের জন্যে আমেরিকা ও স্কটল্যাণ্ডের অনেক সহরে বিনাব্যয়ে অধিগম্য পাঠাগার স্থাপন করেছেন। মজুরগণ সন্ধ্যার পর যখন অবসর পায় তখন ঐ সমস্ত লাইব্রেরীতে নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠ ক'রে আত্মোন্নতি সাধন করে। কার্ণেগী এখনও (এই বছর দু তিন নয়) অনেক বই লিখছেন। নাইন্টিন্থ্‌ সেঞ্চুরী পত্রিকায় তিনি শ্রমজীবীদের উন্নতি সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। আগেই বলেছি তাঁর আয় ছিল সাড়ে চারকোটি টাকা। আমাদের এই বাঙ্গালা বেহার ও অন্য জায়গার সকল জমিদারের বাৎসরিক আয় জড়িয়ে সাড়ে চার কোটি নয়। এখানকার সকল জমিদারকে একদিকে আর কার্ণেগীকে একদিকে রেখে ওজন করলে টাকায় তিনিই ভারী হবেন। কিন্তু বিচিত্র কথা এই যে তিনি এখনও পড়েন। ছিলেন "ষ্ট্রীটবয়" রাস্তায় কাগজ বেচ্‌তেন, কেবল স্বাবলম্বনের জোরে লক্ষ্মী-সরস্বতীর বরপুত্র হয়েছেন।

তোমরা অনেকেই ইউনিভারসিটির ফার্ষ্ট সেকেণ্ড হও; সেটা ভাল; কিন্তু আমাদের দেশের অপযশ। কারণ পাশের পর তোমরা নষ্টস্বাস্থ্য, ম্যালেরিয়াজীর্ণ,

রুগ্ন, ক্লিষ্ট, ক্ষীণদৃষ্টি। এই রকম ভাল-পাশ-করা ছেলের যজ্জীবনম্ তন্মরণম্। ইংলণ্ডে কিন্তু তা নয়। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেরা খুব বেশী পড়ে না, অকাল-পক্ক হয় না, এঁচড়ে পাকে না। ১৮৭৫ সালে ফার্ষ্ট ক্লাশ পাশ করে আমরা আজীবন তার দোহাই দিয়ে থাকি, যদিও এই পাশ করার পর লেখা-পড়ার সঙ্গে আর কোন সম্পর্কই আমাদের থাকে না। তারপর এই ফার্ষ্ট ক্লাশ পাশ করাটাই বা কি? বিশ্ববিদ্যালয়ের যা Academic year তাতে ত দুবছরে দশমাস মাত্র পড়া হয়। এই দশমাস পড়ে সব বিদ্যা আয়ত্ত হয়ে যায় কি? আজীবন না পড়্‌লে শেখা যায় না। প্রত্যেকদিন নূতন নূতন তত্ত্ব প্রকাশিত হচ্চে, সে-সকলের খবর রাখ্‌তে হবে। ফার্ষ্ট হও আর না হও, আজীবন পড়্‌বে, পাশ হবার পরেই কেতাবের সঙ্গে সেলাম আলেকম্ ক'রে তার নিকট চিরবিদায় গ্রহণ কি ভয়ঙ্কর। কি সর্বনাশ! এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী দেখ্‌লে আতঙ্কে আমার প্রাণ শিউরে ওঠে। তোরা ছদ্মবেশী, মূর্খ।

এমার্সন বলেন, "কোন ছেলে backward অর্থাৎ পড়াশুনায় কাঁচা হলে তিরস্কার করবে না। সাধারণতঃ ছেলেরা সব বিষয়ে ভাল বা চৌকস হয় না। যে সব বিষয়ে ভাল, সে ত একটা miracle—একটা অদ্ভুত কিছু যা ভূতলে অতুল। এমার্সন আরও বলেন, "কোন ছেলে যদি চুরি করে ক্লাসের বই ছাড়া অন্য বই পড়ে, মাষ্টার তাকে বেত মারেন, আমি হলে পুরস্কার দিই।" ছাত্র হয়ত নেপোলিয়নের জীবনী বা গোল্ডস্মিথের ইতিহাস বা যা তার স্কুলপাঠ্য নয় এমন কিছু পড়্‌ছে, তাতে বাধা দেওয়া অন্যায়, উৎসাহ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত, কারণ সে অনেক নূতন বিষয় শিখ্‌তে পারবে। ছাত্রের প্রতি চাপ দেওয়া উচিত নয়, তার প্রতিভার যাতে বিকাশ হয়, শিক্ষকদের তাই করা চাই। ইউনিভারসিটির বাঁধা বই পড়্‌লে বা গোটাকতক পাশ করলে প্রতিভার বিকাশ হয় না। হালিসহরে রামপ্রসাদ জন্মেছিলেন, তাঁর কথা সবাই জান। তিনি হিসাবলেখার এক চাকুরি পেয়েছিলেন, কিন্তু খাতার পিঠে পিঠে কালী-সংকীর্ত্তন লিখ্‌তেন। এমন কি ভারতের যে দুজন জগতে অসাধারণ কীর্ত্তি অর্জন করছেন,—রবীন্দ্রনাথ ও রামানুজম্ (উনি সম্প্রতি রয়েল সোসাইটির সভ্য হয়েছেন) তাঁদের কেহই ইউনিভারসিটি এডুকেশনের ধার ধারেন না, তাঁরা পাশ-করা নন। কিন্তু এই পাশ না করতে পারলেই আমাদের ছেলেদের মুখ আঁধার। মা বলেন—পোড়াকপাল আমার, ছেলে পাশ হলো না। আবার সময় সময় ছেলে আত্মহত্যা ক'রে বসে। আমি বলি—তোমার যা ভাল লাগে তাই কর। উৎসাহের সহিত একটা নূতন কিছু

আরম্ভ করে দাও। কারণ উকিল, ডাক্তার ও কেরাণী এই নিয়ে জাতি টেঁকে, না। আমাদের চরম দুর্গতি হয়েছে। এখন আমাদের নানা বিষয়ে, অর্থকর বিষয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দিতে হবে। এ সম্বন্ধে আমি আমার লিখিত "বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার" নামক পুস্তিকায় কয়েকটা কথা লিখেছি, তোমরা সেটা পড়ে দেখো। আমাদের অবস্থা দেখে মনে হয় বিধাতা যেন বলেন, "বাঙ্গালীর ছেলে, শরীর নষ্ট করবি আর কেরাণীগিরি করবি ; তার বেশী কিছুই নয়।" এ জীবনের পথ নয়, মৃত্যুর পথ ; এ পথ থেকে ফিরতেই হবে।

অন্ধদের বই পড়া

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

ডাক্তার মূনের নাম অনেকে শুনিয়াছেন। ১৮৩৫ সালে ইনি অন্ধ হন। সে আজ পঞ্চাশ বছরের কথা। এত কাল ইনি অন্ধদের জন্য খাটিয়াছেন ; বিশেষতঃ কিরূপ অক্ষরে পুস্তক ছাপা হইলে তাহাদের পক্ষে বেশি সুবিধা, তাহার সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করিয়াছেন।

অন্ধরা কিরূপে পড়িতে পারে, এ কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পার। যাহাদের চোখ নাই, তাহারা যে আমাদের মতো চোখের সাহায্যে পড়িতে পায় না, এ কথা সহজেই বুঝা যায়। অন্ধেরা হাতের সাহায্যে পড়ে। প্রায়ই দেখা যায় যাহাদের একটা শক্তি নাই, আরেকটা শক্তি তাহাদের খুব প্রখর হয় আর তা হওয়াও স্বাভাবিক ; একটা শক্তি না থাকিলে অপর একটার দ্বারা তাহার কাজ চালাইতে হয়, কাজেই সেটার চালনা খুব বেশি হয়। চালনার দ্বারা শক্তি বাড়ে।

কোন জিনিসটা কিরূপ পরীক্ষা করিতে হইলে, তাহার উপর হাত বুলাইয়া দেখে। এইরূপ ক্রমাগত হাত বুলাইয়া তাহাদের স্পর্শ শক্তিটা আমাদের চাইতে অনেক প্রখর হয়। অন্ধকে মুখে হাত বুলাইয়া মানুষ চিনিতে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আমরা তাহা পারি না, কারণ আমাদের স্পর্শ শক্তির তেমন চালনা হয় নাই। অক্ষর যদি কালিতে লেখা না হইয়া খোদা হয়, তবে অন্ধ তাহাতে হাত বুলাইয়া, সহজেই তাহার চেহারাটা মনে করিয়া লইতে পারে। অক্ষরগুলি খোদা না হইয়া, উঁচু হইলে আরো সুবিধা হয়।

অন্ধদের পুস্তকের অক্ষর সব উঁচু-উঁচু। অন্ধরা তাহাতে হাত বুলাইয়া বেশ পড়িয়া যাইতে পারে। তবে আমরা যেমন ছোট-ছোট অক্ষর পড়িতে পারি, অন্ধেরা তাহা পারে না। তাহাদের খুব বড়-বড় অক্ষরের দরকার হয়। তোমাদের জন্য যেমন 'সখা ও সাথী' বাহির হইয়াছে, অন্ধদের জন্য ইহার ষোল-সতেরো খানার মতন এক-খানা 'সখা ও সাথী' বাহির করিলে, তবে ইহার সকল কথা তাহাতে ধরিত।

অন্ধদের জন্য নানাপ্রকার লিখিবার প্রণালী বাহির হইয়াছে। মূন সাহেব সেগুলির দোষগুণ বিচার করিয়া, তার চাইতে অনেক সহজ উপায় স্থির করিয়াছেন। এই নূতন উপায়ে এখন বিস্তর ছাপা হইতেছে। তোমরা স্কুলে যতরকম বই পড়, তাহার সবই এখন অন্ধরা পড়িতে পারে—তোমাদের অঙ্ক,

ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি সব। অন্ধেরা ম্যাপ দেখে, ছবি দেখে, স্বর-লিপি দেখিয়া গান শিখে ; সব ঐরূপে উঁচু-উঁচু করিয়া লেখা। তোমরা চোখে দেখ, তাহারা হাত বুলাইয়া দেখে।

অন্ধদের জন্য যে ছবি প্রস্তুত করা হয়, তাহা তোমাদের ছবির মতো নহে। তাহাদের কোনরকম রঙ নাই, একটি কালো লাইন পর্যন্তও নাই। যাহারা জন্মান্ধ তাহারা তো কখনো রঙ দেখে নাই, সুতরাং তাহা যে কেমনতর তাহা তাহারা মনেও করিতে পারে না। এ সম্বন্ধে মূন সাহেব যে গল্প বলিয়াছেন, তাহা বলিয়া আমরা এই প্রস্তাব শেষ করিব।

লিখিবার সময়ে আমরা যেমন লাইনের পর লাইন বাম দিক হইতে আরম্ভ করিয়া ডাইনে শেষ করি, অন্ধদের তাহাতে ভারি অসুবিধা হয়। ওরূপ লেখা পড়িতে তাহারা সহজেই পথ হারাইয়া ফেলে। অন্ধদের একটি লাইন আমাদের লাইনের মতন বাম হইতে ডাইনে, তার পরেরটি পারসীর মতন ডান হইতে বামে, তার অপরটি আবার বাম দিক হইতে ডাইনে, এইরূপ করিয়া লেখা হয়। এরূপ হইলে, যেখানে একটি লাইন শেষ হইল, সেইখানেই আরেকটি লাইনের গোড়া পাওয়া গেল ; খুঁজিয়া বেড়াইবার আর দরকার হয় না। মূন সাহেবের সেই গল্প আমরা অন্ধদিগের কায়দায় লিখিতেছি। মূন সাহেব বলিতেছেন—

'অন্ধ হইবার পূর্বে আমার কুড়ি বৎসর বয়স হইয়াছিল, তাই কোন কিরকম
চেহারা বাড়ির, দেখাইত কেমন সব জন্তু মানুষ ছিল কেমন রঙটা ছিল, সবই
আমার বেশ মনে আছে ; কিন্তু আমি একটি মেয়েকে জানিতাম ,পা চারি
ঘোড়ার যে করিত মনে সে। ছিল অন্ধ অবধিই জন্মিয়া সে তাহার দুটিতে
ভর করিয়া সে চলে। আর দুটিকে আমাদের হাতের মতন, করিবার প্রস্তুত
ছবি জন্য অন্ধদিগের হইতে ইহা। রাখে তুলিয়া করিয়া কথা আমার মনে
হয়। আমি আমাদের বই লেখার মতন করিয়া উঁচু মেয়েটি অন্ধ সেই।
করিলাম প্রস্তুত ছবি বাড়ির একটি দিয়া লাইন প্রথমে মনে করিল সেটা
একটা জন্তু ; সে কিনা পৃথিবীর কোনো জিনিসই আর সঙ্গে তাহার কিন্তু।
করিয়াছিল মনে ওরূপ তাই নাই দেখে কখনো একজন ছিলেন, তিনি অল্পদিন
যাবৎ অন্ধ হইয়াছেন। তিনি ছবি খানির একটা এযে মেয়ে বোকা !
লিজি ও উঠিলেন বলিয়া বুলাইয়াই হাত উপর বাড়ি, বেশ বড় বাড়ি।'

বই বিক্রি

প্রকাশচন্দ্র দত্ত

"বই দেখবেন নিশ্চয়-ই নিশ্চয়-ই আসুন আসুন।" এই বলিয়া দু'হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে ঈষৎ ঘাড় হেলাইয়া সস্মিতমুখে পুস্তকালয়ের অধিকারী তাঁহার সোনার চশমার ভিতর দিয়া আমার প্রতি এক মর্ম্মভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বলিলেন—"এর মধ্যে অনেক জিনিষ আপনার পছন্দ-সই হ'তে পারে, একটু আগিয়ে বাঁদিকে ভিতরে চলুন দেখি। ওখানে বহু পুরাতন পুস্তকের নূতন সংস্করণ দেখতে পাবেন। শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে সুরু করে গোবরগণেশ পর্য্যন্ত ছোট-বড় সকল লেখকেরই লেখা এই সকল সংস্করণে সংগৃহীত হয়েছে। দামও বেশী নয়—এই সংস্করণের এক-একখানির দাম আড়াই টাকা মাত্র! কিম্বা পরলোকগত গ্রন্থকারদের ভিতর যদি কারো গ্রন্থ চান তবে তাও ঐখানেই পাবেন। দাম মাত্র পাঁচসিকা করে। অনন্তবাবু, এই ভদ্রলোকটিকে নিয়ে গিয়ে আমাদের ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের বইগুলি এঁকে দেখান ত।"— এই বলিয়া নির্দ্দিষ্ট দিক দেখাইয়া দিয়া তাঁর উক্ত কর্ম্মচারীর সহিত আমাকে বিদায় দিয়া নিশ্চিত হইলেন। অর্থাৎ তিনি যে এক আঁচড়ে আমাকে চিনে নিয়েছিলেন তা বুঝা গেল। আমার চাঁদনীতে-কেনা আদ্দীর পাঞ্জাবী, মিনে-করা বোতাম এবং চুনট-করা উড়ানী, দশ-আনা-ছ-আনা ছাঁটার স্থলে নাতিদীর্ঘ চুলের টেরী ও সোনার চশমা তাঁর চোখে ধুলো দিতে পারে নি। কেননা এসকল ছদ্মবেশে আসল মানুষটাকে লুকিয়ে রাখা যায় না। সে ধরাই পড়ে—বিশেষ পাকা ব্যবসাদারের কাছে। আমি যে একজন অধ্যাপক, পুস্তকালয়ের স্বত্ত্বাধিকারী বোধ হয় তা জানতেন—অন্ততঃ এটা তাঁর ব্যবসায়ী প্রতিভার বলে তিনি তৎক্ষণাৎ সেটা এঁচে নিতে পেরেছিলেন। কলিকাতার মতন প্রধান সহরে এত বড় একজন পাকা পুস্তক-বিক্রেতাকে চট্ করে ঠকানো খদ্দেরের পক্ষে কিছু শক্ত। খদ্দের হিসাবে আমি যে কিছুই নই এবং অন্যান্য অধ্যাপকের ন্যায় গুড়ের কলসীতে মাছি বসার মত আমি যে ঘণ্টা-দুই অবসর অলসভাবে বই নাড়াচাড়া করে তারপর সস্তায় যা-হোক একখানি লয়ে শেষে সরে পড়ব একথা বুঝতেও তাঁর বাকী ছিল না।

সদ্য-প্রকাশিত সিল্কে বাঁধা প্যাডের মলাট জ্বলজ্বলে সোনার অক্ষরে নাম-লেখা

সাড়ে চার টাকা দামের, নীতি-বিগর্হিত যৌনতত্ত্বপূর্ণ বেয়াড়া বস্তুতান্ত্রিক উপন্যাস পড়বার রুচি এবং কেনবার পয়সা যে আমার নেই তা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। এজন্য আমায় বিশেষ প্রীতির চক্ষেও যে তিনি দেখছিলেন না, তা আমিও বুঝেছিলুম। তবে বইয়ের দোকানে এক কোণ অধিকার করে নিবিড়ভাবে পুস্তক-দর্শনে নিরত অধ্যাপক যে একটা সুফলপ্রদ বিজ্ঞাপনের সমান এবং এ-দৃশ্য অন্য খরিদ্দারের কাছে দোকানের পসার বৃদ্ধি করে—এটাও তাঁর বেশ জানা ছিল এবং এইজন্যই বোধ হয় হরিকিঙ্কর বাবুর মত একজন বই-বিক্রেতা আমার মত লোককে এমনভাবে আমল দিলেন। আমিও এই সুযোগে তাঁর আসল ও বিশিষ্ট বিশিষ্ট খরিদ্দার চরানোর পন্থা লক্ষ্য করবার অবসর পাইলাম। এবং এই অবসরে বুঝতেও পারলাম, এই মহানগরীর প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর আসন এত উচ্চে প্রতিষ্ঠিত কেন? মথি লিখিত সুসমাচার হ'তে রেজেষ্ট্রি দর্পণ পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর পুস্তকই রয়েছে দেখলুম; অবশ্য নির্দ্দিষ্ট স্থলে দাঁড়িয়ে—গোয়েন্দাগিরি করবার উদ্দেশ্য আমার ছিল না। সত্য বলতে কি—পুস্তকখানি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বইখানির ছাপাও ঝর-ঝরে, বাঁধাই দিব্যি অথচ দামও সস্তা—দেড় টাকা মাত্র। এবং তক্ষুনি সেখানা কিনে ফেলবার জন্যে আমি খুবই ঝুঁকেছিলাম, তবু একবার মনে হল কিনবার আগে একবার ভাল করে নেড়ে-চেড়ে দেখি। বইখানার আন্দাজ তিন অধ্যায় শেষ করেছি, এমন সময় দোকানের অপর পার্শ্ব সামনের দিকে যে কথাবার্তা চলছিল, তার প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হল। শুনতে পেলুম এবং শেলফের ফাঁকে দেখিতেও পেলুম—সুবেশিনী এক রমণী হরিকিঙ্কর বাবুকে বলিতেছেন—আপনি ঠিক জানেন, এটা তাঁর সব শেষের লেখা?

পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ বলিলেন—"নিশ্চয়ই—আমি আপনাকে নিঃসংশয়ে বলছি এটা একেবারে তাঁর হালি বই। সবে কালকে মাত্র এখানে এসেছে।" এই কথার সঙ্গে সঙ্গে শ্বেত ও নীলে বাঁধা সমুজ্জ্বল একটি বইয়ের গাদার দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিলেন। উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে নাম লেখা ছিল—আমি দেখতে পেলুম—"সোনার স্বপন।"

অধ্যক্ষ পুনরুক্তি করিয়া বলিলেন—"আমি ঠিক বলছি এই গ্রন্থ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শেষ রচনা এবং বেজায় কাটছে।"

রমণী বলিলেন—"আচ্ছা তাহলে ঠিক-ই হয়েছে। তবে কি জানেন সময় সময় বড় ঠকে যেতে হয়। এই দেখুন না, গেল সপ্তাহে এখান থেকে দু'খানা বই নিয়ে গেলুম, বেশ বই—কিন্তু তখন ত আর অত খুঁটিয়ে দেখি নি, তারপর বাড়ী গিয়ে দু'খানাই পুরোনো বই, দু'মাস আগে বেরিয়েছে।

ক্ষমা প্রার্থনার স্বরে অধ্যক্ষ বলিলেন—"এঃ! এ ত বড় লজ্জার কথা—ছিঃ ছিঃ ছিঃ! আপনি যদি অনুমতি করেন তাহলে বই দু'খানা ফিরিয়ে নিয়ে তার বদলে না-হয় আর কিছু পাঠিয়ে দিই।"

রমণী বলিলেন—"না থাক্ তার আর দরকার নেই। আর তা-ছাড়া আমিও সে পড়ি নি, আমার কাছে যে মেয়েটি থাকে—আমার সেবা-টেবা করে তাকেই দিয়েছিলুম। সে অত শত বোধ হয় বুঝতেই পারবে না।

ঈষৎ ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া অধ্যক্ষ বলিলেন—"তা ত বটেই।" তারপর হাল ফ্যাসানের ব্যবসাদারীর ভাষায় দিব্যি সহজ নির্লজ্জভাবেই বলিলেন—"কি জানেন, সময়ে সময়ে এত বড় ব্যাপারে এ-সকল ভুল-ভ্রান্তি অনিবার্য্য হয়ে পড়ে। এই দেখুন না কালকের কাণ্ডটাই—কি দুঃখের কথাই বলুন দেখি! আমাদের চাটগাঁয়ের একজন খুব পুরোনো খদ্দের ষ্টীমারে পড়তে-পড়তে যাবেন বলে তাড়াতাড়ি এসে শুধু বইয়ের নাম মাত্র দেখে—অনেক পাঠকই এমন করে থাকেন—দু'খানা বই পছন্দ করে নিয়ে গেলেন। তারপর আমরা দেখি সে বই দু'খানা গত বছর বেরিয়েছিল। আমরা সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠিয়ে তাঁকে খবর দিলুম, কিন্তু তখন আর উপায় নেই—তাঁর ষ্টীমার ছেড়ে দিয়েছে।"

রমণী অলসভাবে তাঁর হাতের বইখানার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলিলেন,—"যাক্ এখন বলুন দেখি এই বইখানা কি ভালো হবে? এখানা কি-সম্বন্ধে লেখা?"

অধ্যক্ষ বলিলেন—"এটা একটা অসাধারণ বই। একজন দস্তুর-মতন বিদ্বান্ লোকের লেখা। সমালোচকেরা ত সবাই একসঙ্গে বলছেন—এ মরসুমে যত বই বেরিয়েছে তার মধ্যে বোধ হয় এইখানাই একমাত্র বই যার সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ করা যেতে পারে। এর এমন একটা—", একটা—অবধি বলিয়া অধ্যক্ষ হাত-মুখ নাড়িয়া এমন-একটা ভঙ্গি করিলেন যাহা দেখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াইবার সময় ঠিক প্রতি-শব্দ যোগাইতে না পারিয়া সময়ে সময়ে আমার নিজের যেরূপ অবস্থা হয় তাহাই মনে পড়িয়া গেল। তবুও তিনি ছাড়িলেন না—বলিয়াই চলিলেন—"বইখানায় এমন-একটা শক্তি,—এমন-একটা অনন্যসাধারণ-শক্তি, যদি বলা যায় যে এ-মাসে যত বই বেরিয়েছে তার মধ্যে এখানার মত এত শক্তিশালী আর কোনখানই নয়—তবে বোধ হয় সেটা বাহুল্য বলা হবে না।" কিন্তু এ-বক্তৃতাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে অবশেষে তিনি ব্যবসায়ের ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করে বসলেন—"তার সাক্ষী দেখুননা, বইখানা কি-রকম ভয়ানক বিক্রী হচ্ছে।"

রমণী বলিলেন—"তাই দেখছি—এই ত দেখছি এনেছেনও গাদা-পরিমাণ।"

অধ্যক্ষ বলিলেন—"কি করি বলুন বইখানা পড়তে পাচ্ছে না। বলতে কি বইখানা বেরিয়ে অবধি সাহিত্য-সমাজে একটা হৈ-চৈ পড়ে গেছে—দেখতেই ত পাচ্ছেন। এমন-কি কেউ কেউ এমনও বলছে—এ বইখানার প্রচার—" তারপর চারিদিকে চেয়ে চুপি চুপি কি বলিয়া যে তাঁর বক্তব্য শেষ করিলেন তাহা আমার কর্ণগোচর হইল না।

উত্তরে বিস্ময়সূচক স্বরে রমণী বলিলেন—"তাই নাকি, তা' হ'লে আমি একখানা নিলুম। যে-লেখা-সম্বন্ধে এত ডামাডোল পড়ে গেছে সে জিনিষটা কি তা নিশ্চয়ই দেখা উচিত।"

রমণী এইবার তাঁহার লেশযুক্ত অর্দ্ধ অবগুণ্ঠন, সোনার চশমা, কুমীরের চামড়ার হাত ব্যাগ গুছাইয়া লইয়া এবং বাঁ হাতে সুগন্ধি রুমালখানি আর একটু টিপিয়া ধরিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তার পর হঠাৎ কি মনে পড়ায় অধ্যক্ষের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"হাঁ দেখুন। আমি ভুলে যাচ্ছিলুম—এই—বইটার সঙ্গে আমার স্বামীর পড়বার মত আরো খান-কয়েক বই পাঠিয়ে দিতে পারেন? তাঁর এই লম্বা ছুটিতে তিনি সিমলায় যাচ্ছেন। আপনি জানেন ত তিনি কি-রকম বই পছন্দ করেন?"

অধ্যক্ষ বলিলেন—"অবিশ্যি—অবিশ্যি! তিনি ত সাধারণত এ—ইয়ের বই—ঐ যে, কি বলছিলুম—ইয়ের গ্রন্থ—তাত তিনি প্রায়ই কেনেন।'

রমণী বলিলেন—"হাঁ—হাঁ এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত—এইসব আর কি।"

"ঠিক্" বলিয়া অধ্যক্ষ তাঁহার বামদিক-স্থিত একটি প্রকাণ্ড শেলফ দেখাইয়া বলিলেন—"ঐ যে ওখানে সে-সব বিস্তর রয়েছে। 'সাহারায় সাত সপ্তাহ'—সাড়ে সাত টাকা; 'মালগাড়ীতে ছ'মাস'—পনরো টাকা বারো আনা; 'গন্ত্রীরথে সন্ধ্যাযাপন' দু'খণ্ড—তেইশ টাকা তেরো আনা।"

রমণী বলিলেন—"আমার বোধ হয় উনি ও-সব পড়েছেন। অন্ততঃ বাড়ীতে গাদা খানেক ঐ-রকম সব কি আছে দেখতে পাই।"

অধ্যক্ষ—"খুব সম্ভব। তাহলে লঙ্কার রাক্ষসদের মধ্যে সেও বোধ হয় আছে? কিন্তু দেখুন দেখি এখানা—এখানা সবে মাত্র আজ সকালে এসেছে। 'বিষ্ণুপুর ও বৃন্দাবনের বানর-সমাজ'—দামও সস্তা—নেট কুড়ি টাকা।" এই বলিয়া অধ্যক্ষ 'সোনার স্বপনে'র মতন সুদৃশ্য এবং সংখ্যায় সমতুল, এক থাক্ নূতন বইয়ের উপর

অঙ্গুলি সঞ্চালন করিলেন। এবং খুব মিঠে রকমে পুনরুক্তি করিয়া বলিলেন—'বানর-সমাজ'।

রমণী বলিলেন—"দাম-টা বেজায় বেশী না?"

অতি উৎসাহের সহিত অধ্যক্ষ বলিলেন—"সেটা ঠিক! তবে ওই বইটাই ত অত্যন্ত দামী। এর ছবিগুলো দেখুন দেখি—এই ফটোগুলো জীবন্ত বানরের ছায়া-চিত্র। ক্যামেরার সাহায্যে নেওয়া হয়েছে। তারপর কাগজ ছাপা সে ত দেখতেই পাচ্ছেন। এই বইখানার খরচাই পড়েছে উনিশ টাকার উপর। এর উপর আমরা বিশেষ-কিছু লাভ করতে চাই না। তবে এ-সকল বই নাকি বিশেষ মূল্যবান তাই রাখতেও হয়।"

অধ্যক্ষের এই নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা থেকে আমি তু'টি জিনিষ আবিষ্কার করিলাম। প্রথম—গুছিয়ে বলতে পারলে ব্যবসা-বিশেষের খুঁটিনাটির কথা সকলেই শুনিতে চায়। কেতাব বিক্রির ব্যবসাতেও লোকসান খুব এবং সেজন্য বইওয়ালা বিশেষ সহানুভূতির যোগ্য। সুতরাং রমণী অতি সহজেই 'বিষ্ণুপুর ও বৃন্দাবনের বানর-সমাজ'কে গ্রহণ করিলেন। হরিকিঙ্কর বাবুও তাঁর কেরাণীকে থিয়েটার-রোডের এক ঠিকানা লিখিতে বলিয়া তাঁর সুবেশিনী খরিদ্দারকে অভিবাদন পূর্ব্বক তুয়ার পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া আসিলেন।

আবার ডেস্কে ফিরিয়া কিন্তু অধ্যক্ষ সম্পূর্ণ দোসরা লোক লইয়া দাঁড়াইলেন। আমি শুনিতে পাইলাম, তিনি আস্তে আস্তে সহকারীকে বলিতেছেন—"এই বাঁদুরে বই কাটাতে বিশেষ বিপদে পড়তে হবে।" আরো বোধ হয় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তা আর ঘটে উঠল না। আর একটি নারী-খরিদ্দার আসিয়া দেখা দিলেন। পারিপাট্যের মধ্যে তাঁর শুভ্র বেশের সংযম এবং বিষাদমাখা মুখ দেখিলে তিনি যে বিধবা তা হরিকিঙ্কর বাবুর অভিজ্ঞ দৃষ্টি না থাকলেও অন্য লোকের চোখে তা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়।

—"কি বললেন, নতুন গল্পের বই—হাঁ—হাঁ—এই যে, আছে বই কি! 'সোনার স্বপন' চমৎকার সুন্দর গল্পের বই। সমালোচকরা সবাই বলছেন—'শরৎ বাবুর এ রকম মিষ্টি বই আর একখানাও নেই।"

অতি মৃতুস্বরে রমণী বলিলেন—"সত্যি কি বইখানা খুব ভালো?"

আমি বুঝিলাম—যথার্থ-ই খরিদ্দাররা বইখানা চায়।

অধ্যক্ষ—"চমৎকার বই। এ-টা একটা প্রেমের কাহিনী। সোজা সরল অথচ আশ্চর্য্য রকমের চমৎকার সমালোচনাতেও সেই কথাই প্রকাশ। এখানা এ-মাসের

সকল বইয়ের সেরা। কাল রাত্রে আমার স্ত্রী বইখানা পড়ছিলেন শুনছিলুম। শেষটা চোখের জলে তার পড়া পর্য্যন্ত ভেসে গেল।"

—"বইখানা সম্পূর্ণ নিরাপদ ত? ছেলে-পুলেদের হাতে দেওয়া যেতে পারে ত?" বিধবা বলিলেন, "তা'হলে আমার মেয়ের জন্য নি।"

নীতিবিশারদ অভিভাবকের গাম্ভীর্য্যের সহিত হরিকিঙ্কর বলিলেন—"নিশ্চয়-ই—দূষ্য এতে কিছুই নেই। সেকেলের ধাঁচে লেখা—আগেকার সব বইয়ের মত। এই ধরুন—" বলিয়াই অধ্যক্ষ একটু থামিয়া পড়িলেন। কাদের মতন বলিবেন তা ভাবিয়া লইলেন এবং শেষে বলিলেন,—"এই ধরুন অক্ষয় দত্ত, ভূদেব মুখুজ্যে, চন্দ্রনাথ বোস, এমন-কি কতকটা বিদ্যাসাগরের ধরনের লেখা। মেয়ে-স্কুলের জন্য সবাই ত নিচ্ছে। যারা সমাজতত্ব ও ধর্ম্মতত্বের আলোচনা করেন তারাও ত কিনছেন দেখছি।"

বিধবাটি দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া একখণ্ড 'সোনার স্বপন' কিনিলেন এবং তৃণশ্যাম সুচিক্কণ কাগজে পুস্তকখানি বাঁধা হইলে তাহা লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

তারপরেই চড়া গলায় ছোড়া ছোড়া কথায় এক খরিদ্দার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই—সময় কাটাবার জন্যে হালকি-গোছের কিছু আছে—বই টই?" লোকটার রকম-সকম দেখিয়া বোধ হইল, তার ব্যবসা দালালি এবং সেও সহরের বাহিরে কোথাও অবসর যাপন করতে চলেছে।

হরিকিঙ্কর বলিলেন—"আজ্ঞে হাঁ—খুব আছে! এই দেখুন না—এইখানা—সোনার স্বপন: খুব হালকা অথচ খুব মজার বই। এই কাল আমার স্ত্রী পড়ে শোনাচ্ছিলেন—হাসতে হাসতে একেবারে নাড়ী ছিঁড়ে যায়।"

—দাম কত? টাকা তিনেক?—সাড়ে তিন টাকা?—ওঃ! আচ্ছা বেশ বেঁধে দিন।

পর মুহূর্ত্তেই টেবিলের উপর টাকা ঝন্-ঝনের শব্দ হইল। খরিদ্দারও বই লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। আমার বুঝিতে বাকী রহিল না কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপক যারা সস্তায় প্রত্নতত্ত্ব খুঁজে বেড়ায় বইয়ের বাজারে তাদের হাল কি! তার পরে-ই দেখলুম অধ্যক্ষ দিব্যি গোলগাল ভুঁড়ি-বিশিষ্ট—কাঁচায়-পাকায় মিশ্রিত গঙ্গা-যমুনার মিলন ক্ষেত্রের মত গুম্ফবিশিষ্ট এক ব্যক্তিকে সবিশেষ নম্রতার সহিত বলিতেছেন—"সমুদ্র-সংক্রান্ত বই? হাঁ হুজুর আছে বই কি। আপনাদের যেরূপ মস্তিষ্ক চালনা করতে হয় তাতে এইরূপ গ্রন্থই আপনাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই দেখুন না এই—খুব সম্প্রতি বেরিয়েছে।—'বিষ্ণুপুর ও বৃন্দাবনের বানর-সমাজ'। দাম তিরিশ টাকা—উপস্থিত অর্দ্ধমূল্যে পনেরো টাকায় দেওয়া যাচ্ছে।

এর ছাপা-খরচাই পড়েছে আঠারো টাকা। আমরা নাকি ষ্টক সাবাড় করছি তাই এত সস্তায় যাচ্ছে। তা হ'লে পাঠিয়ে দেবো কি?"

"হাঁ—"

"যে আজ্ঞে। আসুন নমস্কার—নমস্কার!"

খরিদ্দারটি চলিয়া যাইলে অধ্যক্ষ তাঁর বিস্মিত সহকারীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"চিনতে পারলে না? আলিপুরের প্রথম সাবজজ।" এর পর নাগাড়েই খরিদ্দারদের যাওয়া-আসা কেনা-বেচা চলিতে লাগিল। আমিও দেখলুম যদিও দোকানে বিভিন্ন রকমের হাজার হাজার পুস্তক রয়েছে কিন্তু অধ্যক্ষ মহাশয় উক্ত দু'খানা বই কাটাবার জন্যই সমধিক ব্যগ্র। স্ত্রীলোক খরিদ্দার মাত্রেই 'সোনার স্বপন' লইয়া যাইতেছে এবং পুরুষ খরিদ্দারকে 'বানর-সমাজ' রচনা বেচা হইতেছে। রমণীদের মধ্যে 'সোনার স্বপন' কাউকে অবকাশরঞ্জনের বই বলিয়া, কাউকে বা তাহার বিপরীত বলিয়া, কাউকে বা বর্ষার দিনে পড়িবার, কাউকে বা বসন্তে পড়িবার উপযুক্ত বলিয়া দেওয়া হইতেছে এবং 'বান্দরে পুস্তক' কখনও বা জলের গল্প কখনও বা স্থলের, কখনও বা জঙ্গলের, কখনও বা পাহাড়ের গল্প বলিয়া কাটানো হইতেছে এবং হরিকিঙ্করের মতে যে খরিদ্দার যে-রকম সহিতে পারিবে তার কাছ হইতে সে-রকম দাম আদায় করা হইতেছে। এইরকম করিয়া ঘণ্টা-দুই কাটিবার পর দোকান দেখলুম খরিদ্দারশূন্য হইয়া আসিয়াছে এবং অধ্যক্ষ তাঁহার প্রধান সহকারীকে বলিলেন—"দেখ অনন্ত আমি এক-মুঠো খেয়ে আসি। এই বই-দু'খানা কাটাবার প্রাণপণ চেষ্টা করো, আরো সপ্তাহ খানেক এ-রকম করতে হবে। তারপর প্রকাশকদের কাছে গিয়ে দেখি তার ঘাড় ভেঙ্গে আর কি করা যায়।"

আমিও দেখলুম যথেষ্ট হয়েছে আর নয়, সুতরাং একখানা বই হাতে করিয়া হরিকিঙ্করের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলাম। বইখানার নাম 'ভামিনী'। পাতলা চটি বই। বর্ত্তমান ইংলণ্ডের রাজা ও রাণী পূর্ব্বে যখন যুবরাজ ও যুবরাজমহিষী রূপে এদেশে আসিয়াছিলেন তখন তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনার্থ যে কবিতা উপহার দেওয়া হয় তাহার একস্থানে যুবরাজ-মহিষীকে 'ভামিনী' সম্বোধন করা হয় এবং সেই সময়কার দু'খানি সুবিখ্যাত সাময়িক পত্রে এই কথার ব্যুৎপত্তি ও প্রয়োগ লইয়া বাদানুবাদ চলে। ইহাতে তাহাই লিপিবদ্ধ ছিল। আমাকে দেখিয়া অধ্যক্ষ মুহূর্ত মধ্যে তাঁহার ব্যবসাদারী চাল ফিরাইয়া আনিলেন এবং হাসিয়া বলিলেন—"দেখি কি বই পছন্দ করলেন? ও 'ভামিনী'! হু এ নিয়ে যে তখন খুবই লেখা-লেখি হয়েছিল। যে দু'খানি কাগজে এর আলোচনা হয় সে দু'খানিই দেশী-লোক-

পরিচালিত লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইংরাজী কাগজ। আশ্চর্য্যের বিষয় কোন বাংলা সাময়িক পত্রে এ-প্রসঙ্গ আলোচিত হয় নাই। দাম? এতে ফেলা নেই তা আপনি টাকা-দুই দেবেন। চটি হলেও শব্দতত্ত্বের হিসাবে বইখানাকে দামী বলতে হবে! সে যা'হোক আর কিছু পুরোণো বই-টই দেখবেন না?" বলিয়াই ঝা করিয়া টেবিলের উপর হইতে একখানা পুস্তকের তালিকা লইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। ফোক্‌লা দিগম্বর, তফসীর' হাক্কানী, ত্রোপুধ ও ভল্লিক, প্রাচীন কলিকাতার আচার-ব্যবহার, বাল্মীকি ও কীর্ত্তিবাস, প্রেমেরার হাটহদ্দ, প্রেমের পরীক্ষা, কুবুদ্ধি, হাতেম-তাই, মথুরা-মাহাত্ম, কর্ম্মনাশা, বৈষ্ণব পদাবলী, মুক্তা-লতাবলী, কলিকুতুহল,—না আজ আর থাক। আর একদিন না হয় তখন আসবো, বলিয়া পুস্তকের মূল্য দিয়া উহা গ্রহণান্তে চলিয়া যাইতেছিলাম; কিন্তু 'সোনার স্বপন' সম্বন্ধে আমার যে অনিবার্য্য কৌতূহল হইতেছিল তাহা আর সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাঁহাকে বলিয়া ফেলিলাম—"আচ্ছা সত্যিই কি আপনি 'সোনার স্বপন'কে এত আশ্চর্য্য ভাবেন?"

হরিকিঙ্কর বাবু আমার প্রতি একটি নাতিতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঈষৎ হাসিলেন। তিনি বিলক্ষণই বুঝিয়াছিলেন উক্ত পুস্তক আমি কিছুতেই লইব না। এবং বোধ হয় ক্ষণেকের জন্য পাটোয়ারি বুদ্ধি তাঁহাকে পরিত্যাগ করায় তিনি মাথা নাড়িয়া আমাকে বিশ্বস্তভাবে বলিলেন "বিপদের কথা বলেন কেন? এই দুই প্রকাশক আমাদের ঘাড় দিয়ে তাঁদের দায় উদ্ধার করতে চান্। তাঁরা একা কিছু করে উঠতে পারছেন না, তাই আমাদেরও জড়িয়েছেন—আমাদের সাহায্য চান্। খুব রংদার বিজ্ঞাপন ছাড়ছেন, কাটলেও কাটতে পারে এবং কিছু সম্ভাবনাও আছে। তবে বলা ত যায় না। তার ওপর নীতিবিশারদ রুচিবাগীশ প্রভৃতির দলও ত আছেন কি না। সেই যা একটু ভয়। তা-ছাড়া বই-দু'খানাও আমার মনে হয় ডাহা ফাঁকি।"

—আপনি পড়ে দেখেন নি?

—ক্ষেপেছেন? গোয়ালাকে তার নিজের দুধ খেয়ে দেখতে বললে তার যে ভাব হয় সেই ভাবেই অধ্যক্ষ উক্ত কথাটি আমায় বলিলেন। ফি হাত নতুন যে বই বেরুবে তা যদি পড়ে দেখতে হয় তা'হলেই হয়েছে আর কি? না-পড়েই তাদের ধাক্কা সামলানো যায় না।

আমি বলিলাম—"তা হলে যারা বইগুলো কিনে নিয়ে গেল তাদের কি হবে? তারা ত খুবই নিরাশ হবে?"

হরিকিঙ্কর মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"না না সে ভয় নেই। ওরা কিনেই নিয়ে যায়—পড়ে না—কস্মিন কালেও না।"

—কিন্তু আপনার স্ত্রী? তিনি ত বইখানার খুবই সুখ্যাতি করেছেন বলছিলেন?

এইবার হরিকিঙ্কর বাবু তাঁর ব্যবসাদারী সংযম হারিয়ে ফেলে খুব একগাল হাসিয়া বলিলেন,—"আজ্ঞে আমি আজও অকৃতদার।"

সাহিত্যিকের আয়

যতীন্দ্রমোহন দত্ত

বাণীর সেবকবৃন্দের প্রতি কমলার অপ্রসন্নতার কথা এদেশের একটা প্রবাদ বাক্য হইলেও প্রতীচ্যদেশের বেলায় যেন এ কথাটা খাটে না। আমাদের দেশে সাহিত্যিকদের দুরবস্থার কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। কদাচিৎ দুই এক জন সাহিত্য-সেবী আপনাদের সাহিত্যসাধনার বিনিময়ে যৎকিঞ্চিৎ অর্থলাভ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লেখককেই দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্যদেশের সাহিত্যসেবীদের আয়ের কথা শুনিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া থাকিতে হয়। সে সব দেশে এমন লেখকদের কথা শুনা যায়, যাহাদের লেখার আয় প্রধান মন্ত্রীর বেতন অপেক্ষা অনেক বেশী।

কাজেই সেখানে সাহিত্য সাধনাও যে বেশ একটি লাভজনক ব্যবসায় তাহা সহজেই বুঝা যায়।

সাহিত্যিকদের আয় সম্বন্ধে ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ডিসরেলী তৎপ্রণীত Curiosities of Literature গ্রন্থে বেশ চমৎকার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কৌতূহলী পাঠকগণের চিত্তবিনোদনার্থ অতি সংক্ষেপে উহা হইতে কতক সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

হোমারের অনুবাদকারী ইংরাজ কবি পোপ এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা পাইয়াছিলেন। ঋণজালে জর্জ্জরিত হইয়া উহা পরিশোধার্থ সার ওয়াল্টার স্কট লেখনী ধারণ করেন। শুনা যায় মৃত্যুকালে তিনি প্রায় পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক বলওয়ার লিটনকে মেসার্স রলটেজ কোম্পানী দশ বৎসরের নিমিত্ত তাঁহার উপন্যাসগুলির স্বত্ব ক্রয়ের জন্য নাকি তিন লক্ষ টাকা দিতে চাহিয়াছিল। চারলস ডিকেনস্ তাঁহার উপন্যাস বিক্রয় করিয়া মৃত্যুকালে পনের লক্ষ টাকা রাখিয়া যাইতে সমর্থ হন। লর্ড বায়রণের যথেষ্ট আয় ছিল। মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারীরা তদীয় গ্রন্থের আয় হইতে তিন লক্ষ টাকা পাইয়া ছিলেন। এন্টনি ট্রল্লোপ বই লিখিয়া কুড়ি বৎসরের মধ্যে সাড়ে দশ লক্ষ মুদ্রা উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। জর্জ্জ ইলিয়টকে প্রথম প্রথম নিরাশ হইতে হইয়াছিল। কিন্তু পরে তাহার উপন্যাসাবলী অসম্ভব উচ্চদরে বিক্রীত হইয়াছিল।

"Romola" এক লক্ষ পাঁচ হাজার, "Middle March"র আমেরিকান সংস্করণ আঠার হাজার, ও "Aduna Bede" লিখিয়া তিনি ছয় লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন। মেরী করেলি তাঁহার একখানা পুস্তকের জন্য তিন লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন। মিসেস্ রাইট নাম্নী লেখিকা একখানা মাত্র গ্রন্থ লিখিয়াই বড় লোক হইয়াছিলেন—অর্থাৎ প্রায় ছয় লক্ষ টাকা তাঁহার ঘরে আসিয়াছিল। মিঃ উইন্সটন চার্চ্চহিল কে তাঁহার পিতার জীবন চরিতের মূল্য বাবত ম্যাক্‌মিলান কোম্পানী এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা দিয়াছিলেন।

লর্ড মর্লী ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী গ্লাডষ্টোনের জীবনী লিখিয়া দেড় লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন। সার জেমস্ ব্যারি The Little Minister নামে একখানা নাটক রচনা করিয়া ছয় লক্ষ টাকা পান এবং তাঁহার সাহিত্য সাধনার বাৎসরিক আয় নাকি চারিলক্ষ টাকা ছিল। পরলোকগত জর্জ্জ আর সিমস্ "The light of London" প্রণয়ন করিয়া ছয়লক্ষ টাকা ও The Harbour Light লিখিয়া দুইলক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা লাভ করেন। গিবনস্ তাঁহার Decline and fall of the Roman Empire লিখিয়া দেড়লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন। History of England র স্বনামখ্যাত গ্রন্থকার মেকলে তিনলক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ আমেরিকান হাস্যরসিক মার্ক টোয়েনের আয় ছিল অসাধারণ। তিনি বহি লিখিয়া প্রায় পঁচিশ লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন। মিঃ কিপলিঙ্গের আয়ের কথা যদিও সবিশেষ জানা যায় নাই, তথাপি তিনি নাকি একবার কণ্টারবেরীর আর্চ-বিশপের সমস্ত সম্পত্তি কিনিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তাঁহার ছোট গল্পগুলি তিন হাজার টাকা হিসাবে বিক্রয় হইয়াছিল। তাঁহার কোন বহি কোন পাব্লিশিং কোম্পানী ছাপাইতে চাহিলে বহির লভ্যাংশ ছাড়া, তাঁহাকে ষাইট হাজার টাকা করিয়া বেশী দিতে হইত। তাঁহার বিখ্যাত "Kim" এর জন্য ম্যাকুলার কোম্পানী তাঁহাকে পঁচাত্তর হাজার টাকা দিয়াছিল।

অবস্থা এরূপ হইলেও বিলাতের অনেক প্রথিতযশ লেখকের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সেকালে জলের দামে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। মহাকবি সেকস্‌পিয়ারের বিশ্ববিখ্যাত নাটক "Hamlet" এর জন্য তিনি মাত্র ষাইট টাকা পাইয়াছিলেন। "টমাস কেম্পবেল" তাঁহার Pleasures of Hope লিখিয়া তিনশত টাকা পাইয়াছিলেন। অন্ধকবি মিলটনের সুবিখ্যাত Paradise Lost এর জন্য তাঁহার উত্তরাধিকারীরা শুধু দুই-শত পঞ্চাশ টাকা পান। গোল্ডস্মিথ তাঁহার "Vicar of Wakefield" এর গ্রন্থস্বর মাত্র দেড়শত টাকায় বিক্রয় করিতে বাধ্য হন।

তবেই দেখা যাইতেছে, সভ্যতা ও জ্ঞান প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেরও

দিন দিন আদর বাড়িয়া চলিয়াছে। সে যুগে অনেক বড় বড় লেখকই তাঁহাদের সাহিত্য-সাধনার উপযুক্ত মূল্য পান নাই ; কিন্তু পরবর্ত্তী যুগের সাহিত্যিকেরা প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

আমাদের দেশে—বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া সাহিত্য-সেবায় মনোযোগ প্রদান করেন, তখন লিখিয়া মাসে তাঁহার পাঁচ ছয় শত টাকা আয় হইত। এই কালের সাহিত্যরথীদের মধ্যে বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্রই বহি লিখিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

শুনা যায় সিবিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বেশ টাকা পাইয়াছিলেন। কবি নবীনচন্দ্র সেনের আয়, "পলাসীর যুদ্ধ" স্কুল পাঠ্য গ্রন্থ রূপে মনোনীত হইলে নিতান্ত মন্দ হইয়াছিল না। কিন্তু কবিবর হেমচন্দ্র বা রঙ্গলাল তেমন টাকা পান নাই। দীনবন্ধু মিত্রেরও আশানুরূপ আয় ছিল না। অর্থাৎ কবি ও ঔপন্যাসিকদের ভিতর দুই এক জন ছাড়া, এ দেশে কেহই বড় বেশী অর্থ-লাভ করিতে পারেন নাই, এবং বোধহয় পুস্তকের আয় দ্বারা অতি কম বাঙ্গালী সাহিত্যিকই সুচারুরূপে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ও ঐতিহাসিক রজনী গুপ্ত মহাশয়দিগের নাম সৌভাগ্য-শালী গ্রন্থকারমণ্ডলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেও ইহারা উভয়েই পাঠ্যপুস্তকের লেখক রূপে এই উপর্জ্জনের অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন। "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" ইত্যাদি বা "প্রভাতচিন্তা" প্রভৃতি গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া ঐসমস্ত গ্রন্থের লেখকের (অক্ষয় দত্ত বা কালীপ্রসন্ন ঘোষের) অর্থাগম যে মোটেই আশানুযায়ী হয় নাই, তাহা তাঁহাদের পুস্তকের সংস্করণ সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। তাঁহারা যাহা কিছু পাইয়াছিলেন তাহা পাঠ্যপুস্তকের গ্রন্থকার স্বরূপেই। আমাদের দেশের জীবিত লেখকদের মধ্যে বোধহয় কবিবর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনার আয়ই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, এবং তাঁহার সেই আয়ও সম্ভবত ভিন্ন-দেশ হইতে আগত।

গল্প লেখকদিগের মধ্যে প্রভাতকুমার ও দীনেন্দ্রকুমারের আয় মন্দ না হইলেও, কবি শ্রেণীর মধ্যে অনেকেই যে অনাহারে ও অর্দ্ধাহারে জীবন কাটাইয়া যাইতেছেন তাহার দৃষ্টান্তের এদেশে অভাবই নাই। বর্ত্তমানে খুব আধুনিক লেখকদিগের ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের বহির যথেষ্ট আদর হইয়াছে, এবং বোধহয় এ পর্য্যন্ত তিনি প্রায় লক্ষ টাকা পাইয়াছেন।

তবে আমাদের দেশের গ্রন্থকারেরা বৈদেশিক লেখকদের মত বহি লিখিয়া

দেখা যাইবে যে অনেক গ্রন্থাগারেই এইরূপ তথ্য বা হিসাব রাখা হয় না। যে সব গ্রন্থাগারের রাখা হয় তাহাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক গ্রন্থাগারেই উহাদের বিশ্লেষণ করিয়া সেই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে গ্রন্থাগার পরিচালনের নীতি ও কার্য-পদ্ধতি নির্দ্ধারিত হয়। গ্রন্থাগারের পরিচালকবর্গ এ বিষয়ে সচেতন হইলে অবস্থা অন্যরূপ হইত।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে গ্রন্থাগার সমাজের যে উপকার করে নগ্ন চক্ষে তাহা দেখা যায় না। পুস্তক আদান-প্রদান গ্রন্থাগারের প্রধান কাজ। এই কাজের একটি নিয়মিত হিসাব রাখিলে কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কতজন পাঠক গ্রন্থাগারের সেবা করিয়াছেন তাহা সহজেই নির্দ্ধারণ করা যায়। গ্রন্থাগারের এই সেবার ফল কি হইয়াছে প্রত্যক্ষ ভাবে তাহা বুঝিতে না পারিলেও ঐ হিসাব দৃষ্টে উহার কার্যের পরিমাণ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব। যে সময়, শক্তি ও অর্থের বিনিময়ে জনসাধারণ গ্রন্থাগারের এই সেবা লাভ করিয়াছে তাহা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে কিনা সে সম্বন্ধেও একটা সিদ্ধান্তে আসা যায়। গ্রন্থাগারে পুস্তক আদান-প্রদানের হিসাব রাখিলে একই গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বৎসরে অথবা বিভিন্ন সময়ে কিরূপ কার্য হইয়াছে তাহার একটী তুলনামুলক আলোচনা করা সম্ভব হয় এবং তাহার দ্বারা গ্রন্থাগারের কার্যকারিতা এবং ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে নির্দিষ্ট মত গঠন করা সহজ হয়। গ্রন্থাগারের জন্য যাঁহারা পরিশ্রম করেন তাঁহাদের গ্রন্থাগার সম্পর্কে এইরূপ সুনির্দিষ্ট মত গঠন করা একান্ত আবশ্যক। সমপর্যায়ভুক্ত গ্রন্থাগারসমূহের পুস্তক আদান-প্রদানের হিসাব বিশ্লেষণের দ্বারা বিভিন্ন গ্রন্থাগারের কার্যকরিতার তুলনামূলক আলোচনা করা যায় এবং সেই আলোচনার সূত্র অবলম্বন করিয়া যে সকল গ্রন্থাগার পশ্চাতে পড়িয়া আছে তাহাদের উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয়।

যে অঞ্চলে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত সেই অঞ্চলের সমুদয় লোকের অথবা শিক্ষিত লোকের কত অংশ গ্রন্থাগার ব্যবহার করে পুস্তক পরিবেশনের হিসাবের সহিত হিসাব রাখিলে গ্রন্থাগারের জনপ্রিয়তা কতটা তাহা বুঝিতে পারা যায় এবং প্রয়োজনবোধে গ্রন্থাগারের কার্যক্ষেত্রপ্রসারের চেষ্টা করা যায়। স্থানীয় অধিবাসী-দের মধ্যে যে সকল পুস্তক পরিবেশন করা হয় তাহার মধ্যে সাবালক পুরুষ ও মহিলাগণ কর্তৃক কত বই এবং বালকবালিকাগণ কর্তৃক কত বই পঠিত হয় তাহা নির্ণয় করিলে গ্রন্থাগারের কোন বিভাগের উন্নতির জন্য কিরূপ মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য তাহা সহজে স্থির করা যায়।

পাঠকদের মধ্যে কোন বিষয়ে পুস্তকের চাহিদা কিরূপ গ্রন্থপরিবেশনের হিসাবে বিশ্লেষণ করিয়া তাহা নির্দ্ধারণ করিলে পাঠকদের রুচি সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারণা

করা যায় এবং পাঠকদের রুচি অনুযায়ী গ্রন্থ সরবরাহ করা প্রয়োজন হইলে বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তকের চাহিদার ক্রম অনুযায়ী পুস্তকসংগ্রহের নীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। এইরূপ কোন তথ্যের অভাবে পাঠকের রুচি সম্বন্ধে নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া যায় না। তখন একটা আন্দাজী নীতি অনুসারে অথবা কোন নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ না করিয়াই গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। ইহাতে অনেক সময়ে অর্থের অপব্যয় হয়। যে সকল গ্রন্থাগারের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নহে তাহাদের পক্ষে এইরূপ অবৈজ্ঞানিক নীতিতে গ্রন্থ সংগ্রহ করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। কারণ ইহার ফলে গ্রন্থাগারের কার্য ক্ষেত্র প্রসারের এবং গ্রন্থাগারের উন্নতির পথে অন্তরায় উপস্থিত হয়। পাঠকের রুচির মান উন্নত করিবার চেষ্টা করা আধুনিক গ্রন্থাগারের একটা করণীয় কার্য। পুস্তক পরিবেশনের হিসাবের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের নির্দেশ থাকিলে অর্থাৎ কোন বিষয়ে কত পুস্তক পঠিত হইয়াছে হিসাবের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে তাহা দেখান থাকিলে তবে পাঠকের রুচি সম্বন্ধে নির্দিষ্ট ধারণা অনুসারে কোন্ বিষয়ে কি ধরণের পুস্তক সংগ্রহ করিয়া পাঠকদের মধ্যে তাহা সরবরাহ করিলে পাঠকের রুচির মান উন্নত হইবে তাহা স্থির করা যায়। পাঠকের রুচির মান উন্নত করিবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক তাহা এই হিসাবের ভিত্তির উপরেই করিতে হয়। কাজেই পাঠকের রুচির মান উন্নত করিতে হইলে পাঠকের বর্তমান রুচি কিরূপ তাহা অবগত হওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন বিষয়ে গঠিত পুস্তকের হিসাব হইতে বর্তমান রুচির সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়। এজন্য প্রগতিকামী গ্রন্থাগারে বিষয় হিসাবে পুস্তক পরিবেশনের হিসাব রাখা আবশ্যক।

যে সকল বৃহৎ গ্রন্থাগারে অধিক সংখ্যক কর্মীর দ্বারা গ্রন্থাগারের কার্য্য পরিচালিত হয় সেখানে পুস্তক আদান-প্রদানের হিসাব না রাখিলে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত কর্মীদের কার্য্যের পরিমাণ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা যায় না। কাজেই কর্মীদের মধ্যে কার্য্য বণ্টন বাস্তব অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যহীন হইবার সম্ভাবনা থাকে এবং সকল সময়ে কার্য্য বণ্টনের মধ্যে সমতা রক্ষিত হয় না। ইহার ফলে গ্রন্থাগারের কার্য্যের ক্ষতি হয় এবং কর্মীদের মধ্যেও অসন্তোষ সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে।

মোট কথা পুস্তক আদান প্রদান সংক্রান্ত সকল কাজের সঠিক হিসাব যথাযথ ভাবে রক্ষিত হইলে ইহার সহিত সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত একটা অনুমানের উপর নির্ভর করার প্রয়োজন হয় না। সুনিশ্চিত তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়াই তাহা করা যায় এবং সেই সকল সিদ্ধান্ত বাস্তব অবস্থার সহিত সম্পর্ক

শূন্য নহে বলিয়া সহজে তাহাদের পরিবর্ত্তন করার প্রয়োজন হয় না। গ্রন্থাগারের নিকট হইতে আমরা যে উপকার পাই স্থূল চক্ষে তাহা যখন দেখা যায় না তখন গ্রন্থাগারের কার্য্যের হিসাব ও তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া সকলকে ইহার উপযোগিতা বুঝাইয়া দেওয়া যায়। সেজন্যও এই হিসাব রাখা প্রয়োজন। তবে এই হিসাব নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পন্থায় রাখাই সঙ্গত। গ্রন্থাগারের কার্য্যবিবরণীতে এই সকল হিসাব মাত্র সংখ্যার দ্বারা সন্নিবিষ্ট না করিয়া নানা প্রকার জনপ্রিয় উপায়েরও উল্লেখ করা হইয়া থাকে। গ্রন্থাগারকে সত্যই একটি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচালিত করিবার নীতি যদি পরিচালকেরা গ্রহণ করেন তাহা হইলে অন্যান্য অনেক হিসাব ও তথ্যের সহিত পুস্তক আদান-প্রদানের হিসাবও গ্রন্থাগারে রাখা একান্ত কর্তব্য।

শিক্ষা-বিস্তারে লাইব্রেরীর স্থান

সুশীলকুমার ঘোষ

পুস্তক-সমূহ যাঁহাদের নিকট লাইব্রেরীর আসবাব-পত্র সাজ-সরঞ্জাম ভিন্ন আর কিছুই নয়, তাঁহারা লাইব্রেরীর বহির্ভাগের সংবাদ রাখেন মাত্র, ভিতরে প্রবেশ করিতে পারেন না। লাইব্রেরীর প্রাণের পরিচয় যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহারা বলিবেন পুস্তকগুলি লাইব্রেরীর বাহিরের আবরণ নয়, বুকের অস্থি-পঞ্জর। শোভা-সম্পদ, বসন-ভূষণ, সাজ-সরঞ্জাম না হইলে মানব-দেহ বাঁচিতে পারে, কিন্তু হৃদপিণ্ড শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া বন্ধ করিলে, দেহ বিকল অকর্ম্মন্য, অনাবশ্যক হইয়া যায়, শিক্ষাবিস্তারের কার্য্যও স্থগিত হইয়া গেলে, লাইব্রেরী অচল, অর্থহীন, অন্তঃসার-শূন্য হইয়া পড়ে।

বুকের অস্থি-পঞ্জর রূপে যেখানে পুস্তকগুলি দাঁড়াইয়া থাকে, সেইখানে সেইমত যত্ন ব্যতিরেকে লাইব্রেরী-দেহের যেমন সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, তন্মধ্যবর্ত্তী শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থারূপ শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া বন্ধ হইয়া গেলে, লাইব্রেরী-জীবনে ধ্বংসের সূত্রপাত অনিবার্য্য। পুস্তকের সংখ্যা-বৃদ্ধি যেমন লাইব্রেরীয়ানের দেখিবার বিষয়, পুস্তকগুলি যথার্থ ব্যবহার করা হইতেছে কি না সে বিষয়েও মনঃসংযোগ অধিক প্রয়োজন। পাহাড় পর্ব্বতের স্তূপের ন্যায় অথবা অজগর সর্পের মত বিশাল আয়তনের সার্থকতা সেইখানেই যেখানে উহাদের কার্য্যকরী হইতে দেখা যায়, নতুবা উহারা পৃথিবীর অনেকটা স্থান দখল করিবার আনন্দে বা নিজেদের ভার অযথা বহন করবার কষ্টে দিন কাটাইতে বাধ্য হয়।

সাধারণের পাঠানুরাগের উপর লাইব্রেরীর ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত। যে লাইব্রেরী যে পরিমাণে পাঠকবর্গের মন আকর্ষণ করিতে পারে, সেই পরিমাণে তাহার কৃতিত্ব। পাঠক-পাঠিকা লাইব্রেরীর মোহে মুগ্ধ হইয়া পড়িলে বুঝা যাইবে সেইখানে কর্ম্মকুশলী সচিবেরা নিয়ত লাইব্রেরীর উপকার ও শ্রীবৃদ্ধি-সাধনের জন্য চিন্তা করেন। সংসারে একই ভারের ভাবুক অতি বিরল। কেহ ইতিহাস ভাল-বাসেন, কেহ গল্প ভালবাসেন, কাব্যে কাহারও আসক্তি, নাটকে কাহারও মন মজে, গানে কেহ অধিক আমোদ পান, সাহিত্য আলোচনা কাহারও বা সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। আবার দেখা যায় কেহ সংবাদ-পত্র অতি মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন। বিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কার বা বিজ্ঞান-সম্মত নূতন ধরণের সাংসারিক জিনিষপত্রের

গল্প কেহ গভীর উৎসাহের সহিত অবধারণ করেন। মনের গতি কখন কোন্ দিকে যায়, তাহা মনের মালিক অনেক সময়ে পূর্ব্ব হইতে বুঝিতে পারেন না। কোন জিনিষ বা কোন বিষয় কখন হৃদয়-গ্রাহী হইয়া উঠিবে, তাহা মনোজগতের দর্শনবিৎ পণ্ডিতগণ ব্যতীত সাধারণ লোকের সচরাচর বুঝিতে পারা সুকঠিন। তাই গ্রন্থালয় সচিবের কর্ত্তব্য নানা বিষয়ের পুস্তকাদি সংগ্রহের দ্বারা সাধারণের নিত্য-চঞ্চল মনের জন্য ফাঁদ পাতিয়া রাখা ; এদেশে বিরল হইলেও আমেরিকা, জার্ম্মেনী, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে পুস্তক ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যে গ্রন্থালয়-গৃহ পরিশোভিত থাকে। নানা মনোমুগ্ধকর চিত্রের পরিকল্পনায় এবং হৃদয়-গ্রাহী বিষয়ের উপাদানে লাইব্রেরী-গৃহ সুসজ্জিত থাকে বলিয়া জনসাধারণ গ্রন্থালয়ের মোহে ঐরূপ আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ গ্রন্থালয়কে একটি নেশার জিনিষ করিয়া না রাখিতে পারিলে, লাইব্রেরীরও সার্থকতা অল্প, পাঠকের শিক্ষালাভের সম্ভাবনাও সুদূর পরাহত।

প্রত্যেক লাইব্রেরীর সহিত একটি মিউজিয়ম রাখা উচিৎ। জেলা লাইব্রেরীতে জেলার সমগ্র আবশ্যক ও চিত্তাকর্ষক স্থানের চিত্র সংগৃহীত করা প্রয়োজন। জেলার মানচিত্র প্রত্যেকের হৃদয়-পটে অঙ্কিত করিয়া রাখিবার জন্য জেলার প্রতিকৃতি লাইব্রেরীর শোভা-বৃদ্ধির প্রথম উপাদান হওয়া আবশ্যক। আমাদের প্রয়োজন অনেক সময় অর্দ্ধেক শোভা বর্দ্ধিত করিয়া দেয়। শিক্ষা-বিস্তারে যে সকল চিত্র অধিক কার্য্যকরী সেইগুলিই গ্রন্থালয়-গৃহের শোভার আস্পদ। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নগর বা গ্রাম-সমূহ, তথাকার প্রাচীন অট্টালিকা, মন্দির, জলাশয়, বিদ্যালয়, প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বাস্তু-ভিটা প্রভৃতি গ্রন্থালয়ের দেওয়ালে সুসজ্জিত করিলে এক সঙ্গে অনেকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়া যায়। ইহা ভিন্ন ব্যবসা, বাণিজ্য বা পণ্য-দ্রব্য অথবা উৎপন্ন বা খনিজ পদার্থ সমূহের প্রতি আসক্তি জন্মাইবার জন্য নানারূপ চিত্র, প্রতিলিপি, Chart map প্রভৃতি প্রস্তুত করাইয়া গৃহ-প্রাচীন অলঙ্কৃত করা যাইতে পারে। সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দেশপ্রেমিক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি-বর্গের প্রতিকৃতি যে লাইব্রেরীর গৃহের শ্রেষ্ঠ আসবাব তাহা আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বরেণ্য ব্যক্তি-বর্গের চিত্রাবলী, যুগ-প্রবর্ত্তক, ধর্ম্মচিন্তাশীল মহাপুরুষগণের মূর্ত্তি অথবা শিক্ষা প্রচারক মনীষিগণের আলেখ্য ঐসকল লোকের সহিত সাধারণের সংযোগ আরও গভীর করিয়া তুলে। মহাত্মা রামমোহন রায়, স্বামী বিবেকানন্দ, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অথবা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা বদ্ধমূল হইয়া যায় তাঁহাদের চিত্রের প্রভাবে। পুস্তক পাঠে গভীর জ্ঞানরাশির আস্বাদে মহাপুরুষগণের যে ছবি

হৃদয়ে অঙ্কিত হয়, তাঁহাদের মূর্ত্তি চিত্রাকারে দেখিতে পাইলে, তাহা আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। এই জন্য শিক্ষা মন্দিরে কি ইতিহাস, কি সাহিত্য, কি দর্শন, কি বিজ্ঞান, কি জীবনী, সকল বিষয়ের অধ্যাপনার সময় চিত্র-সংযোগে বুঝাইবার রীতি অন্যান্য সভ্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধিই কোন লাইব্রেরীর উন্নতির পরিচায়ক নহে। যে লাইব্রেরীর পুস্তক অধিক সংখ্যক লোক পাঠ করে, সেই লাইব্রেরীরই শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন বলিতে পারা যায়। লাইব্রেরীর সার্থকতা শিক্ষা বিস্তারে—পুস্তক-সংগ্রহে নয়। পুস্তকের তাগাড় আয়তন বৃদ্ধি করিতে পারে, প্রাণের স্পন্দন নিরূপণ করিবে কি প্রকারে? জনসাধারণের পাঠানুরাগ বৃদ্ধি করা অথবা পাঠকের সংখ্যা বাড়ানর উপর প্রকৃত পক্ষে লাইব্রেরীর শ্রীবৃদ্ধি নিরূপিত হয়। এইজন্য যে লাইব্রেরীতে পাঠকের সংখ্যা যত অধিক, সেই লাইব্রেরী শিক্ষিত সমাজে তত আদরনীয় হয়।

লাইব্রেরীর মধ্য দিয়া দেশবাসীর গৃহে গৃহে শিক্ষার বারতা পৌছাইয়া দিতে হয়। তাই আমেরিকানরা নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়া লাইব্রেরীকে হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিতেছে। Travelling Library বা চলন্ত গ্রন্থালয়ের সাহায্যে সুদূর গ্রামের মধ্যে পুস্তক সরবরাহ করিয়া গ্রামবাসীর ও সহরবাসীর মন একসূত্রে গ্রথিত করিয়া দেয়। নগরে লোকসংখ্যা অধিক, লাইব্রেরীর সংখ্যা অধিক, সুবিধা বন্দোবস্ত সকলই অধিক। সেইজন্য দরিদ্রের পর্ণকুটীরে, জ্ঞানের আলোক জ্বালাইতে তাঁহারা অধিকতর প্রয়াসী। কোথাও চিত্রের সাহায্যে, কোথাও আলোকচিত্র দেখাইয়া, কোথাও বা চলচ্চিত্রের আকর্ষণে গ্রামবাসীর প্রাণে জ্ঞানের তৃষ্ণা জাগাইতে তাঁহারা বদ্ধ-পরিকর। দুঃস্থ-ব্যক্তিকে তাঁহারা সম্মান করিতে জানে; অন্ধ, খঞ্জ, আতুর লোকসমূহের জন্য তাঁহাদের চিত্ত সতত আর্দ্র। তাই গণতন্ত্রের বিশাল সাম্রাজ্যে কোথাও এমন লাইব্রেরী দেখা যায় না, যাহাতে ঈদৃশ ব্যক্তির জন্য বিভিন্ন আয়োজনের ব্যবস্থা নাই। অন্ধের জন্য উপযোগী লাইব্রেরী ও শিশুদের জন্য তরুণ লাইব্রেরী অনেক লাইব্রেরীর প্রয়োজনীয় শাখা। শিক্ষা-বিস্তারের সহজ ও সুগম পন্থা বলিয়া মহাদানবীর কার্ণেগী কুবেরের ঐশ্বর্য্য দান করিয়া গিয়াছেন, কেবলমাত্র লাইব্রেরী প্রতিপালনের জন্য। শুনা যায় আমেরিকার যুক্তরাজ্যের একমাত্র Kansas State এ আটটার অধিক লাইব্রেরী কার্ণেগীর ফাণ্ডের দ্বারা পরিপুষ্ট। এইরূপ Kentucky-তে পাঁচটি, Iowaতে ছয়টি, মিশিগানে দশটি, Indian-য় ১১টি, Georgia-য় ১৫টি। এইরূপ কতশত লাইব্রেরী মহাত্মা কার্ণেগীর নিকট ঋণী তাহা ধারণার অতীত।

লাইব্রেরীর সাহায্যে শিক্ষাপ্রচার হইয়া থাকে নানা উপায়ে। সুদক্ষ কথাশিল্পী তাঁহার মনোহারী উপাখ্যানের মধ্য দিয়া ভাবরসিক ঔপন্যাসিক তাঁহার অপূর্ব্ব চরিত্র সৃষ্টি দ্বারা কল্পনা-কুশলী কবি তাঁহার কল্পনা-কুসুমের মালা গাঁথিয়া চিন্তাশীল দার্শনিক তাঁহার চিন্তা-শক্তির দ্বারা জনসাধারণের মন শিক্ষিত করিয়া থাকেন। একাধারে বহুসংখ্যক চিন্তার ফল অন্য কুত্রাপি ভোগ করা যায় না। লাইব্রেরী যেন চিন্তার নন্দনকানন, ভাবের অফুরন্ত প্রস্রবন, জ্ঞানরত্নের অমূল্য খনি, সকলকে সমানভাবে উপভোগের অধিকার হইতে যাঁহারা বঞ্চিত করেন না, তাঁহারাই প্রকৃত গ্রন্থাগারিক, দেশ-হিতৈষী জন-শিক্ষক। সর্ব্বসাধারণের উপযোগী ব্যবস্থা লাইব্রেরীতে না থাকিলে উহা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার ভোগে লাগিবে না। যাহাতে সর্ব্বপ্রকার লোকের উপকারে লাগে, চিন্তাশীল ব্যক্তির বহু পরিশ্রমের ফলগুলি সেইরূপে বণ্টন করিয়া দেওয়া আবশ্যক। মধ্যে মধ্যে আলোচনা-সভা, বক্তৃতাবলীর প্রবর্ত্তন ও সভা-সমিতির ব্যবস্থার দ্বারা ঐগুলি আপামর সাধারণের করায়ত্ত করা কর্ত্তব্য, নতুবা ভাব ও চিন্তার ধারা বিশুষ্ক মরুপথে কোথায় হারাইয়া যাইবে, কেহই তাহার সংবাদ রাখিবে না। আলোচনা দ্বারা এক এক জন গ্রন্থকারের পুস্তক হইতে বিভিন্ন বিষয়ের সারাংশ সহজবোধ্য ভাষায় জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দিলে সকলের প্রাণে সেই সকল ভাব ও জ্ঞানরাশি বহুদিন ধরিয়া বিরাজ করিবে। বিদ্বন্মণ্ডলীর গবেষণা সাধারণের যাহাতে হৃদয়ঙ্গম হয় তাহার চেষ্টা করিবার জন্য একদল ব্রতীর আবশ্যক। তাঁহারা গল্প করিয়া কথোপকথনের ছলে লাইব্রেরী-জাত অশেষ জ্ঞানভাণ্ডার গ্রামের ভিতর উন্মুক্ত করিয়া দিবে, যাহাতে শিশু, বালক, কিশোর, তরুণ, প্রৌঢ়, যুবা, আবার কিশোরী, যুবতী, নারী এমন কি বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, সকলেই সমানভাবে সেই অমূল্য রত্নরাজির মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া নিজে ধন্য হইতে পারে এবং অপরাপর সকলের হৃদয় উন্নত করিয়া তুলিতে পারে।

লেখক-প্রবন্ধ পরিচিতি

অনাথবন্ধু দত্তঃ—ব্যক্তিগত জীবনে গোয়েঙ্কা কলেজ অফ্ কর্মাসের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৯৩ সালে তাঁর শতবর্ষ পালিত হয়। 'বাংলার শিক্ষক' পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল খুব ঘনিষ্ঠ।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত 'গ্রন্থাগার ও পাঠক' প্রবন্ধটি ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে "পাঠাগার" পত্রিকার অগ্রহায়ণ শেষার্দ্ধ ও পৌষ প্রথমার্দ্ধ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণঃ ছদ্মনাম শ্যামল বর্ম্মা, সত্যব্রত বর্ম্মা। কাশী নরেশের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়নের পর বিদ্যাভূষণ উপাধিলাভ করেন। দেশী-বিদেশী মোট ২৬টি ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনের ফরাসী, জার্মান, পালি ও বাংলা ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকার প্রথম যুগ্ম সম্পাদক ও বিভিন্ন সময়ে 'বাণী', 'ইণ্ডিয়ান একাডেমী' 'পঞ্চপুষ্প' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

৯২৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠাকালে ঐ সম্মেলনে তিনি গ্রন্থাগার বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। এই গ্রন্থে সঙ্কলিত প্রবন্ধ "প্রবাসী" পত্রিকায় ১৩৩০ বঙ্গাব্দে পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ঃ প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির অধিকারী প্রথম জীবনে হুগলী জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকলেও পরবর্ত্তী জীবনে তিনি সেইভাবে সময় ব্যয় করতে পারেননি। ব্যক্তিগত জীবনে আশুতোষ কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজীর অধ্যাপক ছিলেন। বহু সাময়িক পত্রিকায় ইংরাজী ও বাংলায় প্রবন্ধ লিখে সুনাম অর্জন করার সাথে সাথে রবীন্দ্রনাথ এবং বাংলা সাহিত্যের উপর মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধটি পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠিত ১৯৭১ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে স্মারক সংখ্যায় "পুরাতনী" নামে প্রকাশিত।

অশ্বিনী কুমার সেনঃ—বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয় চন্দ্র সরকার, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি মনীষীদের স্নেহধন্য এই লেখক নারায়ণ, আর্যাবর্ত, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মানসী ও মর্মবাণী, সুপ্রভাত, ভারতী, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন। বঙ্গীয় সাহিত্য

পরিষৎ পত্রিকার পরিচালক সমিতির সভ্য ঐতিহাসিক ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনার সঙ্গে সঙ্গে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত তাঁর লেখা প্রবন্ধটি "সুপ্রভাত" পত্রিকায় ১৩১০ বঙ্গাব্দে পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

আশাপূর্ণা দেবী : প্রখ্যাত মহিলা ঔপন্যাসিক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত লীলা পুরস্কার (১৯৫৪) ও ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক (১৯৬৩), অমৃতবাজার পত্রিকা প্রদত্ত মতিলাল পুরস্কার (১৯৫৯), পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র পুরস্কার (১৯৬৬), ভারত সরকারের জ্ঞানপীঠ পুরস্কার (১৯৭৭), এবং ভারত সরকারের প্রদত্ত পদ্মশ্রী উপাধি দ্বারা সম্মানিতা। গল্প সঙ্কলন, উপন্যাস ও ছোটদের গ্রন্থ মিলিয়ে প্রায় দুইশত গ্রন্থের লেখিকা।

বয়েজ ওন লাইব্রেরীর প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে স্মারক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল এই গ্রন্থে সংগৃহীত তাঁর লেখা প্রবন্ধটি।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী : আনন্দরসিক শিশু সাহিত্যিক রূপে বাংলার পাঠক সমাজের কাছে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। শিশু ও কিশোরদের উপযোগী ভাষায় ছড়া, উপকথা, মনোরঞ্জন কাহিনী ও কিশোরোপযোগী বৈজ্ঞানিক কাহিনী রচনার মাধ্যমে শিশু সাহিত্যের নানা দিক নির্দেশ করেছিলেন। ১৮৮৩ খ্রীঃ ছাত্রাবস্থায় "সখায়" তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়।

"অন্ধদের বই পড়া" প্রবন্ধটি "সখা ও সাথী" পত্রিকায় ১৩০১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় :— গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ও একনিষ্ঠ কর্মী পেশায় শিক্ষক ছিলেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস প্রণয়নে তাঁর আগ্রহ সর্বজনবিদিত ছিল। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন, ১৯৩২ সালে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন ও ১৯৪২ সালের ভারতছাড় আন্দোলনে অংশ-গ্রহণ করে কারাবরণ করেছিলেন। 'সর্বোদয় আন্দোলনের ইতিহাস' গ্রন্থের প্রণেতা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহ-সভাপতি ও সভাপতি ছিলেন। 'শিক্ষা' পত্রিকাটিও পরিচালনা করতেন।

১৩৭৮ বঙ্গাব্দে বর্দ্ধমানের চকদিঘীতে ২৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন উপলক্ষ্যে যে স্মারকপত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল, সেই স্মারকপত্রে এই প্রবন্ধটি অন্তর্গত হয়েছিল।

গুরুদাস রায় : মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এই অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির জীবনাবসান ঘটে। অবিভক্ত বঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ড° গুরুদাস রায়ের গ্রন্থাগার নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। নিখিল

ভারত সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষদের সহযোগী সম্পাদক ও বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদের কার্য্যনির্বাহক সমিতির সদস্য ছিলেন। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ ক্লাস অধ্যয়নকালে অধ্যয়ন ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে কারাবরণ করেন। পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় ১৫০০ ডলার পুরস্কার প্রাপ্ত হন ও সেই টাকা দুঃস্থ ছাত্রদের দান করে দেন। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে পণ্ডিত ও অসাধারণ বাগ্মী শিলচর গুরুচরণ জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন।

১৩৩৬ বঙ্গাব্দে "ছাত্র" পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় "গ্রন্থাগারের ইতিহাস" প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয়েছিল।

চারুচন্দ্র রায়ঃ চন্দননগরে বিপ্লবী কর্মের অগ্রদূত। কানাইলাল দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী বসু, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীদের গুরু ছিলেন। আলিপুর বোমা মামলার অন্যতম আসামী ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে ডুপ্লে কলেজের (বর্তমান চন্দননগর সরকারী কলেজ) ইংরেজীর অধ্যাপক, চন্দননগরের মেয়র ও পণ্ডিচেরীর কঁসেই জেনারেল পদে আসীন ছিলেন। অবিভক্ত বাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল খুবই নিবিড়। তিনি ইংরাজী, বাংলা ও ফরাসী ভাষায় বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২১ ও ২২ জানুয়ারী কলিকাতার অ্যালবার্ট হলে দ্বিতীয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে তিনি "ভারতে গ্রন্থাগার আন্দোলন" বিষয়ক আলোচনাচক্রের সভাপতি ছিলেন।

তাঁর লেখা প্রবন্ধ "গ্রাম্য লাইব্রেরী" ১৩৪২ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন সংখ্যায় "পল্লী প্রদীপ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী সাহিত্যে এম. এ. বহু মূল্যবান গ্রন্থ সম্পাদনা ও রচনা করেছেন। জাতীয় গ্রন্থাগার, সেণ্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরী ও আনন্দবাজার পত্রিকা গ্রন্থাগারের সঙ্গে কর্মসূত্রে যুক্ত ছিলেন। গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত তাঁর লেখা প্রবন্ধটি ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে "প্রবাসী" পত্রিকার কার্ত্তিক সংখ্যা থেকে সংগৃহীত।

জে. এ. চ্যাপম্যানঃ—ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরীর (বর্ত্তমানে জাতীয়

গ্রন্থাগার) গ্রন্থাগারিক ছিলেন। ১৯২৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠাকল্পে ভারতসভা হলে যে সভার আয়োজন করা হয়, সেই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন এই প্রবন্ধকার। ইউরোপের অধিবাসী হয়েও বঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি তাঁর অকৃপণ সহানুভূতি ছিল।

১৯২৫ সালের মার্চ্চ মাসে বাঁশবেড়িয়ায় অনুষ্ঠিত প্রথম হুগলী জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলনে দুষ্প্রাপ্য পুঁথি, পুস্তক প্রভৃতি নথির একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে গিয়ে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেই ভাষণটি ১৯২৬ সালে জানুয়ারী মাসে The Indian Library Journal (Vol. 1, no. 4)-এ Public Libraries and National Progress নামে প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ প্রবন্ধটি এই গ্রন্থে বাংলায় অনুবাদ করেছেন দি ইন্‌ষ্টিটিউশন্ অব. ইঞ্জিনিয়ার্স (ইণ্ডিয়া) গ্রন্থাগারের আশীষ ভট্টাচার্য্য।

দীপঙ্কর সেন : প্রিন্টিং টেক্‌নোলজীর অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। বাংলা মুদ্রণ সম্বন্ধে গবেষণামূলক কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। পাশ্চাত্ত্য সংগীত বিশারদ। বাংলা মুদ্রণ ও ইউরোপীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেছেন।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধ পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ গ্রন্থাগারের মুখপত্র "মুদ্রণ-পত্র" স্মারক গ্রন্থে প্রকাশিত।

নক্ষত্রলাল সেন :—ইম্‌পেরিয়াল লাইব্রেরীতে (বর্ত্তমানে জাতীয় গ্রন্থাগার) লেখক কর্মসূত্রে যুক্ত ছিলেন। ১৯২৪ সালের জুন মাসে হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের যে স্বল্পমেয়াদী কোর্স হয়, সেই কোর্সের অন্যতম ছাত্র ছিলেন লেখক। তিনি সারা জীবন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধে বহু মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধটি ১৩৪০ বঙ্গাব্দে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

নিউটন মোহন দত্ত : বরোদা লাইব্রেরীর কিউরেটর ছিলেন। এঁর অসামান্য অবদানের জন্য এই শতাব্দীর কুড়ির দশকে বরোদা গ্রন্থাগার আধুনিক প্রণালীতে গ্রন্থাগার পরিচালনায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। প্রথম জীবনে কলিকাতা পৌরসভার সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলেও পরবর্ত্তী কালে ইংলণ্ডে গিয়ে গ্রন্থাগারিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে বরোদার গাইকোয়াড়ের আমন্ত্রণে বরোদার লাইব্রেরীর পরিচালক হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব 'Baroda

and its Libraries' নামে একটি সুন্দর বিবিধ তথ্যপূর্ণ পুস্তক রচনা করেছিলেন।

১৯৩১ সালের ১৮ই ও ১৯শে নভেম্বর কলিকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ভবনে তৃতীয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন নিউটন মোহন দত্ত। তিনি ঐ সম্মেলনে সভাপতির যে অভিভাষণ দেন, সেই অভিভাষণটি বঙ্গানুবাদ করেছিলেন প্রয়াত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় সংখ্যায়।

নীহাররঞ্জন রায়ঃ—প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইংল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ডে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত, লাইডেন বিশ্বরিদ্যালয়ের ডি. লিট্., বেনারস ও অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সাম্মানিক ডি. লিট. উপাধিতে ভূষিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের বাগেশ্বরী অধ্যাপক কর্মজীবনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গ্রন্থাগারিক ছিলেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি বহু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর মধ্যে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব।"

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে ও ২০শে মার্চ মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত পঞ্চম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক হিসেবে সম্মেলনের সভাপতির যে অভিভাষণ দেন ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে "সৌরভ" পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় "পাঠাগার" নামে সেটি প্রকাশিত হয়।

পীযূষকান্তি মহাপাত্রঃ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক দীর্ঘদিন শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত। শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে বহু অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিশেষ করে বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূর করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। এছাড়া ডঃ মহাপাত্র অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ রচনা করেছেন। যার মধ্যে তিনটি গ্রন্থের প্রকাশক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। দেশে ও বিদেশে বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করেছেন তিনি। বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে তাঁর মূল্যবান অভিজ্ঞতার কথাও ব্যক্ত করেছেন।

এই গ্রন্থে সংগৃহীত প্রবন্ধটি ছয়ের দশকে 'ইয়াসলিক বুলেটিনে' ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর প্রাক্তন ছাত্র গৌতম মাইতি।

প্রকাশচন্দ্র দত্ত— সুপ্রসিদ্ধ মহিলা কবি গিরিন্দ্রমোহন দাসীর পুত্র প্রকাশচন্দ্র বহু বাংলা সাময়িক পত্রিকার সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। তিনি তাঁর মাতাকে "জাহ্নবী" পত্রিকা পরিচালনায় বিশেষ ভাবে সাহায্য করতেন। ইংরাজী ও বাংলা গদ্য ও পদ্য রচনায় তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। সুবল মিত্রের অভিধানের চতুর্থ সংস্করণের সম্পাদন ও প্রকাশ তাঁরই তত্ত্বাবধানে হয়। কুড়ি বছর বয়সে "ভারতী" সম্পাদনার ভার পান।

"বই বিক্রি" প্রবন্ধটি ১৩৩২ বঙ্গাব্দে চৈত্র সংখ্যায় "ভারতী" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রফুল্ল চন্দ্র রায় :—আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ছাত্রানুরাগী, বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল, ইতিহাস, ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস অধিবেশনে অনুষ্ঠিত গ্রন্থাগার শাখার সভাপতি হিসেবে সভাও পরিচালনা করেছেন। বাঙ্গলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহী এই মহান পুরুষ বহু মূল্যবান গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই এপ্রিল বালী সাধারণ পাঠাগারের উৎসব উপলক্ষে তিনি যে ভাষণ দেন, সেই ভাষণ ১৩২৫ বঙ্গাব্দে "প্রবাসী" পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় "অধ্যয়ন ও জ্ঞানলাভ" নামে প্রকাশিত হয়।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—কলিকাতা, যাদবপুর, বর্ধমান, রবীন্দ্রভারতী ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট্. প্রাপ্ত এই প্রবন্ধকার প্রথম থেকেই গ্রন্থাগার বৃত্তি ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাথে নিজেকে সংযুক্ত রেখেছিলেন। বিভিন্ন পুরস্কার ও উপাধি তাঁর জীবতকালে গ্রহণ করেছেন। বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন ও সমধিক খ্যাতিলাভ করেছেন।

এই গ্রন্থে তাঁর লেখা সংগৃহীত প্রবন্ধটি বীরভূমের বেলমুড়ি থেকে প্রকাশিত "প্রাতিস্বিক" পত্রিকায় ১৩৮৬ বঙ্গাব্দে কবিপক্ষ সঙ্কলন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

প্রমীলচন্দ্র বসু : গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা বঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনে একটি উজ্জ্বলতম অধ্যায়ের সময় কৃতিত্বের সাথে নিজেকে সংযুক্ত রেখেছিলেন। হুগলী জেলার উদ্যোগে ১৯৩৪ সালের জুন মাসে বাঁশবেড়িয়ায় প্রথম যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়, সেই কোর্সের পরিচালক ছিলেন বরোদা থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণ প্রাপ্ত প্রমীলচন্দ্র বসু। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন কর্মসচিব ও সভাপতি সারা জীবনে অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি "প্রমীল নামা" গ্রন্থটি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান এখনও বঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের বহু মূল্যবান ঘটনার সাক্ষী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

তাঁর লেখা সংগৃহীত প্রবন্ধটি ভারতী পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত "লাইব্রেরী বুলেটিন" নামক পত্রিকায় ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম খণ্ড প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, শরৎচন্দ্র প্রভৃতির স্নেহধন্য ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সহকর্মী ছিলেন। 'সাপ্তাহিক হিতবাদী, ও, ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সাহিত্য সমালোচক, স্বদেশসেবী ও সমাজসেবী এই লেখক বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছিলেন।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধটি "পাঠাগার" পত্রিকায় ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত।

বিমলকুমার দত্ত : কলিকাতা ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও বিশ্বভারতী বিদ্যালয়ের প্রাক্তন গ্রন্থগারিক দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর মঙ্গিল-পুরের সুপ্রসিদ্ধ দত্ত পরিবারের সন্তান। ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়ার বাঁ্যাটরায় অনুষ্ঠিত ৩৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন তিনি। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থ ; গ্রন্থাগার, গ্রন্থ সূচীকরণ, গ্রন্থকারের রূপ ও বিকাশ, রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার, Bengal Temples প্রভৃতি।

এই লেখকের সংগৃহীত প্রবন্ধটি "প্রবাসী" পত্রিকার সংখ্যায় মুদ্রিত।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ও খড়্গপুরের ইণ্ডিয়ান টেক্‌নজিকাল ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব হিসেবে কিছু বৎসর গুরু দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁর লেখা প্রকাশিত গ্রন্থ "গ্রন্থবিদ্যার ক্রমবিকাশ।"

এই গ্রন্থে সংগৃহীত প্রবন্ধটি ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে "পাঠাগার" পত্রিকায় অগ্রহায়ণ শেষার্দ্ধ ও পৌষ প্রথমার্দ্ধ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯২৯ খ্রীঃ 'প্রবাসী' ও 'মর্ডান রিভিউ' পত্রিকার সহ সম্পাদক হন এবং বাংলা সংবাদপত্র ঘেঁটে সেকালের সাহিত্য ও সমাজ জীবনের বিবরণ সংগ্রহ করেন। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁকে রামপ্রাণ গুপ্ত 'স্বর্ণ পদক' ও ১৯৫২

খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করেন। 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা' 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' তাঁর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ সংখ্যা ৩৪ (৪টি ইংরেজী গ্রন্থ সহ)।

তাঁর লেখা প্রবন্ধটি 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

মুনীন্দ্রদেব রায়ঃ ভারতবর্ষের তথা পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় বাঁশবেড়িয়ার রাজ পরিবারের সন্তান ছিলেন। ১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি ছিলেন তিনি। নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতির পদও তিনি অলঙ্কৃত করেছেন। ইংরাজী ও বাংলায় ২০টি গ্রন্থের রচয়িতা।

তাঁর লেখা প্রবন্ধ "গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার" ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে "প্রবাসী" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

যতীন্দ্রমোহন দত্তঃ হাটখোলার বিখ্যাত দত্ত পরিবারে ১৩০১ বঙ্গাব্দে ব্যক্তিগত জীবনে এই কৃতী ছাত্রটি জন্মগ্রহণ করেন। স্বধর্মানুরাগী, বাঙ্গলার দেব-দেবী, সংখ্যাতত্ত্ব, মুসলমান ধর্ম, কলিকাতার সমাজ সম্পর্কে গবেষক ছিলেন। ১৯৭৫ সালে সংখ্যাতত্ত্বে গবেষণার জন্য ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মশ্রী উপাধি দ্বারা সম্মানিত হন। রসরচনায় সিদ্ধহস্ত এই লেখক আনন্দবাজার, যুগান্তর, বসুমতী, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, শনিবারের চিঠি প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প, রসরচনা ও প্রবন্ধ লিখেছেন।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত "সাহিত্যিকের আয়" প্রবন্ধটি ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত "সৌরভ" পত্রিকায় ১৩৩২ বঙ্গাব্দে চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত।

রামনাথ বিশ্বাসঃ ইনি ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস নামে সকলের কাছে সমধিক পরিচিত ছিলেন। কৈশোরে বিপ্লবী অনুশীলন সমিতিতে যোগদান ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সামরিক দপ্তরে চাকুরীতে যোগদান করলেও জীবনের মধ্যাহ্নে ভূপর্যটন শুরু করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ভূপর্যটন বন্ধ রাখতে বাধ্য হন। পূর্ব ভূখণ্ডের ব্রহ্মদেশ থেকে পর্যটন শুরু করে জাপান, পশ্চিম এশিয়ার আফগানিস্থান থেকে আরব এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, নবীন তুরস্ক ও আমেরিকা পর্যটন করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'আজকের আমেরিকা', 'বেদুইনের দেশে' 'প্রশান্ত মহাসাগরের অশান্তি', 'দ্বিচক্রে কোরিয়া ভ্রমণ' প্রভৃতি।

এই গ্রন্থে মুদ্রিত প্রবন্ধটি "পাঠাগার" পত্রিকায় ১৩৪৮ সনে ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ঃ স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিগত জীবনে কৃতী ছাত্র ছিলেন। একাধারে সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ 'মাসিক ধর্মবন্ধু', 'মাসিক দাসী', 'মাসিক প্রদীপ', 'মাসিক প্রবাসী', 'Modern Review' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে সর্ব্বসাধারণের কাছে পরিচিত হলেও সিটি কলেজের অধ্যাপক, এলাহাবাদ কায়স্থ পাঠশালা কলেজের অধ্যক্ষ, ও বিশ্বভারতীর অবৈতনিক অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ হিসেবে জীবনের বেশ খানিকটা সময় নির্ব্বাহ করেছেন।

গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের পরম অনুরাগী এই লেখকের গ্রন্থাগার বিষয়ক অনুরাগের চিহ্ন প্রবাসী ও Modern Review পত্রিকায় আমরা দেখতে পাই। এই গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধ "গ্রন্থাগার" ১৩৩৫ সালে "সৌরভ" পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধটি অবিভক্ত বঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল্যবান দলিল। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রথম কর্মসচিব সুশীল কুমার ঘোষ বঙ্গদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের উপযোগিতা প্রচার করবার জন্য যখন জেলায় জেলায় আন্দোলন সংগঠিত করছেন, তখন তাঁর উদ্যোগে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ১০ই বৈশাখ ময়মনসিংহের বার লাইব্রেরীতে গ্রন্থাগার সমিতির অধিবেশনে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সভাপতির যে ভাষণ দেন, এই প্রবন্ধটি সেই ভাষণ।

লীলাবতী নাগঃ দেশপ্রেমিকা ও বিপ্লবী এই মহিলা ব্যক্তিগত জীবনে খুব কৃতী ছাত্রী ছিলেন। ১৯২১ খ্রী. মহিলাদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে পদ্মাবতী স্বর্ণপদকসহ কলিকাতা বেথুন কলেজ থেকে বি. এ. এবং ১৯২৩ খ্রীঃ-এ ইংরেজ সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাশ করেন। ১৯২৬ খ্রীঃ-এ ভারতবর্ষে প্রথম 'দীপালী ছাত্রী সঙ্ঘ' নামে প্রথম ছাত্রী সংগঠন গঠন করেন ও ১৯৩০ খ্রীঃ-এ মহিলাদের আবাস "ছাত্রীভবন" প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৮ খ্রীঃ কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনের সময় তাঁর উপর নারী আন্দোলনের ইতিহাস রচনার দায়িত্ব অর্পিত হয়। ১৯৩১ খ্রীঃ 'জয়শ্রী' নামে মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৯৩১ খ্রীঃ পুলিশ তাঁকে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার করে ১৯৩৮ খ্রীঃ পর্যন্ত আটকে রাখে। তিনি জেল থেকে মুক্তি পাবার পরেই এই গ্রন্থে প্রকাশিত অভিভাষণটি তিনি দিয়েছিলেন।

ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত "সৌরভ" পত্রিকায় প্রকাশিত ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে আষাঢ় সংখ্যায় "গ্রন্থাগার" প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীঃ প্রকৃত নাম শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। ১৮৭৭ খ্রীঃ সংস্কৃত কলেজ থেকে এম. এ. পরীক্ষায় একমাত্র তিনিই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে "শাস্ত্রী"

উপাধি পান। মহামহোপাধ্যায়, (১৮৯৮) সি. আই. ই. (১৯১১) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ডি. লিট. (১৯২৭) উপাধি দ্বারা সম্মানিত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি ও সভাপতি, এশিয়াটিক সোসাইটীর সহ-সভাপতি ও সভাপতি, লণ্ডন রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটীর সাম্মানিক সদস্য প্রভৃতি বহু উচ্চ পদে আসীন ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি বহু নিবন্ধ, প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মে চন্দননগর পুস্তকাগারের গৃহ প্রবেশ অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে তিনি যে ভাষণটি দেন সেই ভাষণটি 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩২৭ বঙ্গাব্দে শ্রাবণ সংখ্যায় "লাইব্রেরী" নামে প্রকাশিত হয়েছিল। অপর প্রবন্ধটি "প্রবাসী" পত্রিকায় ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

হরিহর শেঠ: ইনি ছিলেন অবিভক্ত বঙ্গের তথা চন্দননগরের প্রসিদ্ধ বুদ্ধিজীবি তথা গবেষক। সুলেখক রূপে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল খুবই নিবিড়। চন্দননগর পুস্তকাগারের দু-দফায় তিনি (১৯১৭-১৯২৪) এবং (১৯৩০-১৯৩৮) মোট পনের বৎসর সম্পাদকের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেছিলেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে সুশীল কুমার ঘোষ এই ব্যক্তির সহযোগিতায় হুগলী জেলায় গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্বন্ধে ব্যাপক প্রচারকার্য চালাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত "বাংলার প্রথম মাসিক পত্র" প্রবন্ধটি ১৩৪০ বঙ্গাব্দে মাঘ সংখ্যায় "প্রবাসী" পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল এবং "পল্লী পাঠাগারের আদর্শ" ১৩৪২ বঙ্গাব্দে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'চিত্রালী' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল।

শিবশঙ্কর মিত্র: বিভিন্ন পুরস্কারে প্রাপ্ত এই লেখক গ্রন্থাগার বৃত্তি ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর কলিকাতায় অবস্থিত গোর্কি সদন গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত "বাংলার লাইব্রেরী" প্রবন্ধটি ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে "পাঠাগার" পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

শ্রীপান্থ: প্রকৃত নাম নিখিল সরকার। আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় দক্ষ। তিনি বেশ কিছু ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছেন।

এই গ্রন্থে তাঁর লিখিত প্রবন্ধটি বাংলা মুদ্রণের দু'শ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ গ্রন্থাগার কর্তৃক প্রকাশিত "মুদ্রণপত্র" স্মারক গ্রন্থে প্রকাশিত।

সজনীকান্ত দাস ঃ কবি, সমালোচক, প্রবন্ধকার, সঙ্গীতর চয়িতা ও প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের গবেষকরূপে তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি এবং নিখিল বঙ্গ সাময়িকপত্র সঙ্ঘ, সাহিত্যসেবক সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি, পরিভাষা সংসদ, অ্যাডাল্ট এডুকেশন কমিটি প্রভৃতির সদস্য, সহ-সভাপতি বা সভাপতি ছিলেন। তিনি শনিবারের চিঠি, বঙ্গশ্রী, দৈনিক বসুমতী ও অলকা পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর রচিত বহু বাংলা গ্রন্থ সুধীজনের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

"বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংলা অভিধান" প্রবন্ধটি ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে ৪র্থ সংখ্যায় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল।

সতীশচন্দ্র গুহঠাকুর ঃ শান্তিনিকেতনের কলা-ভবনের সংগ্রহ সচিব ও দ্বারভাঙ্গার স্টেট লাইব্রেরীর গ্রন্থাধ্যক্ষ এই লেখক সংস্কৃত, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ের উপর তিনি নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন। বিশেষ করে কাশী থেকে প্রকাশিত "উত্তরা" পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন তিনি। তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় লিখিত "প্রাচ্য বর্গীকরণ পদ্ধতি"।

"পাঠাগার" প্রবন্ধটি ১৩৪১ বঙ্গাব্দে "উত্তরা" পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

সুকুমার সেন ঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ও খয়রা অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অবদানের জন্য সারাজীবন বহু পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন। রবীন্দ্র পুরস্কার (১৯৬৩), বিদ্যাসাগর পুরস্কার (১৯৮১), আনন্দ পুরস্কার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রদত্ত রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি পুরস্কার, এশিয়াটিক সোসাইটি প্রদত্ত স্বর্ণপদক প্রভৃতি বহু পুরস্কার প্রাপ্ত তিনি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী প্রাপ্ত, বিশ্বভারতী প্রদত্ত দেশিকোত্তম, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ডি. লিট্. উপাধি, গ্রেট ব্রিটেন রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি প্রদত্ত স্বর্ণপদক দ্বারা সম্মানিত। তিনি সারাজীবন বহু উল্লেখযোগ্য ইংরাজী ও বাংলা গ্রন্থ রচনা করেছেন।

১৩৭৮ বঙ্গাব্দে বর্ধমানের চকদীঘিতে অনুষ্ঠিত ২৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে

উদ্বোধকের অভিভাষণ "গ্রন্থাগার" প্রবন্ধটি। সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মারকপত্রে এই অভিভাষণটি মুদ্রিত হয়েছিল।

সুখেন চট্টোপাধ্যায়ঃ বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রথম গ্রন্থ লেখার কৃতিত্ব এই লেখকের। ১৯৩৮ সালে তাঁর লেখা 'গ্রন্থাগার পরিচালনা' প্রকাশিত হয়। ১৯৩৫ সালে ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরীর উদ্যোগে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কোর্সের সূচনা হলে, প্রথম বর্ষের ছাত্র হিসেবে তিনি যোগদান করেন। কলিকাতার পৌরসভার সঙ্গে কর্মসূত্রে যুক্ত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি কলিকাতা গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক ছিলেন।

এই গ্রন্থে সংগৃহীত তাঁর লেখা প্রবন্ধটি ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে "পাঠাগার" পত্রিকায় আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপক ভাষাচার্য হিসেবে ভারতবর্ষের গুণী সমাজের কাছে পরিচিত ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বেঙ্গল-এর সভাপতি ও সাহিত্য একাডেমীর সভাপতি ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মভূষণ ও পদ্মবিভূষণ উপাধিতে সম্মানিত হয়েছিলেন। ৩৮০টিরও বেশী গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। তার মধ্যে "The Origin and Development of Bengali language" একটি অবিস্মরণীয় গ্রন্থ।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল খুবই নিবিড়। এই গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধটি ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে "সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার" ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

সুশীলকুমার ঘোষঃ অবিভক্ত বঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের এক উজ্জ্বলতম অধ্যায়ের সূচনা ও ঐতিহাসিক যুগসন্ধির অভ্যুদয় ঘটেছিল মূলতঃ গ্রন্থাগার আন্দোলনের রূপকার ও প্রাণপুরুষ সুশীলকুমার ঘোষের নেতৃত্বে ও উদ্যোগে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রথম কর্মসচিব নিখিল ভারত সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষদেরও যুগ্ম কর্মসচিব ছিলেন। ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব শিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথনের সাথে পরিষদের যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতার যোগসূত্রের রূপকার ছিলেন তিনি। ১৯৯৪ সালে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী।

এই গ্রন্থে সংগৃহীত প্রবন্ধটির ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে "বিশ্ববাণী" পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

লেখক নির্দেশিকা

সম্পাদক পরিচিতি

অসিতাভ দাশ ঃ জন্ম ১৯৫৭ সালের ১৫ই এপ্রিল। লেখাপড়া মিত্র ইনস্টিটিউশন (ভবানীপুর), হেরম্বচন্দ্র কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাংলা সাহিত্যে এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। প্রথমে যোধপুর পার্ক বয়েজ স্কুল ও বর্ত্তমানে চন্দননগর সরকারী কলেজে কর্মসূত্রে যুক্ত। ১৯৮৩ সাল থেকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট কোর্সের শিক্ষকতায় নিযুক্ত ও বাণীপুর জনতা কলেজে শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের অতিথি অধ্যাপক। বহু পত্র-পত্রিকায় ছোট গল্প, প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এই সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ দশ দিক্‌পাল লেখক ও আলোর ঠিকানা ১ম ও প্রসঙ্গ ঃ শিক্ষা।